জগতের বন্ধু বা জগতের ইমাম।

The friend of the world
or
The Redeemer of the world.

প্রথম খণ্ড।

প্রকাশিকা—

শ্রীউর্ম্মিলা [illegible] চৌধুরাণী

জগতের বন্ধু বা জগতের ইমাম্ ।

The friend of the world.

or

The Redeemer of the world.

প্রথম খণ্ড ।

প্রথম সংস্করণ ।

প্রকাশিকা—

শ্রীউর্ম্মিলা সাহা চৌধুরাণী ।

মূল্য ষোল আনা ।

এই

সর্ব্ব ধর্ম্মসমন্বয়-গ্রন্থ

আমি

জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে

জগতের

প্রিয় ভগিণী ও ভ্রাতাগণকে

উপহার দিলাম

তাঁহারা ইহার ভাব যথাযথরূপে

গ্রহণ করিলেই

আমি

আমার পরিশ্রম সার্থক বলিয়া

মনে করিব।

বিনীত—

শ্রী—গ্রন্থ প্রচারক।

নিবেদন।

গ্রন্থ প্রচারকের অনুমতিক্রমে আমি এই "জগতের বন্ধু" বা "জগতের ইমাম" "The Friend of the World" or "The Redeemer of the World" নামক সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশ করিলাম। এই গ্রন্থকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে, নবম অধ্যায় পর্য্যন্ত লেখা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় খণ্ড বা শেষ খণ্ড, দশম অধ্যায় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডও ছাপানো হইতেছে; আশা করি ভগবৎ কৃপায় উহাও শীঘ্রই যথাসময়ে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইব। প্রচারক, গ্রন্থের আবশ্যক বোধে, জগতের নানা ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে যেসকল স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন, তাহার ভিতর কোন বিষয় যদি কোন প্রকার ভুল ভ্রান্তি কিম্বা কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের কোন প্রকার আপত্তিজনক ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে দ্বিতীয় সংস্করণে, উহা যথাসাধ্যমতে পরিবর্ত্তণ করিয়া লওয়া যাইবে। যেহেতু জগতের কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উপর কোন প্রকার বিদ্বেষভাব প্রচার করা গ্রন্থ প্রচারকের উদ্দেশ্য নহে। বরং যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া জগতের ধর্ম্মগ্রন্থ সকলের, যে আধ্যাত্মিক নিগূঢ়তত্ত্ব সকল বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত লোক সমাজে গোপন ছিল, জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে এখন তাহা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করানই গ্রন্থ প্রচারকের মনের প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণের ছাপাখানার প্রোভ্ সেট্ বিশেষ মনোযোগের সহিত না দেখার দরুণ, গ্রন্থের কোন কোন স্থানে ভাষা ও বর্ণ বিন্যাস সম্বন্ধে কিছু ভুল রহিয়া গিয়াছে। শুদ্ধিপত্রে যথাসম্ভব উহার কিছু কিছু সংশোধন করিয়া দেওয়া হইল। বিশেষতঃ এই গ্রন্থ প্রচারক তত উচ্চশিক্ষিত নন এবং বর্ত্তমান বাঙ্গলার সময়োপযোগী ভাষাজ্ঞানও তাহার সেরূপ

নাই। তিনি করুণাময়ের কৃপায় গত ৪।৫ বৎসর যাবৎ অনবরত অনন্ত আকাশে, বংশীধ্বনি বা শিঙ্গাধ্বনির ন্যায় এক উচ্চ সুমধুর "সুরধ্বনি" শুনিয়া যে আত্মতত্ত্ব অনুভব করিয়াছেন, তাহার ভাব প্রকাশার্থে জগতের ধর্ম্ম গ্রন্থ সকল হইতে আবশ্যকীয় বিষয়গুলি স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়া কোন রকমে এই গ্রন্থে একত্র সন্নিবেশ করিয়াছেন মাত্র। অতএব সুধী পাঠকবর্গ, ভাষার দোষগুণের প্রতি বিশেষ কোন লক্ষ্য না করিয়া শুধু গ্রন্থের ভাব গ্রহণ করিয়াই বাধিত করিবেন। এই গ্রন্থে, গ্রন্থ প্রচারকের নাম প্রকাশ করা হইলনা। মণীষীপাঠকবর্গের ভিতর যদি কেহ তাহা জানা আবশ্যক মনে করেন তবে অনুগ্রহ করিয়া অনুসন্ধান করিলেই যথাসময়ে জানানো যাইবে ইতি।

খুঁকুনিবাস, বড়ালঘাট।
নবদ্বীপ।
১৩৪৩ সাল।

নিবেদিকা—
প্রকাশিকা

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫	৭	কোরানসরিপ	কোর-আনশরিফ
৭	১৭	অর্থাৎ তিমি	তিনি
,,	১৮	প্রেরিত্ত	প্রেরিতত্ব
১১	৪	খৃষ্টিয়ানশাস্ত্র	খৃষ্টিয়ানশাস্ত্রে
১৩	২১	বৃষ্ণকে	কৃষ্ণকে
১৫	৩	জরীভূত	জড়ীভূত
২৩	২২	রনঘনস্বরূপ	রসঘনস্বরূপ
,,	২৩	বিশ্বপ্রসাধিনী	বিশ্বপ্রসবিনী
২৫		অতিন্দ্রিয়	অতন্দ্রিত
২৬	১৩	পথ্য	পথ
২৭	১৯	অপ্রকৃতখাদ্যবস্তু	অপ্রাকৃতখাদ্যবস্তু
,,	২১	খাকুকনাকেন ?	খাকুকনাকেন
,,	২৭	নিহীত	নিহিত
২৯	৬	টকাটকায়তে	টকাটকৃটকায়তে
,,	১৫	ষোড়সকলাযুক্ত	ষোড়শকলাযুক্ত
৩০	২৫	বানে	গানে
,,	,,	শুণান	শুখ নো
৩১	৯	প্রকৃতর্শক্তি	প্রকৃতিশক্তি
,,	১৬	স্বতঃ	সতঃ
৩১	২০	নির্ম্মানকরিয়া	নিম্মানকরাইয়া
৩২	১৩	ধর্ম্মাবলম্বীদের	ধর্ম্মাবলম্বিদের
৩২	১৫	কেন ?	কেন
,,	১৮	Posetive	Positive
,,	,,	Nigetive	Negative
৩৩	১৯	মধ্যাকর্ষণ	মাধ্যাকর্ষণ
৩৪	৩	শস্যকণা	শস্যকণা
,,	১১	লগ্নপায়ে	লগ্নপদে

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩৪	১৬	দিখণ্ডিত	দ্বিখণ্ডিত
৩৫	১২	তাড়ীৎ	তাড়িৎ
৩৯	১৩	গলাইলে	গালাইলে
৪০		আর্য্যমিশনের	আর্য্যমিশন ইন্‌ষ্টিটিউসনের
৪৮	২৪	জগদগম্ভীর	জলদগম্ভীর
৫৯	১৯	প্রভৃতিকেই	প্রভৃতিই
৭০	৫	আছে	আছেন
,,	৬	বৎসগ	বৎসগণ
৭৫	১	গোজাতিপৃথিবীকে	গোজাতি বা পৃথিবীকে
,,	১৪	অনাশক্ত	অনাসক্ত
৮৬, ৯৭	১২, ১২	অনাশক্ত	অনাসক্ত
৮৯	১১	সমুন্দ্র	সমুদ্র
৯০	৬	ধন্বন্তবরি	ধন্বন্তরির
৯২	৬	স্বর্গমৃগ	স্বর্ণমৃগ
১০৫	১৬	গর্গমুণি	গর্গমুনি
,,	২৬	পিরিতপ্রণয়	পিরীতপ্রণয়
১০৮	১৭	কালিয়দমনের	কালীয়দমনের
১০৯	১৫	কালিকামূর্ত্তি	কালীকামূর্ত্তি
১১৭	৬,৭,৯	মুশুর	মুসুর
১২০	৫	হয়	ছয়
,,	,,	গোবৎই	গোবৎসই
১২১	২৩	হন্দুশাস্ত্রে	হিন্দুশাস্ত্রে
১২৫	১	বামনের	বামন
১৪৮	১	নিঙ্‌রাইয়া	নিঙ্‌ড়াইয়া
১৫৯	৪	মতৃস্থনকে	মাতৃস্তনকে
১৭১	১৮	অাঘোতকরে	আঘাতকর
১৯২	৩,৬	অনাহুত	অনাহত
১৯৮	১৭	ফজয়	ফরজ
২০০	২৬	স্থানে	স্থান

"সত্যংহি কেবলম্ বলম্।"

" অনন্ত শাস্ত্রং বহুবেদিতব্যং স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎসারভূতং তদুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্॥"

অর্থাৎ শাস্ত্র অনন্ত, জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক, আয়ু অল্প এবং বিঘ্নও বহু; (এস্থলে) জল মিশ্রিত দুগ্ধ হইতে হংসের দুগ্ধ পানের ন্যায় (ঐ অনন্তের মধ্যে) সারাংশ টুকুই অবলম্বনীয়।

'জগতের বন্ধু' বা 'জগতের ইমাম'

"The Friend of the World"
or
"The Redeemer of the World"

প্রথম অধ্যায়।

আরম্ভের সহিত সর্ব্বশক্তিমান করুণাময়ের নাম স্মরণ করিয়া আমি জানাইতেছি,—হে আমার জগতস্থ প্রিয় বন্ধুগণ! আপনারা হয়তো অনেকেই অবগত আছেন যে, বর্ত্তমান যুগের ভাববাদিগণ বলিতেছেন, জগতে এমন একজন লোক আসিবেন যিনি সকল মনুষ্য জাতিকে একই ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় করিবেন। তখন মনুষ্য জাতির ভিতর ধর্ম্ম সম্বন্ধে আর কোন বাদ বিসম্বাদ থাকিবে না। তিনি ঐশীশক্তিকৃপাবলে জগতে সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় করিয়া ধর্ম্মের এক অভিনব পথ পরিস্কার করিয়া লইবেন। [যেহেতু তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান, য়ীহুদি প্রভৃতি ধর্ম্ম গ্রন্থের উপর কোনও প্রকার বিদ্বেষ ভাব পোষণ না করিয়া অথচ সকল ধর্ম্ম গ্রন্থের ভাব সামঞ্জস্য রাখিয়া এমন এক নূতন ধর্ম্মের পথ প্রস্তুত করিয়া লইবেন] যাহাতে মনুষ্য তো দূরের কথা জগতের বৃক্ষ, লতা, ক্রিমি, কীট, পশু ও পক্ষী প্রভৃতি ধর্ম্ম জগতে সকলেই যেন একই পথের পথী হইতে পারে। কেহ কেহ বলিতেছেন, তিনি আসিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতেছেন, তিনি বর্ত্তমানই আছেন। আবার কেহ কেহ বলিতেছেন, তিনি এখনও আসেন নাই ভবিষ্যতে আসিবেন।

সে যাহা হউক, যখন ফরসী দেশে মানুষ, প্রথমে বেলুনে চড়িয়া আকাশে উড়িতে চেষ্টা করে তখন নাকি একটি বৃদ্ধ তাহা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহাকে কাঁদিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "মানুষ যখন আকাশে উড়িতে শিখিল তখন চেষ্টা করিলে অমরও হইতে পারিবে। কিন্তু হায়! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি শীঘ্রই মরিয়া যাইব। অতএব আমার ভাগ্যে অমরত্ব লাভ করা ঘটিয়া উঠিল না। ইহাই আমার দুঃখের কারণ।"

বন্ধুগণ! আজ আমার প্রাণেও সেই ভাবের উদয় হইয়াছে। কারণ জগতের ভাববাদিগণ যখন বলিতেছেন, শীঘ্রই এক মানব-জাতীয়ধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া জগতে সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয় হইবে। তখন ধর্ম্মজগতে আর কোন বাদ বিসম্বাদ থাকিবে না। কিন্তু হায়! আমারও তো সেইরূপ বয়স হইয়াছে আর কত দিন না বাঁচিয়া থাকিব? আমি বাঁচিয়া থাকা পর্য্যন্ত যদি তাহা দেখিয়া যাইতে না পারিলাম তবে আর আমার শান্তি কোথায়? আমরা যখন সকলেই একই পরম পিতা পরমেশ্বরের সন্তান, তখন আপনারা যে, আমার পরম আত্মীয় তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। আমার শুভাশুভ যেমন আপনাদের উপর নির্ভর করে, সেইরূপ আপনাদেরও শুভাশুভ কতক পরিমাণ আমার উপর নির্ভর করে বলিয়াই মনে হয়। আমি আজ সেই ভ্রাতৃ প্রেমে প্রণোদিত হইয়া আমার প্রাণের কথা প্রকাশ করিতেছি। আশা করি আমার প্রিয় ভগিনী ও ভ্রাতাগণ তাঁহাদের এ অযোগ্য ভ্রাতার কথা ভাল মন্দ বিচার করিয়া গ্রহণের যোগ্য হইলে সাদরে গ্রহণ করিবেন এবং এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে জগতের একচ্ছত্রধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা প্রকাশ করিতেছি, তাহা যদি সত্য এবং হৃদয়-গ্রাহী হয়, তবে অনুগ্রহ করিয়া জগতের সর্ব্বত্র প্রচার করিতে অনুরোধ করি। এবং এই ভাব রক্ষা করিয়া ইহা হইতে আরও সূক্ষ্মানু-সূক্ষ্মতত্ত্ব ধর্ম্মজগতে প্রচার করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিবেন। আমি কোন উচ্চ শিক্ষিত বা কোন গ্রন্থ

লেখক নহি। আমি করুণাময়ের কৃপায় যে, আত্মতত্ত্ব অনুভব করিয়াছি, তাহা কোন রকমে একত্র সন্নিবেশ করিয়াছি মাত্র। অতএব আমার এই লেখার ভিতর ভাষা ও অন্য কোন বিষয়ে কোনও প্রকার ভুল ভ্রান্তি থাকিলে, তাহা ত্যাগ করিয়া শুধু ভাবটুকুই গ্রহণ করিয়া আমাকে বাধিত করিবেন।

কৃপাময়ের কৃপায় আমি হিন্দুর বেদ, পুরাণ, রামায়ণও মহাভারত, মুসলমানের কোর্-আন সরিপ, খৃষ্টীয়ানের বাইবেল ও ইঞ্জিল কেতাব (old Testament) প্রভৃতি জগতের ধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে স্পষ্টতঃ জানিতে পারিয়াছি যে, মানুষ অতি সহজ উপায়েই অমরত্ব লাভ করিতে সক্ষম হয়। (এখানে অমরত্বের অর্থ, যে পর্য্যন্ত বর্ত্তমান জগতে প্রলয় সঙ্ঘটিত না হয়, ততদিন জীবিত থাকা।) কিন্তু আমার এই অসম্ভব কথা শ্রবণ করিয়া হয় তো আমার জগতস্থ প্রিয় ভগিণী ও ভ্রাতাগণ যে, আমাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিবেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, কারণ আমরা এই পর্য্যন্ত জগতে কাহাকেও অমর দেখিতে পাই না। অধিকন্তু আমরা সকলেই নিজ চক্ষের সম্মুখে মানুষকে অনবরত মরিতে দেখিতেছি, এবং এই পর্য্যন্ত বর্ত্তমান যুগের কোন বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার ও কবিরাজগণও যখন কোন মৃতকে জীবিত করিতে সক্ষম হইতেছেনা, অথচ আমি একজন নগণ্য লোক হইয়া মানুষের অমরত্বের কথা প্রকাশ করিতেছি, তখন এইরূপ স্থলে মানুষের অমরত্ব লাভের কথা যে, নিতান্তই বাতুলের উক্তি, তাহা আপামর সর্ব্বসাধারণেই সমর্থন করিবে। তাহা সত্বেও আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে, সর্ব্বশক্তিমান করুণাময়ের কৃপায় আমি জগতের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল হইতে মানুষের অমরত্ব লাভের এক অতি সহজ উপায় উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হইয়াছি। হিন্দুদের বৈষ্ণবগ্রন্থের একস্থলে লেখা আছে যে,—"কহিবার কথা নয় তথাপি বাতুলে (ভাবের পাগলে) কয়, কহিলেই কেবা পাতিয়ায় (বিশ্বাস করে)।"

জগতের ধর্ম্মগ্রন্থসকল হইতে জানা যায় যে, করুণাময়ের কৃপায় সর্ব্বপ্রথম মানুষ অমৃতের সন্তানই ছিল। তারপর কাল প্রভাবে শয়তানের পরামর্শে করুণাময় ঈশ্বরের কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া মৃত্যুর সন্তান হইয়াছে বটে। কিন্তু করুণাময়ের কৃপায় কালপ্রভাবে এখন যুগান্তর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এবার ঈশ্বরের অনুগ্রহে যে, জগতের সকলেই যার যার কর্ম্মফলানুযায়ী আবার অমরত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইবে ইহা নিশ্চয়ই সত্য কথা। বর্ত্তমান যুগের মনুষ্যসমাজের পূর্ব্বপুরুষগণ যুগ-যুগান্তর ব্যাপিয়া বংশপরম্পরায় নিজ নিজ কর্ম্মদোষে করুণাময় ঈশ্বরের জ্যোতির্ম্ময়স্বর্গরাজ্য হইতে বিতারিত হইয়া শয়তানের মিথ্যাপ্রলোভনে চিরঅন্ধকারময় মৃত্যুরাজ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তাই হয় তো প্রথমতঃ আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে, মানুষের অমরত্বের কথা শুনিয়া যে, অনেকে নানারূপ ঠাট্টাবিদ্রূপ করিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? কিন্তু জগতের প্রত্যেক ধর্ম্মগ্রন্থেই, মানুষ কেন নানাপ্রকার ব্যাধিগ্রস্থ হইয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং কি প্রকারে অতিসহজে অমরত্বলাভ করিতে পারে, তাহা নানা আলঙ্কারিকভাবে নানাস্থানে বর্ণিত রহিয়াছে। মায়ামুগ্ধ জীব, তাহার প্রকৃতমর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া ঐ সকল স্থানের নানা বিকৃত অর্থ করিয়া একে আর করিয়া বসিয়া আছে। সে যাহা হউক যদি, বেদ, কোর্-আণ ও বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ ঈশ্বরবাক্য হয় এবং তাহা যদি ভুলপ্রমাদে পরিপূর্ণ না হইয়া থাকে, তবে আশা করি কৃপাময়ের কৃপায়, আমার এ বাক্য নিশ্চয়ই সত্যে পরিণত হইবে। বিশেষতঃ প্রকৃতপ্রস্তাবে ঐ সকল ধর্ম্মগ্রন্থ যখন জগতের ধর্ম্মবিশ্বাসী মণীষীগণ সকলেই ঈশ্বর বাক্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন, তখন সকল দেশের সকল মনুষ্যগণই যে, অতি সহজ উপায়ে অমরত্বলাভ করিতে সক্ষম হইবে, ইহাও ধ্রুব সত্য। আমি ঐ সকল ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে করুণাময়ের কৃপায়

মানুষের অমরত্ব লাভের যে, সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়াছি, তাহা জানাইবার জন্য, আমার জগতস্থ প্রিয় ভগ্নী ও ভ্রাতাগণকে বিনীত ভাবে অতি সাদরে আহ্বান করিতেছি এবং ইহার ভাল রূপ তথ্য অবগত হইয়া সত্যাসত্য নিরূপণ করিয়া গ্রহণের যোগ্য হইলে, তবে গ্রহণ করিয়া, জগতের সর্ব্বত্র প্রচার করিতে অনুরোধ করিতেছি।

বেদ, পুরাণ, কোর্-আণ ও বাইবেল প্রভৃতি জগতের সকল ধর্ম্মগ্রন্থের মূল তত্ত্ব যে, একই বস্তু শক্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, অক্ষরে অক্ষরে আমি তাহা সমস্ত মনুষ্য জাতিকে হৃদয়ঙ্গম করাইতে সক্ষম হইব বলিয়া আশা করি। মানুষের অমরত্ব লাভের উপায় কোনও মানুষ জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারা উদ্ভাবন করিতে সক্ষম হয় না। তবে যুগ প্রভাবে করুণাময়ের কৃপায় যুগান্তর আসিয়া উপস্থিত হইলে, তিনি কৃপা করিয়া যাহাকে জ্ঞাপন করেন, তাহার উহা অতি সহজেই উপলব্ধি হইয়া থাকে। সর্ব্বশক্তিমান করুণাময়ের কৃপায় পঙ্গু গিরিলঙ্ঘন করিতে সক্ষম হয়, মুক বাচাল হয়, অন্ধের চক্ষু প্রস্ফুটিত হয়। মুসলমানদের কোর্-আন মজ্বিদে বলে—"জগতে সত্য বাণী প্রচার করাই প্রত্যেক নবি বা প্রেরিত পুরুষের কর্ত্তব্য"। কোর্-আন মজ্বিদে আরও বলে—"তিনি রহস্যময়" অর্থাৎ তিনি যাহাকে ইচ্ছা প্রেরিত্ত দান করিয়া জগতের রহস্য সকল জ্ঞাপন করেন।"

আমি আজ প্রায় পাঁচ বৎসর যাবৎ জাগ্রত অবস্থায় দিবা রাত্র অনবরত অনন্ত আকাশে বংশী ধ্বনি বা শিঙ্গাধ্বনি স্বরূপ এক উচ্চ সুমধুর "সুরধ্বনি" শুনিয়া আসিতেছি এবং তাহা হইতে প্রত্যা-দিষ্ট হইয়া সর্ব্বশক্তিমান করুণাময়ের কৃপায় যে, আত্মতত্ত্ব অনুভব করিয়াছি, এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে তাহার যৎকিঞ্চিৎ জানাইতেছি। জগতে ধর্ম্মতত্ত্ব বা আত্মতত্ত্ব বহু গবেষণা পূর্ণ না হইলে, তাহা সহজে কেহ বিশ্বাস করিতে চাহে না, তাই আমি যথাসাধ্য আমার গ্রন্থের ভাব রক্ষার্থে জগতের অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে স্থানে স্থানে

কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। অতএব যদি তাহার ভিতর কোনও বিষয় জগতের কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কোনওরূপ আপত্তি জনক ঘটনা বা কোনও প্রকার ভুল ভ্রান্তি বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে আমি তাহা সাদরে পরিবর্ত্তন করিয়া লইব। কেন না জগতের কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপর কোনও প্রকার বিদ্বেষ ভাব প্রচার করা আমার উদ্দেশ্য নহে। অর্থাৎ জগতের কাহারও ধর্ম্মশাস্ত্র আমি হিংসার চক্ষে দেখিনা বা তাহা অস্বীকার করিনা। বরং উহাতে আমার সম্পুর্ণ বিশ্বাস আছে। বর্ত্তমান সময়কে হিন্দু শাস্ত্রে কলিযুগ বলিয়া উল্লেখ করিতেছে। প্রলয়ের পর পৃথিবীতে সৃষ্টি কার্য্য আরম্ভ হইয়া যখন মানুষের বাসস্থান রূপে পরিণত হয় তখন তাহাকে সত্য যুগ বলিয়া কথিত হয়। তাহার পর ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এবং সর্ব্বশেষে কল্কি অবতারের যুগশেষ হইলে, আবার প্রলয়, প্রলয়ের পর পুনঃ সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয় এইরূপ যুগ যুগান্তর চলিয়া আসিতেছে। যেমন আমরা দিবা এবং রাত্র অনবরত আসিতে এবং যাইতে চাক্ষুষ দেখিতে পাই, ইহার ভিতর যেমন দিন জ্যোতির্ম্ময় এবং রাত্র তমসাচ্ছন্ন, তদ্রূপ সৃষ্টি এবং স্থিতি প্রকাশমান এবং প্রলয় তমসাচ্ছন্ন, দিবা রাত্রির অনুরূপ জগতে সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ও বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অনবরত যেমন দিবারাত্রির পরিবর্ত্তন হইতেছে, সেইরূপ যুগযুগান্তরের পরে সর্ব্বশক্তিমান করুণাময়ের সৃষ্টি কৌশলে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে সৃষ্টি, স্থিতি, ও প্রলয় সংঘটিত হইয়া আসিতেছে। হিন্দু শাস্ত্র মতে বুঝা যায় যে, সত্য যুগে মানুষের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-কাল-রূপ-বৃক্ষ অঙ্কুরিত হয়, ত্রেতায় উহাতে কাণ্ড বা গুড়ি বাহির হয়, দ্বাপারে ঐ বৃক্ষ, শাখাপ্রশাখায় পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহার পর কলিতে উহা মুকুলে অর্থাৎ কলিতে বা কুঁড়িতে সুশোভিত হয়। ঐ কলি বা কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হইলেই উহাকে কল্কি বা পুষ্পবন্ত যোগ বলিয়া কথিত হয়। সর্ব্বশেষে

ফলন্ত যোগ বা প্রলয়। এই ফলন্ত যুগকে প্রলয় বলিবার কারণ, যেহেতু ঐ বৃক্ষফল বিষময় বা সংহারক স্বরূপ। আমরা কতকগুলি ফুল বর্ত্তমানে দেখিতে পাই উহা প্রস্ফুটিত হইলে কল্কি সদৃশই দেখায়।

যেমন করবী ফুল ও ধুতরা ফুল। ঐ দুই ফুলে মধু, ফলে বিষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহাই বিষামৃত একঠাঁই। জগতে পুষ্পবন্ত যুগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যুগ। কেননা হিন্দুশাস্ত্রে এই যুগে বিষ্ণু, মুসলমান শাস্ত্রে ইমাম মধি (মধু)ও খৃষ্টীয়ান শাস্ত্রে ঈশা বা প্রভু যীশুখৃষ্টের পুনরাগমন নির্দ্দেশ করিতেছে। হিন্দুগণ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত যথা শৈব এবং বৈষ্ণব। শৈবগণ, শিব, অর্থাৎ হরকে ও বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু অর্থাৎ হরিকে আরাধনা করিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ হর এবং হরিকে একই অর্থবোধক বলিয়াও ব্যাখ্যা করেন। ধূতরা ফূল হর এবং করবী ফুল হরি শক্তি সদৃশ। যখন চন্দ্র এবং সূর্য্য একত্র মিলিত হইয়া উদিত হয়, তখনই পুষ্পবন্ত যুগ বা কল্কি যুগের আবির্ভাব হয়। প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশের শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীগৌরাঙ্গদেব, এই পুষ্পবন্ত যুগের কথা ইঙ্গিতে প্রথম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তাই বৈষ্ণবদের চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয়, "চন্দ্রসূর্য্যসহোদিতৌ" অর্থাৎ চন্দ্র এবং সূর্য্য একত্রে উদিত, এই শ্লোকটি গ্রন্থের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন। এস্থলে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে চন্দ্র সদৃশ এবং প্রভু নিত্যানন্দকে সূর্য্যসদৃশ রূপকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। অথবা শ্রীগৌরাঙ্গকেই একাধারে চন্দ্র এবং সূর্য্যের মিলন স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। হিন্দু শাস্ত্রে বলে, "যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে তাহা আছে মানবের দেহ ভাণ্ডে।"

তাই হিন্দুর শিব সংহিতায় বলিতেছে :—

"দেহহস্মিন্ বর্ত্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপসমন্বিতঃ
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ ॥

ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা।
পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্ত্তন্তে পীঠদেবতাঃ ॥
সৃষ্টিসংহার কর্ত্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশিভাস্করৌ।
নভো বায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথী তথৈবচ ॥
ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বাণি মে মতঃ।
মেরুং সংবেষ্ট্য সর্ব্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে ॥

অর্থাৎ হিন্দুশাস্ত্রে আর্য্য ঋষিগণ, স্থির করিয়া গিয়াছেন যে,—নরদেহ, সপ্ত সমুদ্র সপ্ত দ্বীপা পৃথিবী, সুমেরু গিরি, সমস্ত নদ, নদী, পর্ব্বত মুনি, ঋষি, গ্রহ, নক্ষত্র, পুণ্যতীর্থ বাস করিতেছে। বিশেষতঃ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত, স্বর্গ, মর্ত্ত্য পাতাল এবং জগতের মধ্যে যত জীব আছে এবং ঐ সকল বস্তু মেরুদণ্ড বেষ্টন করতঃ স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত আছে। ইহা হইতে স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, আমাদের মানব-দেহেও চন্দ্র এবং সূর্য্য বিদ্যমান আছে। স্ত্রীজাতি, প্রায়ই চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে পুস্পবতী বা ঋতুবতী হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঐ সময়ে তাহাদের দেহে, চন্দ্রশক্তি বা স্ত্রীশক্তি এবং সূর্যশক্তি বা পুরুষশক্তি একত্র মিলিত হইয়া উদিত হয়। তাই স্ত্রীলোক প্রথম ঋতুবতী হইলে, তাহাকে পুস্পবতী বা ঋতুবতী হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

যদিও জগতে প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই সচরাচর ভূকম্পন সংঘটিত হয় এবং কোন কোন সময়ে রবি ও সোমবারে আমাবস্যা সংঘটিত হইয়া থাকে বটে তথাপিও শ্রীগৌরাঙ্গের আবির্ভাব হইতে আজ প্রায় পাঁচশত বৎসর পর গত সন ১৩৪০ সালের ১লা মাঘ তারিখে অমাবস্যা তিথি, রবি এবং সোমবার অর্থাৎ সূর্য্য এবং চন্দ্রের মিলিত অবস্থায় পড়াতে' ভারতবাসীকে এক মহা ভূকম্পন দ্বারা সৃষ্ঠীকর্ত্তা, পুষ্পবন্ত যুগ বা বিষ্ণুর আবির্ভাবের কথা প্রচার করিয়া গেলেন। ইহা হয়ত সকলে সহজে অনুভব করিয়া উঠিতে

পারিবে না। কারণ হিন্দুর বৈষ্ণব গ্রন্থে বলে—"মায়ামুগ্ধ জীবে জীবে নাই কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান।" যেমন হিন্দু শাস্ত্রে কল্কি অবতার বা বিষ্ণুর আবির্ভাবের কথা উল্লেখ আছে, তদ্রূপ মুসলমান শাস্ত্রেও ইমাম মাধির এবং খৃষ্টীয়ান শাস্ত্র ঈশা বা প্রভু যীশুখৃষ্টের আবির্ভাবের কথা উল্লেখ আছে। জগতে কাহারও ধর্ম্মশাস্ত্র মিথ্যা হইতে পারে না। ইহা হইতে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, একই ব্যক্তি, হিন্দুর নিকট কল্কি অবতার, মুসলমানের নিকট ইমাম মাধি এবং খৃষ্টীয়ানদের নিকট ঈশা বা প্রভু যীশুখৃষ্ট নামে জগতে পরিচিত হইবেন এইমাত্র প্রভেদ।

জগতের সকল ধর্ম্ম গ্রন্থই যে, একই মূলবস্তুতত্ত্বের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত, আমি অতি সঙ্খেপে এখন তাহার যৎকিঞ্চিৎ যথাসাধ্য ভাবে আভাস দিতেছি। ইহা হইতে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হইবে যে, পূর্ব্বে সকল আর্য্যজাতিই একস্থানে বাস করিতেন। এবং তাঁহাদের ধর্ম্মমতও এক ভাবাপন্নই ছিল। তারপর কালক্রমে যাঁর যাহা সুবিধামত স্থানে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় দেশ, কাল ও পাত্র বিচারে সেই ধর্ম্মতত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন আলঙ্কারিকভাবে পরিপূর্ণ থাকা সত্বেও মূলবস্তুতত্ত্ব সকলেরই একই রূপ। অথবা জগতের আত্মতত্ত্ব বা ধর্ম্মতত্ত্ব যে, একই মূল পদার্থের ভিতর নিহিত তাহা সকল দেশের ভগবদ্ভক্তগণই অনুভব করিয়া থাকেন। এইহেতু, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টীয়ান ও য়ীহুদী প্রভৃতি জগতের সকল ধর্ম্মগ্রন্থেরই মূল বস্তুতত্ত্ব একই ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জগতে সকল দেশের মনুষ্যজাতিইতো ধর্ম্ম লইয়া বাদবিসম্বাদ করিয়া থাকে। এই ধর্ম্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ যে কি, তাহাই অগ্রে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। হিন্দুদের সংস্কৃত ভাষায় ধৃ ধাতু মন্ প্রত্যয় করিলে "ধর্ম্ম" এই পদ সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ আত্মাধারণ করিয়া থাকে যাহাতে বা যে বস্তুতে। অতএব আপনারা হয়তো অনেকেই অবগত আছেন যে, আত্মরক্ষাই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, যদ্দ্বারা জগতের বৃক্ষ লতা হইতে জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ প্রভৃতি সকলের দেহ বা শরীর পোষণ হয়, তাহাই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এইজন্যই হিন্দুশাস্ত্র বলে,— "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনম্" অর্থাৎ সর্ব্বাগ্রে শরীর রক্ষাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সাধারণতঃ আমরা সকলেই সহজ জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করিতে পারি যে, শুধু সেবা বা আহার্য্য বস্তু গ্রহণের দ্বারাই শরীর রক্ষা বা আত্মরক্ষা হইয়া থাকে। অতএব সেই সেবাই জগতের সাধারণ বা সহজ ধর্ম্ম। এখন ভাবিয়া দেখুন, জগতের হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টীয়ান, য়ীহুদি এবং নাস্তিক প্রভৃতি মনুষ্যগণ হইতে বৃক্ষলতা, জীবজন্তু ও ক্রিমিকীট পর্য্যন্ত কেহই সেবা ব্যতীত বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। আমি যদি বাঁচিয়া না থাকি তবে

আর আমার ধর্ম্ম কোথায়? আমি আছি বলিয়াই আমার ধর্ম্ম আছে। অতএব ইহা হইতে স্পষ্টতঃই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, সেবাই আমাদের পরম ধর্ম্ম। এখন অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত্ত যে, এই সেবার মূলবস্তু কোথায়? সেবার সেই মূলবস্তু নির্দ্দিষ্ট হইলেই সর্ব্ববাদিসম্মত জগতের সহজ ধর্ম্ম নির্ণয় করা যাইতে পারে। এই সহজ শব্দের এক অর্থে সোজাও বলা যায় এবং অন্যার্থে সহ অর্থাৎ দুইয়ের মিলনে জন্মায় যাহা বা চন্দ্র ও সূর্য্য শক্তির সম্মিলনে আমরা যে খাদ্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহাই সহজ বস্তু বা সহজ ধর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। হিন্দুদের কোন কোনও বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক সম্প্রদায় এই সহজ বস্তু সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পোষণ করিয়া থাকে। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, তাহাও মানব দেহস্থ চন্দ্র এবং সূর্য্য শক্তির মিলিতাবস্থা হইতেই উৎপন্ন বস্তু বটে। জগতের সকল ধর্ম্মাবলম্বিগণইতো মুখে ভগবানের নাম করিয়া থাকে। কেহ কেহ বলে তিনি নিরাকার, কেহ কেহ বলে তিনি সাকার, আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকে, আমি যতক্ষণ বাঁচিয়া আছি ততক্ষণ তিনি সাকার, আমার অভাবেই তিনি নিরাকার। সে যাহা হউক জগতের ভিতর অনেকেই হয়তো ভগবানের স্বরূপ ব্যক্তি রূপেই চিন্তা করিয়া থাকে। কিন্তু বস্তু হইতেই যে, ব্যক্তির উৎপত্তি হয়, তাহা ভাবিয়া দেখিতে কেহ বড় একটা অবসর পায় না। হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র বলে, "বস্তুতত্ত্ব সূক্ষ্মজ্ঞানে জীবের ব্রহ্মভাব উদয় হয়।" বৈষ্ণবদের চৈতন্যচরিতামৃতগ্রন্থে কৃষ্ণকে বস্তু বলিয়াই নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছে; এবং শুধু বস্তুতত্ত্ব নিরূপন করাই চৈতন্যচরিতামৃতের মুখ্য উদ্দেশ্য। জগতে এই বস্তুরই বা উৎপত্তি কোথা হইতে হইল? এখন তাহাই বিচার্য্য বিষয়।

প্রথমতঃ আমাদের দেখা উচিত যে, সেবাই যখন সর্ব্ব জীবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সেই সেবার বস্তু কি কি এবং তাহা কোন্ কোন্ উপাদানে গঠিত হইয়াছে? সাধারণতঃ আমরা দেখিতে পাই সেবার

মূল বস্তু অন্ন এবং জল অর্থাৎ দানা এবং পানি বা খাদ্য ও পানীয়। এই দুই বস্তু লইয়াই প্রধানতঃ জগতে সেবার কার্য্য চলিতেছে। হিন্দুর শ্রীমৎভাগবৎগীতা এক হিসাবে সর্ব্ববাদিসম্মত ধর্ম্ম গ্রন্থ। কারণ উহাতে শুধু অর্জ্জুন সদৃশ জীবাত্মা ও শ্রীকৃষ্ণ সদৃশ পরমাত্মার কথোপকথন প্রশ্ন ও উত্তরচ্ছলে বর্ণিত রহিয়াছে। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শ্লোকে বলিতেছে, "ভূত সকল অন্ন হইতে উৎপন্ন হয়, বৃষ্টি হইতেই অন্নের উৎপত্তি, বৃষ্টি যজ্ঞ হইতে এবং যজ্ঞ কর্ম্ম হইতে সমুদ্ভূত হয়। কর্ম্ম ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন জানিও, ব্রহ্ম অক্ষর হইতে জাত, অতএব সর্ব্ব ব্যাপী ব্রহ্ম সদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন"। গীতায় অক্ষর পর্য্যন্তই শেষ করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায়, অক্ষর আবার রেখা হইতে, রেখা বিন্দু হইতে, বিন্দু বা বিন্দ জল বা রসময় পদার্থ হইতেই উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ বিন্দু বা বিন্দ বলিতে গেলে জলীয় বাষ্পের সুক্ষ্মতম কণাকেই বুঝায়। হিন্দু আর্য্যঋষিগণ এই জন্যই সর্ব্বত্র বলিয়া গিয়াছেন যে, ভগবান রসঘণস্বরূপ এবং অনাদির আদি গো-বিন্দ। হিন্দু শাস্ত্র মতে বুঝাযায়, জল বা রসময়পদার্থ আদিপুরুষশক্তিস্বরূপ এবং অন্ন বা খাদ্যবস্তু মাত্রই তাহার প্রকৃতিশক্তিস্বরূপ। এই অনন্ত পুরুষ শক্তি ও প্রকৃতিশক্তির মিলন হইতেই জগতের যাহা কিছু সৃষ্টি হইয়াছে।

যেমন পুষ্পের ভিতর সুবাস (Essence) বর্ত্তমান থাকে সেইরূপ অন্ন বা খাদ্য বস্তু এবং জল বা রসময় পদার্থ শক্তির ভিতরে ও ব্রহ্মজ্যোতি বা অনন্ত প্রকৃতি পুরুষের প্রাণ বা বীজ জ্যোতির্ম্ময় রূপে পুষ্পের সুবাসের ন্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। মানুষকে দেহ রক্ষা করিবার জন্য যেমন খাদ্য ও পানীয় বস্তু গ্রহণ করিতে হয়, তদ্রূপ দেহস্থ মনের ও খাদ্যের আবশ্যক হয়। ভগবানের নামকীর্ত্তণ, স্মরণ ও তাহার গুণাবলী শ্রবণ প্রভৃতি কার্য্যই মনের প্রকৃত খাদ্য।

খাদ্য ও পানীয় শক্তিস্বরূপ প্রকৃতিপুরুষ জগতে নিত্য বস্তু। এই নিত্য হইতেই লীলার উৎপত্তি হয়। এই জন্যই নিত্য এবং লীলা জরীভূত বলিয়া কথিত হয়। ভাবিয়া দেখিলে ইহা বেশ বুঝা যায়, নিত্য হইতেই লীলার উৎপত্তি হয় বটে, কিন্তু লীলা কখনও নিত্য হইতে পারে না। এই জন্যই হিন্দুর বৈষ্ণব গ্রন্থে বলে " নিত্য হইতে লীলা হয়, লীলা কভু নিত্য নয় " অর্থাৎ যেমন দুগ্ধ হইতে ঘৃত উৎপন্ন হয় কিন্তু ঘৃত কখনও দুগ্ধে পরিণত হইতে পারে না। ইহা হইতেই বোধ হয় মুসলমানদের কোর্-আন শরিফে বলে, " মানুষ কখনও আল্লা হইতে পারে না "। কিন্তু নিত্য হইতে লীলা মধুর বটে, ইহা স্বীকার করা যাইতে পারে। যখন নিত্য বস্তুশক্তিরূপ প্রকৃতিপুরুষের নাম ও ক্রিয়াকলাপের সহিত যে কোনও ব্যক্তির নাম, ক্রিয়াকলাপ ও জীবনচরিত প্রায় সর্ব্বতোভাবে মিশিয়া যায়, তখনই দেশ, কাল, ও পাত্র বিচারে ঐ সকল ব্যক্তির ভিতর কেহ নবি, কেহ রছুল, কেহ আংশিক অবতার, কেহ পূর্ণ অবতার, কেহ ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া ধর্ম্ম জগতে কথিত হয়। জগতের কেহ শুধু নিত্যকে, কেহ শুধু লীলাকে এবং কেহ লীলা ও নিত্য উভয়কেই আশ্রয় করিয়া দেশ, কাল, ও পাত্র বিচারে মানুষ ধর্ম্ম জগতে এক এক পথ অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। হিন্দুগণ সাধারণতঃ লীলাকেই নিত্য অপেক্ষা মধুর জ্ঞান করিয়া শুধু লীলাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে।

মুসলমানদের কোরআন্ শরিফে বলিতেছে, [হে নবি,] " আমি [আমার স্বরূপের] শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি তোমার পূর্ব্বেও মণ্ডলী সমূহের জন্য [নবি] প্রেরণ করিয়া ছিলাম, কিন্তু শয়তান [ঐ সকল লোককে] তাহাদের [কু] কর্ম্মাবলী শোভনীয় করিয়া দেখাইয়াছিল, সেই [শয়তান] এ যুগের এই সকল [কাফের গণের] বন্ধুরূপে অগ্রসর। তাহাদের জন্য কঠোর দণ্ড। " এস্থলে " আমার স্বরূপ " অর্থে কোন মূর্ত্তি বুঝাইতেছেনা। যেমন পুষ্পের ভিতর সুবাস

(Essence) থাকে সেইরূপ রসঘনস্বরূপ একতনাদিরআদি অনন্ত শক্তি যা জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মকেই সর্ব্বভূতের বীজ বা উৎপত্তির কারণ অর্থাৎ অঙ্কুরের সুক্ষ্মাবস্থা নির্দ্দেশ করিতেছে। হিন্দুর গীতার দশম অধ্যায়ের ৩৯শ শ্লোকে ভগবান্ বলিতেছেন, "হে অর্জ্জুন যাহা সর্ব্বভূতের বীজ বা উৎপত্তির কারণ তাহা আমি, যেহেতু আমি ব্যতীত যাহা থাকে, এরূপ চর বা অচর ভূত নাই (আমি ছাড়া আর কিছুই নাই)"। "এই বীজ অর্থাৎ অঙ্কুরের সুক্ষ্মাবস্থা। এই বীজই প্রাণ। যে বস্তু দ্বারা যাহার সত্বা নির্দ্দেশ হয় সেই বস্তু তাহার প্রাণ। এবং প্রাণ নাশে তাহার সত্বা লোপ হয় বলিয়া কথিত হয়, যেমন জলের প্রাণ রস, রস গত হইলে জলের নাশ হয় বলিয়া উক্ত হয়। সেইরূপ রসের ও প্রাণ আছে। অর্থাৎ যে বস্তু দ্বারা রসের সত্বা বোধ হয় তাহাই তাহার প্রাণ। ক্রমান্বয়ে বিচারে সর্ব্ব সুক্ষ্ম ব্রহ্মই শেষ কারণ ও সকল বস্তুর প্রাণ বলিয়া কথিত হয়"। মুসলমানদের কোর্-আনে এই সর্ব্ব শক্তিমান ব্রহ্মকেই আল্লাহু বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। আবার হিন্দু শাস্ত্রে বলিতেছে যে, এই ব্রহ্ম অক্ষর হইতে উৎপন্ন। অক্ষর অর্থ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, অবিনাশী। অন্যার্থে যাহা ক্ষরে না বা বিনা কারণে পতিত হয় না। খৃষ্টীয়ানগণ এই ব্রহ্মকেই পবিত্র আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ভগবানকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছে, এইরূপ লোক জগতে কাহাকেও দেখা যায় না। সকলেই তাঁহাকে শুধু হৃদয়ে অনুভব করিয়া থাকে মাত্র এবং তাই নাস্তিক ব্যতীত সকলেই "ভগবান আছেন" শুধু এই কথাই বলিয়া আসিতেছে। আবার শুনিতে পাই, বর্ত্তমান রুশিয়ার বল্‌শেভিক ভগ্নী ও ভ্রাতাগণ ও নাকি ভগবানের অনুভূতি পর্য্যন্ত হারাইয়াছে।

তাহারা বলে, "ভগবান নাই, যত কর্ম্মকুণ্ঠ লোকেরা এক কল্পিত ভগবানের নাম করিয়া জগতকে ধর্ম্মের ভয় দেখাইয়া শুধু অর্থোপার্জ্জন করিয়া নিজেদেরই উদর পূরণ করিতেছে"। আচ্ছা বন্ধুগণ, রুশিয়ার বল্‌শেভিক্‌গণ এবং জগতে আরও কোন দেশে যদি

কেহ নাস্তিক থাকে, তবে তাহারা ব্যতীত আমরা আর সকলেই তো ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া আসিতেছি। হিন্দু শাস্ত্রে বলে, " অনুমানে ভজন নাস্তি ভজন বর্ত্তমান " অর্থাৎ প্রত্যক্ষ ব্যতীত ধ্যান হইতে পারে না। এখন কথা হইতেছে যে, মানুষ যদি নিজের অবয়বের ন্যায় ভগবানের স্বরূপ মনে করিয়া ধ্যান ধারণা করে তবে মনুষ্য হইতে পশু, পক্ষী, ক্রিমী, কীট, বৃক্ষ ও লতা প্রভৃতির এক অবয়ব বিশিষ্ট ভগবান হইতে পারে না। কারণ মানুষের ন্যায় ঐ সকল প্রাণীদেরও যদি ভগবান বিষয়ে অনুভূতি থাকে, তবে তাহারও হয়তো তাহাদের নিজ নিজ অবয়বের ন্যায় কোন একটি বিরাট মূর্ত্তিকে তাহাদের ভগবান স্বরূপ মনে করিয়া থাকিবে, ইহা নিশ্চয়ই সম্ভবপর কথা। কিন্তু জগতের সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই এক বাক্যে বলিতেছে যে, মনুষ্য হইতে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ ও লতা প্রভৃতি সকলেই একই ভগবানের সৃষ্ট জীব। এই হিসাবে দেখা যায়, অন্ন বা খাদ্য বস্তু এবং জল বা রসময় পদার্থস্বরূপ অনন্তপ্রকৃতিপুরুষশক্তিকেই বস্তু তত্ত্ব হিসাবে প্রত্যক্ষ ভাবে এই অর্থে সর্ব্বজীবের ভগবানের স্থূল স্বরূপ ধরা যাইতে পারে। এই জন্যই বোধ হয় হিন্দুগণ জলকে নারায়ণ এবং অন্নকে লক্ষ্মীস্বরূপিনী বা ব্রহ্মশক্তি বলিয়া থাকে। বান অর্থাৎ জল বা রসময় পদার্থ শক্তি নিজের দেহ হইতে ভগ অর্থাৎ অন্নকে প্রকৃতি রূপে সৃষ্টি করিয়া, সেই ভগ বা অন্ন হইতেই জগতের ভূত সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। এই রসময় পদার্থ বা জল এবং অন্ন, স্থূল ও সুক্ষ্ম ভাবে জগতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমরা স্থূল জলকে চাক্ষুষ দেখিতে পাই, কিন্তু তাহার সুক্ষ্ম হইতে সুক্ষ্মতমাবস্থা শুধু মাত্র হৃদয়ে অনুভব করিয়া থাকি। যাহাকে পণ্ডিতগণ পরব্যোম্ বা শ্রেষ্ঠ বাষ্পীয় তরল পদার্থ অথবা ইংরাজিতে যাহাকে (Ether) বলে, তাহাই জল বা রসময় পদার্থের সুক্ষ্ম স্বরূপ এবং আমরা যে জল পান করি তাহাকে স্থূল স্বরূপ বলা যাইতে পারে। তাই বোধ হয় হিন্দু শাস্ত্রে জলকে জীবন বলিয়াও কথিত

হয়। পরব্যোম বা পরমাত্মা হইতেই ব্যোমের সৃষ্টি হইয়াছে। এই ব্যোম হইতেই মরুৎ, মরুৎ হইতে তেজ, তেজ হইতে অপ্, অপ্ হইতে ক্ষিতি এবং তাহা হইতে মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্ট প্রকার প্রকৃতি সৃষ্টি হইয়াছে। এইরূপে পরমাত্মা বা পরব্যোম হইতে বিশ্ব সংসার সৃষ্টি হইয়াছে। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বাঙ্গলার তাঁরা-পীঠের সাধক বামা ক্ষেপা বলিয়াছেন—"পঞ্চ ভূতেই জগত সৃষ্টি হইয়াছে যথা ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ও ব্যোম। জগৎ ধ্বংস হইয়া ইহাতেই বিলীন হয়। জগতে সব জিনিষই পঞ্চভূতময়, ধ্বংসের পর ঐ পাঁচ ভূতেই লয় প্রাপ্ত হয়। ক্রমে ঐ পাঁচ ভূতের মধ্যে চারিটি শেষের ভূতে, অর্থাৎ ব্যোমে মিশিয়া গিয়া মহাব্যোম রূপে পরিণত হয়। ঐ মহাব্যোম (পরব্যোম) অর্থাৎ মহাকাশে একটা সারভূতবীজ অর্থাৎ শক্তি আছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। তবে কাজে ইহা প্রকাশিত হয়"। এই বীজকেই কেহ আদ্যা শক্তি বা প্রকৃতিস্বরূপিনী, কেহ নিরাকারব্রহ্মজ্যোতি, কেহ ভগবান, কেহ-নিরাকারআল্লাহু ও কেহ-নিরাকারপবিত্রআত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করে। রসায়ন বিজ্ঞান বলে যে, "জল দুইটী বাষ্পীয়বস্তু যোগে উৎপন্ন হয়, তাহার একটি হাইড্রোজেন গ্যাস, অপরটি অক্সিজেন গ্যাস। আবার বায়ুও প্রধানতঃ দুইটি বাষ্পীয়বস্তু যোগে উৎপন্ন, একটি অক্সিজেন গ্যাস অপরটি নাইট্রোজেন গ্যাস"। তাহা হইলে দেখা যায় জল বায়ুর রূপান্তর মাত্র। আবার মাটীও জল হইতেই উৎপন্ন হয়। তেজকেও কোন কোন বৈজ্ঞানিকপণ্ডিত চক্ষুর অগোচর এক প্রকার জলীয়বাষ্প বলিয়াই ব্যাখ্যা করেন। ব্যোম ও এক অর্থে জলকেই বুঝায়। পরব্যোম অর্থও শ্রেষ্ঠ বাষ্পীয় তরল পদার্থ। অতএব পরব্যোম হইতে ব্যোম, মরুৎ, তেজ, অপ্ ও ক্ষিতি সকলেরই মূল পদার্থ একঅনন্তঅসীম সুক্ষ্মানুসুক্ষ্ম রসঘন-স্বরূপ জ্যোতির্ম্ময়বস্তুশক্তি। ভগবান নিরাকার এবং চৈতন্য-স্বরূপ, জগতের প্রায় সকলধর্ম্মগ্রন্থেই এই কথা বলিয়া আসিতেছে।

হিন্দুগণ বহু সাকারদেবদেবীর মূর্ত্তি পূজা করিলেও তাহারাও শেষে একনিরাকারচৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মকেই স্বীকার করিয়া থাকে। যেহেতু হিন্দু শাস্ত্রে ব্যাসদেব ভগবানকে বলিতেছেন,—

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যৎ কল্পিতং
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়অখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো যত্তীর্থযাত্রাদিনা
ক্ষন্তব্যং জগদীশ! তদবিকলতা দোষ
ত্রয়ং মৎকৃতম্ ”॥

অর্থাৎ তুমি রূপ বিবর্জ্জিত, আমি ধ্যানে যে তোমার রূপ কল্পনা করিয়াছি; তুমি অখিল গুরু ও বাক্যের অতীত, আমি স্তবের দ্বারা তোমার সেই অনির্ব্বচনীয়তা দূরীকৃত করিয়াছি; এবং তুমি সর্ব্বব্যাপী, অথচ আমি তীর্থ যাত্রাদি দ্বারা তোমার সেই সর্ব্ব ব্যাপীত্ব নষ্ট করিয়াছি; হে জগদীশ! মৎকৃত এই তিনটি বিকলতা দোষ ক্ষমা করুণ। ইহা হইতে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ভগবান সম্বন্ধে হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থের সর্ব্বশ্রেষ্ঠগুরু ব্যাসদেবের শেষ উক্তি ও মুসলমানদের কোর-আন মজিদে বর্ণিত আল্লাহুর সহিত সর্ব্বতো ভাবে মিলিয়া যাইতেছে। কেননা এস্থলে ব্যাস দেব ভগবানকে বলিতেছেন যে, তুমি বাক্যের অতীত, তুমি রূপ বিবর্জ্জিত এবং তুমি সর্ব্বত্র আছ। এখন আপনারা চিন্তা করিয়া দেখুন যে, পরিদৃশ্যমান অনন্ত আকাশ বা ব্যোম যে কত বৃহৎ এবং কোথায় যে ইহার শেষ হইয়াছে তাহা কেহ বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে না। তারপর যেপরব্যোম বা মহাকাশ হইতে ব্যোমের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই মহাকাশ আরও যে কত অনন্ত এবং কত অসীম তাহা কেহ ভাবিয়াই স্থির করিতে পারে না। তাই তাহাকে বাক্যের অতীত বলা হইয়াছে। জল বা রসময়পদার্থশক্তির কোন নির্দ্দিষ্ট আকার নাই, যখন যে পাত্রে থাকে তখন তাহারই আকার ধারণ করে, তাহা হইলে জল বা রসময়পদার্থশক্তিকেও এক হিসাবে নিরাকার বা রূপবিবর্জ্জিত বলা

যাইতে পারে। জলের রূপান্তর বায়ু, বায়ু সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছে। অর্থাৎ বায়ু আমাদের অন্তরেবাহিরে বিদ্যমান। অতএব বায়ু, জল বা রসময়পদার্থের সুক্ষ্মানুসুক্ষ্মশক্তিস্বরূপে সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছে। আমি যতক্ষণ বাঁচিয়া আছি ততক্ষণই আমার নিকট জগত বর্ত্তমান আছে। আমি জন্মিবার পূর্ব্বে আমার নিকট জগতের কোনও অনুভূতি ছিল না এবং আমি মরিয়া গেলেও আমার নিকট জগতের কোনও বর্ত্তমান অনুভূতি থাকিবেনা। তাহা হইলে দেখা যায় আমিই জগৎ। হিন্দু-শাস্ত্রেও তাহাই বলে, "যাহা আছে ব্রহ্মাণ্ডে, তাহা আছে মানবের দেহ-ভাণ্ডে"। অতএব পরিদৃশ্যমান এই সুবৃহৎ ব্রহ্মাণ্ড এবং আমাদের এই ক্ষুদ্র দেহভাণ্ড একই রূপ। কোনও সুবৃহৎ বস্তুকে বিশেষ রূপে জানিতে হইলে, তদুপযোগী বা তদ্ভাবাপন্ন কোনও ক্ষুদ্র বস্তুর পরিমাণ অগ্রে জানিতে পারিলে, পরে তদ্দারাই সেই সুবৃহৎ বস্তুকেও অতি সহজে জানা যাইতে পারে। তাই জগতের সমস্ত ধর্ম্ম গ্রন্থেই মানুষের উৎপত্তির কারণ বিশেষ রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই তদনুসারে জগতের উৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছে। আমাদের এই মানবদেহভাণ্ড বা মানবতনু, যেমন জল বা রসময় স্বরূপ পিতৃবীর্য্য এবং মাতৃরজঃ অর্থাৎ মাটীররসস্বরূপচন্দ্রশক্তি হইতে জাত অন্নের সংমিশ্রণে উৎপন্ন হইয়াছে, তদ্রূপ বাহিরের এই পরিদৃশ্যমান সুবৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডও যে, একসর্ব্বশক্তিমান অনাদিঅনন্ত জল বা রস-ঘন স্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম পদার্থ (নাদ বিন্দু) দ্বারা তাহার প্রকৃতি রেখা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। এবং মানুষের দেহ যেমন একপিতার বীর্য্য হইতেই উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডও একই ভগবানের সৃষ্ট পদার্থ।

"এক-অনাদিঅনন্ত জল বা রসঘনস্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মশক্তি হইতেই যে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে" আমার এই কথাটি নূতন নহে। জগতের পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু মনীষীগণও এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া গিয়াছেন, এবং জগতের বহুধর্ম্মগ্রন্থেও তাহার বহু প্রমাণ বর্ত্তমান রহিয়াছে

যথা—“ প্রাচীন গ্রীসদেশীয় তত্ত্বজ্ঞানের আদি-পুরুষ থেলিস্ বলিয়াছেন, “ আদিতে জল ছিল, জল হইতে সমস্ত চরাচর সমুদ্ভূত ”। থেলিসের শিষ্য এনাক্সি মাণ্ডার বলেন, “জগতের মূল পদার্থ অসীম, নিত্য অনির্দ্দেশ্য উহা হইতে সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং কালে ঐ সমস্ত পদার্থ উহাতেই লীন হয়। ”

আপনারা হয়ত অনেকেই অবগত আছেন যে, জগতের প্রায় সকল ধর্ম্ম গ্রন্থেই প্রলয় কালে জল প্লাবনের কথা উল্লেখ করিতেছে। ইহা হইতে বেশ বোঝা যায়, জল হইতেই সমস্ত পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং কালে ঐ সমস্ত পদার্থ জলেই লীন হয়।

এনাক্সি মাণ্ডারের শিষ্য পণ্ডিত এনাক্সি মিনিস্ বলেন, “ সর্ব্বব্যাপী বায়ুই জগতের মূল পদার্থ, বায়ু অবস্থাভেদে অগ্নি, মৃত্তিকা, সলিল প্রভৃতি পদার্থে পরিণত হইয়া থাকে।” আপনারা অনেকেই, ইহাও অবগত আছেন যে, জল বায়ুরই রূপান্তর মাত্র। বাঙ্গলার পণ্ডিত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর বলেন,—“ হিন্দু শাস্ত্রের বহু পুরাতন আয়ুর্ব্বেদে তৈত্তিরীয় সংহিতায় লেখা আছে, “আপোবা ইদমগ্রাসীৎ’ অর্থাৎ জলই সকলের আগেছিল তাহা হইতে অন্যান্য ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে”।

হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রে বলে, “ভগবান্ প্রজাপতি সর্ব্বপ্রথমে জল সৃষ্টি করেন, জলের অপর একটি নাম নার। নরের জীবন স্বরূপ, সেই জন্য নাম হইয়াছে নার। সৃষ্টিকালে এই নার বিষ্ণুর আশ্রয় হইয়াছিল। সেই জন্য বিষ্ণুকে নারায়ণ কহে। এই জলে বীজ নিক্ষিপ্ত হইলে, সেই বীজ হইতে একটি হিরণ্য বর্ণ অণ্ড উৎপন্ন হইল। সেই অণ্ডে ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করিলেন।

তাঁহার নির্গম কালে অণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত হইল। এক ভাগ স্বর্গ ও অন্য ভাগ পৃথিবী নামে অভিহিত হইল। স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে যে শূন্যময় স্থান রহিল, তাহাই আকাশ নামে কথিত হইল। ভগবান হিরণ্য গর্ভ এই প্রকারে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া সূর্য্য ও দশদিক সৃজন

করিলেন। দ্বিধা খণ্ডিত অণ্ড মধ্যে মন, বাক্য, কাম, কাল ও জড় পিণ্ডের সৃষ্টি ইহল। পরে সপ্ত প্রজাপতি সৃষ্ট হইল”।

ছন্দোঃ উপনিষদ বলিতেছে “হে শ্বেতকেতো! তুমি অন্নরূপ পৃথিবী কার্য্য হইতে জলরূপ মূল কারণ জানিবে। জল হইতে তেজোরূপ মূল এবং তেজোরূপ কার্য্য হইতে সদ্রূপ কারণ প্রকৃতিকে জানিবে। উক্ত সত্য স্বরূপ প্রকৃতি সমস্ত জগতের মূল গৃহ ও স্থিতির স্থান। এই সমস্ত সৃষ্টির পূর্ব্বে অসতের সদৃশ হইয়া জীবাত্মা, ব্রহ্ম এবং প্রকৃতিতে লীন থাকিয়া বর্ত্তমান ছিল, ইহার অভাব ছিলনা”। হিন্দু ধর্ম্ম গ্রন্থে আবার এক স্থানে বলিতেছে, “প্রজাপতি ব্রহ্মা জল হইতে তপ, তপ শব্দ শুনিয়া সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত তপ করিতে থাকেন। তার পর বিষ্ণু আসিয়া তাহাকে বলিলেন, তুমি যে জলের ভিতর হইতে তপ তপ শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলে, তাহা আমিই তোমাকে শুনাইয়াছিলাম”।

হিন্দুদেব গঙ্গা শব্দের অর্থ জলকেও বুঝায়, বিষ্ণুর পদ হইতে গঙ্গার উৎপত্তি। পদ শব্দের অর্থ শুধু চরণকেই বুঝায় না, পদ অর্থ উপাধি বা স্বরূপ কেও বুঝাইয়া থাকে। তাহা হইলে দেখা যায় বিষ্ণু বা নারায়ণ শব্দের ভাবার্থ জল বা রসময় পদার্থ শক্তিকেই বুঝায়। হিন্দুশাস্ত্রের কোন কোন স্থলে বলে, ঃ—“সনাতন বিষ্ণুই এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি, ও সংহার কর্ত্তা। তিনিই সর্ব্বভূতে আত্মারূপে বিরাজিত আছেন। তিনি পরামাত্মা স্বরূপ, তিনি অক্ষয়, অব্যয়, নিত্য পরমব্রহ্ম”। খৃষ্টীয়ানদের বাইবেলে বলিতেছে, “পৃথিবী গঠন রহিত ও শূন্য ছিল। গভীর স্থানে অন্ধকার ছিল। এবং ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর বিচরণ করিতেছিল। ঈশ্বর কহিলেন যে, জলের মধ্যে আকাশ হইবে, এবং জল হইতে জলের বিভাগ করিব, তখন ঈশ্বর আকাশ নির্ম্মান করিলেন। এবং আকাশের নিম্নস্থ জল হইতে আকাশের উপরিস্থিত জলের বিভাগ করিলেন তদ্রূপ হইল”। মুসলমান শাস্ত্রে বলে, “খোদার-

নুর হইতে মোহাম্মদ এবং মোহাম্মদের নুর হইতে সারে জাহান অর্থাৎ জগতের ভূত সকল উৎপন্ন হইয়াছে।” এই মোহাম্মদ শব্দের প্রকৃত অর্থ জল বা রসময় পদার্থ শক্তিকেই বুঝায়। মুসলমান শাস্ত্রে মোহাম্মদ শব্দের ভাবার্থ জল বা রসময় শক্তিরূপেই নানাস্থানে নানাভাবে বর্ণণা করিয়া রাখিয়াছে। ৫৭০ খৃষ্টাব্দে আরব দেশের মক্কানগরে যে, শেষ নবি খোদার রছুল মুস্তাফা মোহাম্মদ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন শুধু তাঁহাকেই বুঝায় না। কারণ ৫৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কি তবে এই পৃথিবীতে জীব জন্তু মনুষ্য প্রভৃতি ছিলনা? শেষ নবি হজরত মোহাম্মদের পূর্ব্বে ও বহু নবি বা মোহাম্মদ জন্ম গ্রহণ করিয়া খোদার আদেশে পৃথিবীতে সত্য সনাতন ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শেষ নবি হজরত মোহাম্মদ আল্লার রছুল বা বন্ধু ছিলেন, অতএব তিনি সকল নবির শ্রেষ্ঠ এই মাত্র প্রভেদ, কোরআন মজ্জিদের সূরা মোমেনে এইরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, “বস্তুতঃ আমি মানবকে মৃত্তিকার সার অর্থাৎ ছোলালাতেম্ মেন্‌তীন্ দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি”। মৃত্তিকার সার অর্থে অন্ন বা খাদ্য বস্তুকেই বুঝায়। হিন্দুর গীতায় ও তাই বলিতেছে,—“অন্ন হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়, অন্ন বৃষ্টি (অর্থাৎ জল বা রসময় পদার্থ) হইতে সমুদ্ভূত হয়। কোরআন্ এর আমপারার সূরা তারেকে বলা হইতেছে—“অতএব মানুষের দেখা উচিত যে, কোন বস্তু হইতে তাঁহাকে সৃজন করা হইয়াছে?—তাহাকে সৃজন করা হইয়াছে—বেগে বহির্গত—উচ্ছ্বসিত জল হইতে”।

কেহ কেহ বলে, জল বা রসময় পদার্থের পাত্র ব্যতীত কদাচও অবস্থিতি সম্ভবেনা। অতএব এই রসঘনস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুর যিনি পাত্ররূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি বিশ্বপ্রসাধিনী এবং তিনিই আদ্যাশক্তি। তাহা সত্য হইলেও আমরা সহজ জ্ঞান দ্বারা ইহাও বেশ উপলব্ধি করিতে পারি, যেমন যে জল হইতে মাটীর উৎপত্তি হয়, আবার অবস্থাভেদে সেই মাটীর পাত্রই জলের আধার স্বরূপ হইয়া থাকে, তদ্রূপ একঅনাদিঅনন্তরসঘনস্বরূপ ব্রহ্মবস্তু বা

নাদবিন্দুও তাহা হইতে উৎপন্ন তাহার প্রকৃতি রেখাকেই আশ্রয় করিয়া এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব একঅনাদি-অনন্তরসঘনস্বরূপ ব্রহ্মবস্তুই আধেয় এবং তিনিই অবস্থাভেদে নিজের আধার স্বরূপ প্রকৃতি শক্তিরূপে বা বিশ্বপ্রসবিণীরূপে (অন্ন বা খাদ্যবস্তুতে) পরে রূপান্তর প্রাপ্ত হন। ইহাই ধ্রুব সত্য।

তৃতীয় অধ্যায়।

খৃষ্টীয়ানদের বাইবেলে প্রভুযীশুখৃষ্টকে ঈশ্বরের পুত্র বলা হইয়াছে। যীশুশব্দের অর্থ ত্রাণকর্ত্তা। বাইবেলে বলিতেছে, "ভগবান আপনার পুত্রের রক্ত দিয়া জগতকে উদ্ধার করিলেন"। আপনারা সকলেই জানেন যে, সেবার বস্তুর দ্বারাই প্রধানতঃ স্থূল ভাবে জগতের প্রাণিগণ রক্ষা পায়। সেবার বস্তু বা আহার্য্য বস্তুই জগতকে স্থূলভাবে ত্রাণ করিয়া থাকে। বাইবেলে বলে,—"ঈশ্বরপুত্রযীশুখৃষ্টের রক্ত যাবতীয় পাপ হইতে আমাদিগকে শুচি করে। যেহেতু তিনি পাপীদিগের পরিত্রাণের জন্যই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন। খৃষ্টে বিশ্বাস স্থাপনাভিন্ন জীবের পরিত্রাণের উপায় আর নাই।" যীশু বলিতেছেন,—"হে পরিশ্রান্ত, ভারাক্রান্ত তৃষ্ণার্ত্ত পথিক সকল তোমরা আমার নিকট আইস, আমি তোমাদিগকে তৃষ্ণা নিবারণার্থে বিনা মূল্যে সুশীতল অমৃতজল দিব। [প্রেমময়-ঈশ্বর আমাদিগকে অনন্ত জীবন দিয়াছেন, সেই জীবন তাহার পুত্রে আছে] যাহারা আমাকে প্রেম করে, আমিও তাহাদিগকে প্রেম করি। [এবং যাহারা অতীন্দ্রিয় হইয়া আমাকে অন্বেষণ করে, তাহারাই আমাকে পায়।] [এক মাত্র সত্য ঈশ্বর ও তাঁহার পুত্র যীশুকে জ্ঞাত হওয়াই অনন্ত জীবন। খৃষ্ট আমাদের

যজ্ঞ। প্রভুর নাম দৃঢ়দুর্গস্বরূপ। ধার্ম্মিক লোক তাহাতে পলায়ন করিয়া রক্ষা পায়।]" এই যজ্ঞ শব্দের ভাবার্থ ভোজন বা সেবার কার্য্যকেই বুঝায়। এদেশের কোন বাড়ীতে ভোজনের আয়োজন হইলে সচরাচর তাকে যজ্ঞীবাড়ী বলা হইয়া থাকে। খৃষ্টীয়ানদেব "প্রভুভোজন" নামে একটি পার্ব্বণও আছে। হিন্দুর গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের পঞ্চদশ শ্লোকে বলিতেছে,—"সর্ব্বব্যাপীব্রহ্ম সদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত আছেন"। যজ্ঞ শব্দের ভাবার্থ যদি সেবা বা ভোজন ধরিয়া লওয়া হয়, তবে সেবার বস্তু মাত্রেই যে ব্রহ্ম তাহাও সুনিশ্চিত। তাই হিন্দুশাস্ত্রে অন্নকে ব্রহ্ম বলিয়াই কথিত হয়। ভক্ষ্যবস্তু, উদরস্থঅগ্নিতে আহুতি দেওয়াকেই প্রকৃত যজ্ঞ বলিয়া কথিত হয়। এইজন্যই হিন্দুশাস্ত্রে বলে, "রুচির ঔরষে যজ্ঞের জন্ম।" যীশু আর এক স্থানে বলিতেছেন,—"[আমি পথ্য, সত্য ও জীবন, আমাদিয়া না গেলে কেহই পিতার নিকট উপস্থিত হইতে পারে না।]" যীশু অর্থ যে সেবার বস্তুশক্তিস্বরূপ তাহা যীশুর ক্রুশে বিদ্ধ হইবার কালীন ঘটনাবলি বিচার করিয়া দেখিলেই আপনারা সকলে অতি সহজে বুঝিতে পারিবেন।

অদ্ ধাতু "ক্ত" প্রত্যয় করিলে অন্ন এই পদ সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ যাহা ভক্ষন করা যায় তাহাকেই অন্ন কহে। যে দেশের যে প্রাণীর যে বস্তু প্রধান খাদ্য, সেই দেশের সেই বস্তুই তাহার নিকট অন্ন বলিয়া কথিত হয়। যেমন বাঙ্গালা, চীন ও জাপান প্রভৃতি দেশে চাউলের ভাতই মানুষের প্রধান খাদ্য। অতএব তাহাই তাহাদের অন্ন। এইরূপে আরবে খেজুর, আয়র্লণ্ডে আলু, মেরু সন্নিহিতদেশে অর্থাৎ এস্কিমোদের জীবজন্তুরমাংস, ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতিদেশে ও ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গমের রুটীই প্রধানঅন্ন বলিয়া কথিত হয়। তৃণভোজীপশুপক্ষীদের তৃণই অন্ন এবং মাংসভোজী পশুপক্ষীদের মাংসই অন্ন। এই

প্রকার দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে এক খাদ্য ও পানীয়বস্তুশক্তিরূপ-ব্রহ্ম অনন্তপ্রকৃতিপুরুষের মিলনস্বরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্যোতি বা সর্ব্বভূতের বীজস্বরূপ নানারূপে বর্ত্তমান থাকিয়া জগতকে প্রতিপালন করিতেছে। এই খাদ্যবস্তু বা অন্নকে প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—একটি প্রাণিজ অর্থাৎ চলন্ত প্রাণিগণের শরীর হইতে প্রাপ্ত, আর একটি উদ্ভিজ্জ অর্থাৎ নিশ্চল প্রাণিগণ হইতে প্রাপ্ত বা মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থিত চন্দ্রশক্তি হইতে উৎপন্ন শস্যকণা এবং ফলমূল প্রভৃতি। জগতের সর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রাণিজখাদ্যের ভিতর গো, মেষপ্রভৃতি পশুদের দুগ্ধকেই অহিংস ও অপ্রাকৃত খাদ্য বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছে। যদিও গো, মেষ ও মহিষ প্রভৃতি দুগ্ধবতীপ্রাণিগণ হইতে দুগ্ধ সংগ্রহ করিবার সময় আমরা তাহাদের বৎসগণেরপ্রতি এক হিসাবে কিছু হিংসা করিয়া থাকি বটে তথাপিও তাহাতে তাহাদের প্রাণ একেবারে নষ্ট হয় না। কারণ ঐ সকল প্রাণিগণকে আমরা দোহনকরাসত্ত্বেও তাহারা যে কোন প্রকারেই হউক তাহাদের সন্তান পোষনোপযোগী দুগ্ধ বাঁটে রাখিয়া দেয়। তাহাতেই তাহাদের সন্তানগণ জীবিত থাকে। এই হেতু জগতের সকলধর্ম্মগ্রন্থেই এক বাক্যে উহাদের দুগ্ধকেই অহিংস ও অপ্রকৃতখাদ্যবস্তু বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া রাখিয়াছে। ঐ সকল প্রাণিগণের দুগ্ধ ব্যতীত জগতে মানবের আর যে কোন প্রকার খাদ্যই থাকুক না কেন? তাহা প্রায় সকলই হিংসামূলক ও প্রাকৃতখাদ্যবস্তু বলিয়া কথিত হয়। হিংসাই পাপ এবং সেই পাপেই জীবেরমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত শাস্ত্রবাক্য। আমরা যে সকল শস্যকণা বা ফলমূল প্রভৃতি প্রধানখাদ্যরূপে ব্যবহার করিয়া থাকি তাহাও প্রায় সমস্তই হিংসামূলক। কারণ ঐ সকল শস্যকণায় বা ফলমূলে তাহাদের শস্যলতা বা বৃক্ষের জীবনীশক্তি নিহীত থাকে।

অতএব তাহা ভক্ষণ করিলেও এই হিসাবে জীবহিংসা করা হয়। এবং তাহাতেও জীবকে পাপ স্পর্শ করে সেই পাপেই ক্রমান্বয়ে জীবেরমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। প্রাণিজখাদ্যের ভিতর মধুও অহিংস বটে।

জগতে কৃষিজাতখাদ্যের ভিতরেও কতকগুলি শস্যকণা বা ফলমূল ও রসময়পদার্থ আছে যাহাদের বীজ বা জীবনী শক্তি নষ্ট না করিয়াও অর্থাৎ জীবহিংসা না করিয়াও তাহা হইতে আমাদের খাদ্যবস্তু গ্রহণ করিয়া থাকি। অতএব তাহা অন্যান্য কৃষিজাতখাদ্যবস্তু অপেক্ষা কতক পরিমাণে অহিংস। যেমন সুপক্ব আম, জাম, কাঁঠাল ও খেজুর এবং গুড়, চিনি প্রভৃতি। তাই আরবের প্রধানখাদ্য খেজুর অন্যান্য দেশের প্রধানখাদ্য অপেক্ষা অহিংস এবং সেই কারণ বশতঃই বোধ হয় তথায় সত্য সনাতন ইস্‌লামধর্ম্ম সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের আর্য্যমুনিঋষিগণ পূর্ব্বে প্রায় অনেকই শুধু সুপক্ব ফল ও গোদুগ্ধ সেবন করিয়াই জীবনধারণ করিতেন, তাই তাহারা অতি দীর্ঘজীবনলাভ করিতে পারিয়াছিলেন। এবং সেই জন্যই তৎকালে ভারতে সত্যসনাতন হিন্দুধর্ম্ম উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিল।

আর একটি কথা আপনারা প্রায় সকলেই জানেন যে, বর্ত্তমানযুগে পৃথিবীর সকলমনুষ্যজাতিই অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় সমস্ত জগত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কেহ রাজ্যপরিচালনা, কেহ বানিজ্য, কেহ কৃষিকার্য্য, কেহ চাকুরি, কেহ ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা এবং এমনকি কেহবা মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, চুরি ও ডাকাতি প্রভৃতি দ্বারাও অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। যে যে ভাবে অর্থোপার্জ্জন করিয়া সেবার কার্য্য চালাইতেছে সে সেই রূপই ফলভোগ করিয়া আসিতেছে। এই সকল কার্য্যের ফলাফল কতকগুলি মুখ্য এবং কতকগুলি গৌণভাবে সকলেই ভোগকরিয়াথাকে। এই হিসাবে দেখা যায় যে, জগতে কেহই নাস্তিক নাই, কারণ খাদ্য ও পানীয়স্বরূপব্রহ্মকে পাইবার জন্য সকলেই কায়মনচিত্তে ভাবনাকরিয়াথাকে কিন্তু তাহারভাব অন্য-

প্রকার এই মাত্র প্রভেদ। অতএব কেহ যদি বলে, "ঈশ্বর নাই, আমি ঈশ্বরকে মানি না" তবে নিশ্চই সে মিথ্যা বলিয়া থাকে। অর্থ যে মানুষের কত আদরেরবস্তু তাহা নিম্নলিখিতবাক্যটি হইতে সকলেই সহজে বুঝিতে পারিবেন।

"টকা ধর্ম্মষ্টকা কর্ম্মটকাহি পরমং পদম্।
যস্য গৃহে টকা নাস্তি হা টকা টক্বায়তে॥ ১
আনা অংশ কলা প্রোক্তা রূপ্যোহসৌ ভগবান সময়।
অতস্তং ইচ্ছন্তি রূপং হি গুণবত্তমম্॥" ২

"অর্থাৎ টাকা ব্যতিরেকে ধর্ম্মকর্ম্ম অথবা পরমপদ লাভ হয় না। যাহার গৃহে টাকা থাকে না সে, হায় টাকা হায় টাকা করিয়া থাকে এবং উত্তমপদার্থেরপ্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে ও মনে করে যে যদি আমার নিকট টাকা থাকিত তাহা হইলে, এই উত্তমপদার্থ আমি ভোগ করিতে পারিতাম"। ১।

"লোকে যে ষোড়সকলাযুক্ত অদৃশ্যভগবানেরনাম কথন এবং শ্রবণ করিয়া থাকে উহা দৃষ্টিগোচর হয় না পরন্তু, ষোলআনাপয়সা এবং কৌড়িরূপঅংশ ও কলাযুক্তটাকাই সাক্ষাৎ ভগবান। এইজন্য সকলেই টাকার অন্বেষণ করিয়া থাকে কারণ টাকার দ্বারাই সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়"। ২। এখন আপনারা ভাবিয়া দেখুন এই অর্থের আদর শুধু সেবার কার্য্যের জন্যই কিনা? ঐশ্বর্য্যই মাধুর্য্যের মুল বটে কিন্তু একবার কেহ ভগবৎ কৃপায় মাধুর্য্যে পৌছাইলে তখন আর তাহার ঐশ্বর্য্যের দিকে লক্ষ্য থাকে না। রামকৃষ্ণকথামৃতে বলে যে, বেঙ্গাচী যত দিন জলে থাকে তত দিনই তাহাদের পিছনে লেজ থাকে কিন্তু একবার ডাঙ্গায় উঠিলেই আর তাহাদের পিছনে লেজ দৃষ্ট হয় না। ঐশ্বর্য্যের ও মাধুর্য্যের ভাবও তদ্রূপ অর্থাৎ যিনি মাধুর্য্যে বা ভগবৎপ্রেমেমত্ত থাকেন তিনি আর তখন ঐশ্বর্য্যের প্রতি লক্ষ্য রাখেন না।

হিন্দুদের ভগবান বাক্য, দুইটিশব্দ যোগে উৎপন্ন হইয়াছে। একটি "ভগ" আর একটি "বান"। বান অর্থে পুংলিঙ্গকেই বুঝায়। এবং ভগশব্দ বতুব্ প্রত্যয় করিয়া ১মার একবচনে ভগবানবাক্য সিদ্ধ হয়। এই ভগশব্দ হইতে হিন্দুদেরদেবতা ভগবতী শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। ভগশব্দের প্রকৃত অর্থ লক্ষ্মী বা ঐশ্বর্য্যকে বুঝায় এবং ভগবানকে ষড়ৈশ্বর্য্যশালীও বলা হয়। ভগবতীর আর এক নাম অন্নপূর্ণা। অন্ন-পূর্ণার্থে যাহাতে অন্ন বা খাদ্যবস্তু পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে। গাভীকেও হিন্দুগণ ভগবতী বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। তাহা হইলে গোমাতাও হিন্দুর নিকট অন্নপূর্ণা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। প্রকৃত প্রস্তাবে গোমাতা শুধু হিন্দুর নিকটে কেন? জগতের সকলধর্ম্মাবলম্বির নিকটই অন্নপূর্ণা বটে। হিন্দুরা আবার গোমাতাকে বিষ্ণুর আশ্রয়স্থান বলিয়াও নির্দ্দেশ করেন। হিন্দুগণ, গোমাতার প্রতিলোমে দেবতা বর্ত্তমান রহিয়াছেন বলিয়া বিশ্বাসকরেন। এবং এই সকল কারণবশতঃই গোহত্যাকে মহাপাপ বলিয়া হিন্দুধর্ম্ম-শাস্ত্রে ব্যাখ্যা করিয়া রাখিয়াছে। আবার দেখা যায়, যে প্রাচীন য়ীহুদী জাতি দ্বারা বর্ত্তমান খৃষ্টীয়ান ও মুসলমান ধর্ম্ম পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে পূর্ব্বে সেই য়ীহুদী জাতিও গোমূর্ত্তি পূজা করিতেন!

এখন কথা হইতেছে যে, প্রাচীন য়ীহুদী জাতি যে গোমূর্ত্তি পূজা করিতেন এবং বর্ত্তমান হিন্দুগণও যে, ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকেন নিশ্চয়ই ইহার ভিতর কোন গূঢ়রহস্য নিহীত আছে বলিয়াই মনে হয়। বান শব্দের অর্থ সংস্কৃতভাষায় অনেক প্রকার আছে, তন্মধ্যে বৃষ্টি বা জল কথাটিও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন সাধারণতঃ নদীতে জলবৃদ্ধি হইলে বলা হয় নদীতে বান আসিয়াছে তাই বাঙ্গালায় একটি বানে বলে,—"মরা নদী শুখানো ছিল, বানে ভরা কে করিল" এবং ঝড় বৃষ্টিকেও সাধারণতঃ গ্রাম্যভাষায় কোন কোন স্থলে বান তুফান বলা হয়। মুসলমানদের

বাক্য ও হিন্দুর ভগবানশব্দ অনেকস্থলে একভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয় না। মুসলমানশাস্ত্রে বলে, আল্লা নিরাকার তিনি কখনও মানুষরূপ ধারণ করেন না। হিন্দুগণ ভগবানকে কোন স্থলে নিরাকার কোন স্থলে সাকার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া রাখিয়াছেন এবং ভগবান যুগেযুগে মানুষরূপে অবতীর্ণ হন বলিয়াও উল্লেখ করেন। হিন্দুর "ব্রহ্ম" শব্দটিও মুসলমানের আল্লাহু একই ভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয়। হিন্দুগণ আবার অন্ন বা খাদ্য বস্তুকেও "ব্রহ্ম" বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। এই হিসাবে দেখা যায় হিন্দুমতে ব্রহ্ম প্রকৃত শক্তি। কিন্তু "ব্রহ্ম" বা ব্রহ্মাকে আবার চতুরাননবিশিষ্টপুরুষ বলিয়াও ব্যাখ্যা করেন। মুসলমানদের আল্লাহুশব্দটি পুরুষার্থবোধক, যেহেতু আরবিভাষায় "হু" শব্দটি পুংলিঙ্গের একবচনেই ব্যবহৃত হয়। হিন্দুদের ভগবান শব্দের অর্থ স্থূলভাবে অন্নজল শক্তিকেই বুঝায়। জগতের সকল ধর্ম্ম গ্রন্থেই খাদ্যাখাদ্যের বিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এই অন্নজল গ্রহণের দোষগুণ বিচার হইতেই মানবদেহে স্বতঃ রজঃ, তম এই তিন গুণের আবির্ভাব হয়। হিন্দুগণ ভগবানের উদ্দেশ্যে বহু দেবদেবীর মূর্ত্তিনির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিয়া থাকেন। যিনি মূর্ত্তিনির্ম্মাণ করাইতে অক্ষমহন তিনি শুধু একটি ঘটে জলপরিপূর্ণ করিয়া এবং নানারূপখাদ্যদ্রব্যদ্বারা নৈবেদ্য সাজাইয়া পূজা করেন। আর যিনি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিয়া থাকেন তাহাকেও ঐ মূর্ত্তির সম্মুখে একটি ঘট জলে পূর্ণ করিয়া স্থাপন করিতে হয় এবং নানাপ্রকার খাদ্যবস্তুদ্বারা নৈবেদ্য সাজাইয়া দিতে হয়। কেহ কেহ দেবতা বিশেষের নিকট পশু বলিও দিয়া থাকেন। ভাবিয়া দেখিলে তাহাও সেবারবস্তু। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, হিন্দুদের মূর্ত্তিপূজা শুধু তামসিক ব্যাপার নহে। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সকল মূর্ত্তিরূপে জগতের খাদ্য ও পানীয়স্বরূপ ব্রহ্ম বা অন্নজল শক্তির এক এক সময়ের এক এক

ভাবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াই পূজা করেন। যেমন হিন্দুগণ লক্ষ্মী ও নারায়ণের পূজা করিয়া থাকেন, তাহারা চাউলকে লক্ষ্মীর দানা এবং জলকেই নারায়ণ বলিয়া থাকেন। অতএব লক্ষ্মীনারায়ণের পূজা অর্থে অন্ন এবং জল বা রসময়শক্তির পূজাকেই বুঝায়। হিন্দুর গীতায় বলিতেছে, "যে আমাকে ভক্তি সহকারে সেবা করে তাহাকে আমি সকলপাপ হইতে মুক্ত করিয়া থাকি।" ভগবানের নামে নিবেদিত প্রসাদ বা ভক্ষ্যবস্তু মানুষ যেরূপ ভক্তিসহকারে সেবা বা ভোজন করে, অন্য সময়ে আহারীয়বস্তু সেইরূপ ভক্তি সহকারে গ্রহণ করে না। স্থূলজীবের জন্য হিন্দুদের মূর্ত্তি পূজা ইহাও একটি কারণ বটে। হিন্দুর পুরীক্ষেত্রে যে জগন্নাথদেবের বিগ্রহ বর্ত্তমান আছেন তথায়ও শুধু অন্ন জলের ভাবার্থ লইয়াই ঐ বিগ্রহের জগন্নাথ বা জগবন্ধুনামকরণ হইয়াছে। শুধু হিন্দুদের দেবতা পূজাতেই বা কেন? জগতের যে কোন ধর্ম্মাবলম্বীদের ভিতরেই যে কোন পা'ল পার্ব্বণ অথবা আনন্দউৎসব থাকুক না কেন? সকলেরই শেষে শুধু সেবাকার্য্যেরই বিধান দেখা যায়। অন্ন বা খাদ্য বস্তু প্রকৃতিশক্তি বা চন্দ্রশক্তি এবং জল বা রসময় পদার্থ পুরুষশক্তি বা সূর্য্যশক্তিস্বরূপ। চন্দ্র আসক্ত বা পজেটিভ্ (Posetive), সূর্য্য অনাসক্ত বা নিগেটিভ্ (Nigative)। এই আসক্ত ও অনাসক্ত অর্থাৎ খাদ্য ও পানীয়বস্তু সেবনে জীবদেহে যে জ্যোতি উৎপন্ন হয় তাহাকেই ব্রহ্মজ্যোতি অর্থাৎ পবিত্রাত্মা বা খোদারনুর বলিয়া কথিত হয়। দেহে আসক্ত বা চন্দ্রশক্তির বৃদ্ধি বশতঃ মানবের জীবনীশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। আর দেহে অনাসক্ত বা সূর্য্যশক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি থাকা বশতঃ মানবদেহেও চন্দ্রশক্তির হ্রাসবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আমরা সেবার বস্তু দ্বারাই দেহের চন্দ্রশক্তি বা আসক্তশক্তি বৰ্দ্ধিত করিয়া লইয়া থাকি। চন্দ্র সূর্য্যের আলোকে বা কিরণেই আলোকিত হয়। তাই চন্দ্র, সূর্য্যের কিরণসংস্পর্শে

কলঙ্কিত বা দোষযুক্ত হইয়াছে। আমাদের খাদ্যবস্তু প্রধানতঃ চন্দ্র এবং সূর্য্যশক্তির সমবায়েই উৎপন্ন হইয়া থাকে। আমরা অনেকক্ষণ রৌদ্রে দাঁড়াইয়া থাকিলে আমাদের দেহের বর্ণ বিবর্ণ হইয়া যায়। এইহেতু উষ্ণপ্রধান দেশে কৃষ্ণকায় ও শীতপ্রধান দেশে শ্বেতকায় লোক দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ মানুষের যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রায় সর্ব্বদা বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকে, তাহা অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে অপেক্ষাকৃত শ্বেতবর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কাহাকে সর্পে দংশন করিলেও তাহার দেহের রং বিবর্ণ হইয়া যায়। অতএব সূর্য্যের তাপে বা কিরণে এবং অগ্নিময় পদার্থে যে, কিছু না কিছু বিষ যে বর্ত্তমান আছে তাহা আমরা সহজেই ধারণা করিয়া লইতে পারি।

মুসলমানদের কোর্-আনে বলিতেছে শয়তান অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। হিন্দুদের শনি দেবতাও সূর্য্য হইতে উৎপন্ন বলিয়াই ব্যাখ্যা করা হয়। আমাদের প্রধানখাদ্যবস্তুরূপশস্যকণা মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থিত চন্দ্রশক্তি হইতেই পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। ঐ মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থিত চন্দ্রশক্তি সূর্য্যের সংস্পর্শে কিছু না কিছু বিষযুক্ত হইয়াছে এবং বৃক্ষলতা তাহাদের পত্র দ্বারা সূর্য্যের তাপ হইতেও কতক খাদ্য সংগ্রহ করিয়া লয়। ঐ ভূগর্ভস্থ বিষযুক্ত চন্দ্রশক্তি বা বিষাক্ত আসক্ত তাড়িতের আকর্ষণকেই মধ্যাকর্ষণ বলিয়া কথিত হয়।

ঐ বিষাক্ত চন্দ্রশক্তি প্রভাবে মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ভক্ষ্য বস্তুতেও কিছু না কিছু বিষ বর্ত্তমান থাকে। এইজন্যই জীব উহা ভক্ষণ করিলে তাহার জীবনিশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। সাধারণতঃ শস্যের কণা বা বীজের ভিতরেই ঐ সূর্য্যশক্তি বা পুরুষশক্তি অর্থাৎ অনাসক্তাড়িৎ বা বিষ বর্ত্তমান থাকে এবং প্রাণিগণের দেহে বা মাংসেও প্রচুর পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। বৃক্ষের ফলাদির ভিতর অপক্ক অবস্থায় সমস্ত

ফল ব্যাপিয়াই ঐ অনাসক্ত তাড়িৎ বা বিষ বর্ত্তমান থাকে, তারপর ফল সুপক্ক হইলে ঐ বিষ উহার বীজে প্রবেশ করে। এইজন্যই সাধারণতঃ কৃষিজাত শষ্যকণা ও অপক্ক ফলাদি এবং জীব-জন্তুর মাংস ভক্ষণ করিলেই জীবদেহে বিষ প্রবেশ করে, সেই বিষেই ক্রমান্বয়ে জীবের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। আপনারা হয়ত অনেকেই অবগত আছেন যে, শুষ্ক কাষ্ঠ ও রবারের ভিতর দিয়া তাড়িৎশক্তি প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় না। বর্ত্তমান যুগে যে বৈজ্ঞানিক তাড়িতের তার দৃষ্ট হয় তাহা মাটীর উপর দাঁড়াইয়া স্পর্শ করিলে মানুষকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়। কিন্তু যদি কোন শুষ্ককাষ্ঠখণ্ডের উপর অথবা রবারনির্ম্মিত কোনবস্তুরউপর দাঁড়াইয়া স্পর্শ করা যায় তবে কোনরূপ ক্ষতি হয় না। আমরা নগ্ন পায়ে মাটীর উপর দিয়া চলাফেরা করিলেও আমাদের দেহেও মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থিত বিষাক্ত আসক্ত তাড়িৎশক্তি প্রবেশ করে এবং তাহাতেও ক্রমান্বয়ে দেহের ক্ষতি হয়। এইজন্যই আর্য্য মুনিঋষিগণ সর্ব্বদা কাষ্ঠপাদুকা ব্যবহার করিতেন। গো, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া প্রভৃতি দুগ্ধবতী প্রাণিগণ সকলেই শুষ্ককাষ্ঠ বা কঠিনরবারসদৃশ দিখণ্ডিত চারিখান ক্ষুরের উপর ভর করিয়া চলা ফেরা করে। করুণাময় ভগবানের এই সৃষ্টিকৌশলের ফলে আমরা গো, মেষ প্রভৃতি প্রাণিগণ হইতে যে অমৃতসম দুগ্ধ বা মানবের প্রধানউপাদেয় খাদ্যবস্তুরূপচন্দ্রশক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকি, উহা ঐ বিষাক্ত তাড়িৎদ্বারা আক্রান্ত বা বিষযুক্ত নহে, কিন্তু ইহার ভিতর যে কোন কারণ বশতঃই হউক মহিষদুগ্ধ বিশেষরূপে বিষাক্ত বটে, এইজন্যই হিন্দুশাস্ত্রে আর্য্যঋষিগণ বহুগবেষণাদ্বারা মহিষকে যমের বাহন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ মহিষদুগ্ধ, দধি, ছানা, মাখন ও ঘৃত মানুষের মৃত্যু ডাকিয়া আনে। হিন্দুশাস্ত্রে যেমন মহিষকে যমের বাহন বলিয়া নির্দ্দেশ করে মুসলমানশাস্ত্রেও তদ্রূপ উষ্ট্রকে নির্দ্দেশ করে অর্থাৎ উষ্ট্রের দুগ্ধও তদ্রূপ বিষযুক্ত। মহিষ

ব্যতীত ঐ সকল প্রাণিগণের অর্থাৎ গো, মেষ, ছাগলের মাংসও অন্যান্য প্রাণিগণের মাংসতুল্য তত বিষযুক্ত নহে। এইজন্যই বোধ হয় কোন কোন হিন্দু সম্প্রদায় দেবতা বিশেষের নিকট ছাগল বলি দিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে, এবং মুসলমানগণ গো, মেষ, ছাগল প্রভৃতি আল্লারনামে কোরবানিদিয়া ভক্ষণ করে এই কারণ বশতঃই হয়তো গোমাংসকে কোরআনে হালাল খাদ্য বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু আর্য্যঋষিগণ শুধু এক গোদুগ্ধেরই প্রক্রিয়া বিশেষে মানবের অমরত্ব বর্ত্তমান আছে মনে করিয়া এ হেন উপকারী প্রাণীকে হত্যা করা মহাপাপ বলিয়া বর্ণনা করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুদের গোঘ্ন শব্দের ভাবার্থে জানা যায় যে পূর্ব্বে আর্য্যঋষিগণও অতিথি সৎকারের জন্য নাকি গোবৎস হত্যা করিতেন। মহিষদুগ্ধে এবং মহিষ মাংসে অনাসক্ত তাড়ীৎ বা বিষ বর্ত্তমান আছে। আবার ঘোড়ার দুগ্ধে ও ঘোড়ার মাংসে যে, মহিষদুগ্ধ ও মহিষমাংস অপেক্ষাও অধিকপরিমাণে অনাসক্ত-তাড়িৎ বা বিষ বর্ত্তমান রহিয়াছে, আমি পরে তাহা আপনাদিগকে যথাসাধ্য বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

জগতে মানবের খাদ্যবস্তুর ভিতর আমিষখাদ্য হইতে নিরামিষখাদ্যই শ্রেষ্ঠ, নিরামিষখাদ্য হইতে শুধু সুপক্কফলাহার শ্রেষ্ঠ। সুপক্কফল হইতে দুগ্ধ শ্রেষ্ঠ এবং দুগ্ধের ভিতর শুধু গো দুগ্ধই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্যবস্তু। শুধু গোদুগ্ধকেই জগতের প্রত্যেক ধর্ম্মগ্রন্থে দেশ, কাল ও পাত্রভেদে নানা আলঙ্কারিকভাবে মানুষের অমরত্বলাভের বিষয় নিগূঢ়বৈজ্ঞানিকমীমাংসায় পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। এক ভগবৎকৃপা ভিন্ন কোনমানুষ নিজের জ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা এই নিগূঢ়তত্ত্ব অবগত হইতে পারে না। এস্থলে আমি ইঞ্জিল কেতাব হইতে আদম ও ঈভের (হাবার) উপাখ্যানের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইঞ্জিল কেতাবে লেখা আছে যে, ঈশ্বর আদম ও ঈভ্‌কে সর্ব্ব

প্রথম সৃষ্টি করিয়া ইডেন (Eden) উদ্যানে বা স্বর্গোদ্যানে রাখিয়া বলিলেন যে, তোমাদের এখানে খাদ্যবস্তু প্রচুর আছে (কিন্তু তোমরা ঐ নিষিদ্ধফল বা গন্দম্ খাইও না) কিন্তু তাঁহারা শয়তানের প্রলোভনে পড়িয়া নিষিদ্ধবৃক্ষফল বা গন্দম ভক্ষণ করাতে মৃত্যুর অধীন হইয়া 'স্বর্গ' হইতে বিতাড়িত হইলেন। ইঞ্জিলকেতাবের গন্দম বাক্যটির সহিত ভারতের সংস্কৃত "গন্ধ" শব্দের ভাব সামঞ্জস্য রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ হিন্দুশাস্ত্রে পৃথিবীর গন্ধগুণ আছে বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতএব পৃথিবী (মৃত্তিকা) হইতে উৎপন্ন খাদ্যবস্তু অর্থাৎ কৃষিজাতশস্যকণাকেই ইঞ্জিল কেতাবে গন্দম বা নিষিদ্ধ ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। ঈশ্বর ইডেন উদ্যানে আদম ও ঈভের জন্য দুগ্ধবতীপ্রাণীগণের দুগ্ধই তাঁহাদের খাদ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা শয়তানের প্রলোভনে পড়িয়া কৃষিজাত শস্যকণা ভক্ষণ করাতেই মৃত্যুর অধীন হইয়া স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইলেন। ইংরাজীতে এই ঘটনাকে (Paradise lost) বা "স্বর্গচ্যুত" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। আদম ও ঈভের বৃত্তান্তের ভাবসকল সর্ব্বসাধারণের বোধগম্যের জন্য আনি কোরআন্ মজ্জিদের সূরাবকরা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, "এবং যখন মূসা স্বীয়সম্প্রদায়ের জন্য জল প্রার্থনা করিয়াছিল, তখন আমি বলিলাম, "তুমি স্বীয়যষ্টিদ্বারা প্রস্তরে আঘাত কর;" অনন্তর তাহা হইতে দ্বাদশপ্রস্রবণ নির্গত হইল, নিশ্চয় প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার আপনার ঘাট জানিতে পারিল, (আমি বলিলাম) ঈশ্বরপ্রদত্তজীবিকা হইতে ভক্ষণ ও পান কর, আর তোমরা পৃথিবীতে অত্যাচারীরূপে অত্যাচার করিয়া ফিরিও না। এবং যখন তোমরা বলিলে, "হে মূসা, আমরা একবিধ খাদ্যে ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিব না, অতএব আমাদের জন্য তোমার ঈশ্বরকে আহ্বান কর, ক্ষেত্রে শাক, কাঁকড়ি, গোধুম, মসুর, পলাণ্ডু জন্মে, তিনি যেন আমাদিগের নিমিত্ত ঐ সকল দ্রব্য

বাহির করেন।” সে বলিল “তোমরা কি নিকৃষ্ট বস্তুর সহিত উৎকৃষ্ট বস্তুর বিনিময় করিতে চাহ।” [কোন নগরে অবতীর্ণ হও] পরে তোমরা যাহা চাহিতেছ তাহা নিশ্চয় তোমাদের জন্য হইবে,” পরে তাহাদের উপর দুর্দ্দশা ও দারিদ্রতা নিপতিত এবং তাহারা ঈশ্বরের আক্রোশের সঙ্গে পুনর্মিলিত হইল।”

এস্থলে মুসার “প্রস্তরে আঘাত কর” দুগ্ধবতী প্রাণিগণের পালন হইতে দুগ্ধ নির্গত করার ভাবরূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। “দ্বাদশ প্রস্রবণ” অর্থে গাভীর চারিটী বাঁট মহিষের চারিটি বাঁট, ছাগলের দুইটি ও ভেড়ার দুইটি বাঁট একত্রে এই বারটি বাঁটের সহিত দ্বাদশপ্রস্রবণরূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু আরব প্রভৃতি উষ্ণপ্রধান দেশে মহিষ না থাকায় তথায় উষ্ট্র ও গর্দ্দভের একত্রে চারিটি বাঁটসহও ঐ দ্বাদশ প্রস্রবণকে বুঝায়। আবার অন্যার্থে দ্বাদশ জাতি দুগ্ধবতী প্রাণিগণের স্তনকেও দ্বাদশ প্রস্রবণ নির্দ্দেশ করে। অধিকন্তু জগতে সাধারণতঃ উপরোক্ত ঐ চারি প্রাণীর দুগ্ধই মানুষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। মুসার স্বজাতীর জন্য জল প্রার্থনার্থে দুগ্ধবতীপ্রাগিগণের দুগ্ধকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। কারণ বলা হইতেছে “ঈশ্বর প্রদত্ত জীবিকা হইতে পান ও ভোজন কর”; জল কখনও পান ও ভোজন করা যাইতে পারে না। পান ভোজনঅর্থে শুধুদুগ্ধকেই বুঝাইতেছে। যেহেতু দুগ্ধে খাদ্য ও পানীয়বস্তু বর্ত্তমান আছে। মুসার স্বজাতীগণ তাহাতে বলিল “আমরা একবিধ খাদ্যে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিব না।” অর্থাৎ শুধু দুগ্ধখাইয়া জীবনধারণ করিতে পারিব না। এইজন্য তাহারা কৃষিজাত খাদ্যবস্তুর আকাঙ্খা করিয়াছিল। তাহাতে বলা হইল, “তোমরা কি নিকৃষ্ট বস্তুর সহিত উৎকৃষ্ট বস্তুর বিনিময় করিতে চাহ? অতএব তোমরা কোন নগরে অবতীর্ণ হও” এই কোন নগরে অবতীর্ণ হওয়ার ভাবার্থ মৃত্যুর অধীন হওয়া বা স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হওয়া নির্দ্দেশ করিতেছে এবং ইহাকেই ঈশ্বরের

আক্রোশের সহিত পুনর্ম্মিলিত হওয়ার ভাব বুঝাইতেছে। অতএব কোরআন্ লিখিত এই ঘটনা হইতে অতি সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, ঈশ্বর আদম ও ঈভকে দুগ্ধই খাদ্যরূপে প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা কৃষিজাত খাদ্যবস্তু গ্রহণ করিয়া মৃত্যুর অধীন হইয়াছিলেন।"

চতুর্থ অধ্যায়।

আজকাল অনেক যুবতী ও যুবক কালপ্রভাবে বর্ত্তমান শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া হয়তো মনে করে যে, জগতের ধর্ম্মগ্রন্থসকল শুধু কবির কল্পনাপ্রসূত গল্প মাত্র। কিন্তু আমি ভগবৎকৃপায় দেখাইতে সক্ষম হইব যে, উহাতে কেবল খাদ্য ও পানীয়বস্তু শক্তিকে রূপকাকৃত করিয়া মানুষরূপে ব্যাখ্যা করিয়া রাখা হইয়াছে। এবং যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া এ পর্য্যন্ত জগতের ধর্ম্মগ্রন্থ সকলের যে সকল আলঙ্কারিক-নিগূঢ়তত্ত্ব লোক সমাজে গোপন ছিল অর্থাৎ কোনও যুগে যাহা প্রচার করা হয় নাই, শ্রীগুরুর কৃপায় এবার আমি আমার এই ক্ষুদ্রগ্রন্থে তাহা যথাসাধ্যরূপে জগতের সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে প্রকাশ করিতে সক্ষম হইব বলিয়া আশা করি। যেমন পৃথিবীর নানা দেশে নানা মনুষ্য জাতি দেশ, কাল ও পাত্রভেদে এক স্বর্ণ হইতে নিজ নিজ রুচিমত নানারূপ স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে অথচ তাহার প্রত্যেকটিকে আবার ভাঙ্গিয়া গলাইলে এক স্বর্ণেই পরিণত হয়, তদ্রূপ জগতের প্রত্যেক ধর্ম্মগ্রন্থেই দেশ, কাল ও পাত্রভেদে এক অনন্ত খাদ্য ও পানীয় বস্তুশক্তিকে বিশেষরূপে শুধু দুগ্ধশক্তিকেই কেহ ভগবানের অবতার, কেহ আল্লাহুর প্রেরিত বা বন্ধু ও কেহ স্বর্গস্থ পিতার পুত্ররূপকে আবৃত করিয়া আলঙ্কারিকভাবে

মানুষরূপে সাজাইয়া রাখিয়াছে। কিন্তু তাহা সর্ব্বসাধারণে সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া একজন আর একজনের ধর্ম্মগ্রন্থকে নিন্দা করিতেও দ্বিধা বোধ করিতেছে না। এইজন্য বাঙ্গালার আর্য্য মিশনের পকেট গীতার অষ্টাবিংশ সংস্করণে, প্রকাশক ভূমিকায় বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের উপযুক্ত উপদেষ্টাভাবে ধর্ম্ম সম্বন্ধে লোকের মনে যে, অনাস্থার ভাব দিন দিন প্রকাশ পাইতেছে, তাহা বিবৃত করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, আমি তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আমার প্রিয় হিন্দু ভগ্নী ও ভ্রাতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি—"যাহারা সমাজের নেতা, সেই ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণত্ব নাই, কাজে কাজেই এখন আর তাঁহাদের পূর্ব্বের ন্যায় সে মান, সে গৌরবও নাই। তাহাদের আচার ব্যবহার স্খলিত হওয়ায় কেহই তাহাদিগকে মানে না,—কেহই আর তাহাদের সেইরূপ শ্রদ্ধাভক্তি করে না। এখন তাহাদের যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ হইয়াছে ইহা অপেক্ষা ব্রাহ্মণের দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? অন্যান্য বর্ণের তো কথাই নাই কেননা সমাজ নেতার এইরূপ পতনাবস্থা হইলে, নিম্নশ্রেণীর লোকের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। আমাদের সমস্ত গ্রন্থই দ্ব্যর্থবোধক—অল্পবুদ্ধি মানবের জন্য বহির্লক্ষ্যের অর্থ বিশিষ্ট, এবং সাধনপথের পথিকের জন্য যোগের গূঢ়মর্ম্ম বিশিষ্ট। আজকাল প্রায় সকলেই নষ্টাচার হওয়ায় জগতে কেবল ইন্দ্রিয়সুখের জন্যই লালায়িত। সুতরাং যোগধর্ম্মটি যে কি, তাহা জানিবার জন্য কাহারও মতি গতি হয় না।............জনকাদি ঋষিগণ গৃহে থাকিয়া রাজকার্য্য করতঃ যে উপায়েরদ্বারা মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, সাংসারিক লোকের পক্ষে তাহাই রাজপথ। সেই পথের অনুসরণ করিলে, স্ত্রী পুত্রাদি কিছুই ত্যাগ করিতে হয় না; এবং সেপথে কোনরূপ অনিষ্টপাতের আশঙ্কাও নাই। শাস্ত্রেও সে উপায় বর্ণিত আছে; কিন্তু তাহার উপদেষ্টা অতি বিরল; সুতরাং সকলের ভাগ্যেই তাহা মিলে না। বিশেষতঃ সাধুর ভান করিয়া লোকের কাছে আদৃত ও সম্মানিত হইবার

জন্য আজকাল অনেকে গৈরিক বস্ত্র, ত্রিশূল ও চিমটা ধারণ করিয়া গুরু সাজিয়া লোককে প্রতারণা করায় সকলে আর কেহ কিছুতেই বিশ্বাস করিতে চাহে না ; শাস্ত্রও এখন ব্যবসায়ে (দোকানদারিতে) পরিণত ; সুতরাং ব্যবসায়ীদিগের উপদেশে কাহারও মনের তৃপ্তি বা শান্তি হয় না।......*......গুরুবাক্যে বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া তদুপদিষ্ট কার্য্যাদি নিষ্ঠাপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিলে, সাধক সেই রহস্য ক্রমশঃ আপনাআপনি বুঝিতে পারেন এবং কি দৈহিক, কি মানসিক সকল প্রকার ক্লেশ দূর হওয়ায়, তিনি সর্ব্বদাই এক অনির্ব্বচনীয় শান্তি সুখ অনুভব করেন। তখন মনের স্থিরতা হেতু তাঁহার জ্ঞানের বিকাশ হয় ও সেই জ্ঞানেই তাঁহার অন্তর্লক্ষ্য হয়। সাধনের অভাবে সে জ্ঞান নাই বলিয়াই আমাদের অন্তর্লক্ষ্য নাই ; সুতরাং আমরা কেবল বহির্লক্ষ্যেই ঘুরিয়া বেড়াই। ঐ বহির্লক্ষ্যের অর্থ লইয়া হিন্দুধর্ম্ম বিদ্বেষীগণ আমাদের ধর্ম্মের এত নিন্দা এবং তৎপ্রতি বিদ্রূপ ও উপহাসাত্মক নানাবিধ কটু কাটব্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তাহারা বলেন যে, "হিন্দুধর্ম্ম কিছুই নহে, কেননা তন্ত্র, মহাভারত, রামায়ণ, চণ্ডী, শ্রীমদ্ভাগবৎ প্রভৃতি গ্রন্থ লইয়াই তো হিন্দুরধর্ম্মশাস্ত্র, কিন্তু এ সকল গ্রন্থের বিষয়গুলি কি ?

১ম, তন্ত্র—ইহাতে মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন, এইগুলি সাধনের উপকরণ অথচ এইগুলি অপেক্ষা অপকৃষ্ট বস্তু আর কিছুই নাই।

২য়, মহাভারত—ইহার বিষয়, সামান্য একটু ভূমিখণ্ডের জন্য ভ্রাতৃবিরোধ পরস্পর যুদ্ধ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ইত্যাদি।

৩য়, রামায়ণ—ইহাতে সীতাহরণ এবং তাঁহার উদ্ধারের জন্য বানর লইয়া দশানন ও রাক্ষসগণের সহিত ভগবান রামচন্দ্রের যুদ্ধ ইত্যাদি।

৪র্থ, চণ্ডী—ইহার বিষয় এই যে, নিজের সতীত্ব রক্ষার জন্য একটি স্ত্রীলোকের ছুইটি অসুরের সহিত যুদ্ধ।

৫ম, শ্রীমদ্ভাগবৎ—ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের লীলা ও ষোলহাজার গোপীদের সহিত তাহার বিহার বর্ণন।

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার গুণে আজকাল লোকে আর অন্ধ বিশ্বাস করিতে চাহে না। সুতরাং বহির্লক্ষ্যের ঐ সকল অর্থ লইয়া লোকে যে শাস্ত্রকে অত্যন্ত অপকৃষ্ট বলিয়া ঘৃণা করিবে ইহা বিচিত্র নহে; শাস্ত্র সম্বন্ধে আমাদেরও প্রকৃত জ্ঞান না থাকায়, আমরাও ঐ সকল কথার প্রতিবাদ করিতে অক্ষম। সুতরাং শাস্ত্রের প্রতি আমাদেরও ক্রমশঃ ঘৃণা ও অনাস্থা জন্মিয়া আসিতেছে। কোন দুষ্কর্ম্মকারীকে যদি ধর্ম্মের ভয় দেখান যায়, তাহা হইলে, সে অমনি বলিয়া বসে, "রেখে দাও তোমার শাস্ত্র,—রেখে দাও তোমার ধর্ম্ম; কৃষ্ণ ষোলহাজার গোপীদের সহিত লীলা করিলেন, তাতে তাঁর পাপ হইল না, আর আমাদের বেলাই যত দোষ; আপনার বেলায় লীলা খেলা,—পাপ লিখেছেন মানুষের বেলা"!! সুতরাং এখন আর কেবল কথায় চিড়ে ভিজেনা। আমাদের শাস্ত্রের যদি কেবল ঐরূপ একমাত্র বহির্লক্ষের অর্থই হয়, তাহা হইলে বাস্তবিকই হিন্দু ধর্ম্মে আছে কি? কেননা ঐ সকল জঘন্য ও অকিঞ্চিৎকর বিষয় লইয়াই কি কখনও ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে পারে? যাহারা আত্মজ্ঞানী মুক্তপুরুষ, তাঁহারা যে ঐরূপ কুৎসিত ও অতি হেয় বিষয় এবং আষাঢ়েও গাঁজাখুরি গল্প লইয়াই ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, ইহাই কি সম্ভব? তাহা কখনই হইতে পারে না। অবশ্যই ইহার কোন নিগূঢ় তাৎপর্য্য আছে; সেই নিগূঢ়ধর্ম্ম জানা সাধনসাপেক্ষ, সদ্‌গুরুর উপদেশে সাধনমার্গে উন্নতিশীল সাধক শাস্ত্রীয় গ্রন্থমাত্রেই একমাত্র যোগ ও যোগের চরম অবস্থা ব্রহ্মজ্ঞানের কথা স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারেন। স্বয়ং ব্যাস ও বলিয়াছেন—"তুমি রূপবিবর্জ্জিত; আমি ধ্যানে যে তোমার রূপ কল্পনা করিয়াছি; তুমি অখিলগুরু ও বাক্যের অতীত, আমি স্তবের দ্বারা তোমার সেই অনির্ব্বচনীয়তা

দূরীকৃত করিয়াছি; এবং তুমি সর্ব্বব্যাপী,—অথচ আমি তীর্থ-যাত্রাদি দ্বারা তোমার সেই সর্ব্বব্যাপীত্ব নষ্ট করিয়াছি; হে জগদীশ! মৎকৃত এই তিনটি বিকলতা দোষ ক্ষমা করুন।” এখানে ব্যাস নিজেই স্বীকার করিতেছেন যে, যিনি নিরাকার, যিনি বাক্যের অতীত ও যিনি সর্ব্বব্যাপী, তাঁহাকে ‘তিনি বেদ পুরাণাদি শাস্ত্রে কল্পনার দ্বারা হস্তপদাদিবিশিষ্ট সামান্য মানুষরূপধারী বলিয়া বর্ণনা করিয়া দোষ করিয়াছেন। ইহার দ্বারা স্পষ্টই স্বপ্রমাণ হইতেছে যে, আমাদের সমুদয় শাস্ত্রই রূপকে আবৃত। সুতরাং সেই রূপক না ভাঙ্গিলে তার প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হওয়া যায় না। কিন্তু প্রকৃত তাৎপর্য্য জানিলে, অতি সহজেই ঐ সকলের মীমাংসা হইয়া থাকে। প্রকৃত উপদেষ্টার অভাবে সেই গূঢ়মর্ম্ম জানা না থাকায়, হিন্দুধর্ম্মের এই অধঃপতন হইয়াছে এবং শাস্ত্রের প্রতি লোকের অনাস্থা, অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধা ক্রমশঃ এত বাড়িয়াছে। এমন কি, অনেকে হিন্দুধর্ম্ম ছাড়িয়া অন্যধর্ম্ম পর্য্যন্ত অবলম্বন করিয়াছে”।

যেমন হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থের অনেক স্থান দ্ব্যার্থবোধক ও বহু আলঙ্কারিক-ভাবে পরিপূর্ণ তদ্রূপ মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থও বহু স্থান দ্ব্যার্থবোধক ও নানাপ্রকার আলঙ্কারিকভাবে পরিপূর্ণ। আমি আমার প্রিয় মণীষী মোসলেম ভগিনী ও ভ্রাতাগণকে তাহা অনুভব করাইবার জন্য, মাননীয় মোবিনদ্দিনআহম্মদ জাহাঁগীর নগরী কর্ত্তৃক বাঙ্গলা ভাষায় প্রণীত মেফতাহুলফোর্‌কানের ভূমিকায় তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—“কালামুল্লাহ বা কোর-আন মজীদ্ জগতের পঁয়তাল্লিশ কোটী লোকের ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, শাসননীতি ও রাজনীতির মুলমন্ত্র। এই মহাগ্রন্থ অনুসরণের ফলে, একদা একতা-বিবর্জ্জিত, কলহপ্রিয়, ভ্রাতৃরক্তপিপাসু, কুরুচিপূর্ণ, নৈতিকজ্ঞানরহিত পৌত্তলিক, মরুবাসী আরবজাতি জগতে জগদ্‌গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই মহাগ্রন্থের অতুল

প্রভাবলে, একসময় পৃথিবীর একপ্রান্ত ওরিগাল অন্তরীপ হইতে অপর প্রান্ত কুমারীকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত, এই বিস্তৃত ভূভাগ ইছলামের একতা ও একত্বের সম্মুখে নতশির হইতে বাধ্য হইয়াছিল। তেরশত বৎসর পূর্ব্বে এই জঘন্য আরব সমাজে আরবের মরুপ্রান্তর হইতে জলদগম্ভীর স্বরে বিঘোষিত হইয়াছিলঃ—"বিদ্যা শিক্ষা করা প্রত্যেক মোছলেম নরনারীর পক্ষে অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য"। ইছলাম গুরুর এ মহা-আদেশবাণী নিষ্ফল হয় নাই। মোছলেমগণ, তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান কেন্দ্র—বগদাদ, দামেস্ক, ছমরকন্দ, কায়রো, ফর্ডভা, প্রভৃতি স্থানে, বিশ্ববিদ্যালয়সংস্থাপন ও মানমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া জগতের বহুশতাব্দী-ব্যাপী-সঞ্চিত, লুপ্তপ্রায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উদ্ধার ও উৎকর্ষসাধনে তাঁহাদের সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করেন। তাঁহারা বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোনমিতি, খগোলবিজ্ঞান ভৈষজ্যশাস্ত্র প্রভৃতি অনেক উন্নত কলেবরে জগতে প্রচার করেন। আধুনিক গণনা-পদ্ধতি, ঘন সমীকরণ (cubic equation) বিশ্লেষণ ও লগারিথম তাঁহাদেরই অনুশীলনপ্রসূত। তাঁহারা তারকামালার মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া বৃহৎ বৃহৎ তারকাগুলিকে যে নাম দিয়াছিলেন, উহা এখনও বিদ্যমান আছে। তাঁহারাই প্রথম বিষুবরেখা (equator) অয়ণমণ্ডলের সংযোজন স্থান, গ্রহসমূহের সমসূত্রপাতে অবস্থান এবং গুপ্ত তারকামালার অবস্থিতি নিরূপণ করেন। তাঁহারাই রসায়ন বিদ্যার জন্মদাতা, গন্ধকজাত অম্ল (Sulphuric acid) যবক্ষারিক অম্ল (Nitric acid), সুরাসার (Alkali) প্রভৃতি তাঁহারাই প্রথম প্রস্তুত করেন। খগোল বিজ্ঞানের যন্ত্র নির্ম্মাণ, সময় নির্দ্ধারণ জন্য নানাবিধ ঘড়ি প্রস্তুত, দোলক (Pendulum) আবিষ্কার, পদার্থসমূহের আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gravity) নির্দ্ধারণ, আলোক বিজ্ঞানের রশ্মিতত্ত্ব উদ্ভাবন, রাসায়নিক ক্রিয়াবলে ঔষধ প্রস্তুত প্রনালী ইত্যাদির জন্য জগত মোছলেমগণের নিকট ঋণী।.. ....জগতের ইতিহাস হইতে

ইহা বেশ প্রতীয়মান হয় যে মানব-মস্তিস্কোদ্ভুত কোন গ্রন্থ বা কেবলমাত্র পাশবিকশক্তি পৃথিবীর কোন জাতিকে কখনও জগদ্‌গুরু-পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই; কিন্তু আরবের ক্ষুদ্র মোছলেম সম্প্রদায়, কোর্‌-আনের মহামন্ত্রে দীক্ষিত ও হজরত মোহাম্মদ মোস্তাকার আদর্শ চরিত্রে অনুপ্রাণিত হইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল। প্রকৃত মোছলেম ক্ষণস্থায়ী পার্থিব সুখ সম্পদ কিংবা আপাতমধুর ভোগ লালসার বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন না, সত্যের অনুরোধে একমাত্র সত্যেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন। সত্যবাণীর পূণ্য আলোকে নিজ হৃদয়ের তমোরাশি দূর করিয়া সর্ব্বময় আল্লার নামে নিজকে উৎসর্গ করাই তাঁহার জীবনের মহাব্রত। কোর্‌-আন তাঁহার অজেয় অসি, তৌহিদ বা একত্ববাদ ও 'এখওয়াতুন্' বা সাম্যভ্রাতৃত্ব তাঁহার জীবনোপাদান। ছাদ্‌কা বা দান এবং এবাদৎ বা উপাসনা তাঁহার জীবনব্রত, তাক্‌ওয়া বা সাধুতা তাঁহার পবিত্র ভূষণ, হোব্বোল্—হিল্লাহ্ বা বিভুপ্রেম তাঁহার চিরসহচর এবং তাওয়াক্কোল্ বা আত্মসমর্পন তাঁহার জীবনীশক্তি। সৎকার্য্যেই তাঁহার প্রীতি, অসৎ কার্য্যেই তাঁহার ঘৃণা। কোর্‌-আনমজ্বিদের এই মহাবাক্য যে জাতির ব্যক্তিগত মহামন্ত্র, সে জাতির নিকট জগত নতশির না হইয়া থকিতে পারে না।

যে মহাগ্রন্থ প্রাচীন মোছলেম জাতিকে স্বর্গীয় শক্তি, অমিত তেজ, ও অভূতপূর্ব্ব উন্নতি প্রদান করিয়াছিল, আজও উহা আপন গৌরব ও পবিত্রতা লইয়া বিরাজমান; তবে মোছলেম জগত অধুনা অধঃপতনের নিম্নতমস্তরে নিমজ্জিত কেন? আজ মোছলেম সমাজে সে আদর্শ শিক্ষা, সে অতুল অধ্যবসায়, সে সর্ব্বজনীন একতা, সে সাম্য ভ্রাতৃভাব, সে স্বজাতি বাৎসল্য, সে স্বার্থত্যাগ, সে আত্মোৎসর্গ, সে অটল বিশ্বাস, সে ধর্ম্মপরায়ণতা নাই।

মোছলেম জাতি নবী করীমের মহা আদর্শ ভুলিয়া এক অভিনব আদর্শহীন জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

বঙ্গীয় মোছলেম সমাজের প্রতিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আরও শোচনীয় অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, বঙ্গীয় মোছলেম সমাজ ধর্ম্মহীনতা ও অধঃপতনের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছে। পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে এ অবনতির তত্ত্বানুসন্ধান করিলে বঙ্গীয় মোছলেম সমাজের আরও কয়েকটী বিশেষ কারণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। ইছলাম ধর্ম্মগ্রন্থ দুরূহ আরবী ভাষায় লিপিবদ্ধ। আরবী আমাদের জাতীয় ভাষা। কালপ্রবাহে বাঙ্গলাভাষা, জাতীয় ভাষায় পরিণত হইতে চলিয়াছে কিন্তু ইছলামধর্ম্মনীতি বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও প্রচারিত হইতেছে না। যাহা হইয়াছে, তাহাও আশানুরূপ ফলপ্রদ হয় নাই।

বাবু গিরীশচন্দ্র সেন কোরাণ মজীদ বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া যশস্বী হইয়াছেন কিন্তু অনুবাদে তিনি অনেক স্থলে মারাত্মক ভুল করিয়াছেন। বিশেষতঃ তিনি টীকায় স্থানবিশেষে 'মওজু হাদিছ' অর্থাৎ তথা কথিত ভিত্তিহীন নবী-বাণী ও অমূলক কাহিনী সন্নিবেশিত করিয়াছেন। অনেক বঙ্গীয় মুছলেম গ্রন্থকারও এ অভিযোগ হইতে উন্মুক্ত নহেন। ইহার ফলে আরবী ভাষানভিজ্ঞ লোকেরা "কোরান-বাণী" 'ছহি' বা সন্দেহশূন্য নবী-বাণী 'মওজু বা অমূলক হাদিছ এবং মানব উক্তির যথাযোগ্য পার্থক্য করিতে পারিতেছেন না। এই সকলের সংমিশ্রণে নানাপ্রকার ভ্রান্ত বিশ্বাস ও অমূলক ধারণার উদ্ভাবনা হইতেছে।

পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী সম্প্রদায়ই বর্ত্তমানে বঙ্গীয় মোছলেম সমাজে নেতৃস্থানীয়, কিন্তু তাঁহারা অধিকাংশই জাতীয় আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ, কাজেই ইছলামধর্ম্মনীতিশিক্ষার জন্য তাঁরারা পরমুখাপেক্ষী। এমত অবস্থায় তাঁহাদের উচ্চশিক্ষা, ধর্ম্মজগতে তাদৃশ কার্য্যকরী হইতে পারিতেছে না। মাদ্রাছা উত্তীর্ণ মৌলবী ছাহেবানই

বঙ্গদেশে "নায়েবে রছুল" নামে সম্মানিত কিন্তু তাঁহাদের বর্ত্তমান শিক্ষা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ও অসম্পূর্ণ, তাঁহাদের পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট দর্শন, ন্যায় ও বিজ্ঞানশাস্ত্র অনেক ভ্রান্তমতে পরিপূর্ণ তাঁহাদের অনেকেই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে অজ্ঞ এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী যুবকগণের কূটতর্কের প্রত্যুত্তর দানে অক্ষম, সুতরাং তাঁহাদের শিক্ষা আধুনিক শিক্ষিত সমাজে আশানুরূপ কার্য্যকরী হইতে পারিতেছে না; পক্ষান্তরে তাঁহাদের সংখ্যায় অত্যধিক ন্যূনতা হেতু, তাঁহারা অশিক্ষিত সমাজকেও যথোপযুক্ত ধর্ম্ম-পরায়ণ করিতে পারিতেছে না।...............কোরানমজীদ বা ঈশ্বরবানী এবং হাদীছ শরীফ বা রছুল-বাণীর প্রতি অটল বিশ্বাস ও অনুসরণই মোছলমের প্রকৃত নিদর্শন; কিন্তু কোরাণ-মজীদের কতক আয়েত 'মোহ্‌কামাতুন্‌' অর্থাৎ সুস্পষ্ট এবং কতক আয়েত 'মোতাশাবেহাতুন্‌' অর্থাৎ আলঙ্কারিক বা নিগূঢ় তত্ত্বপূর্ণ। শেষোক্ত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় মতভেদ অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং ঈদৃশ মতভেদ বিভিন্ন 'তফছীরে' প্রায়ই পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। অনেক হাদীছও প্রায় এইরূপ দ্ব্যর্থবোধক। বিশেষতঃ হাদীছসমূহ কতিপয় শতাব্দী পর্য্যন্ত কেবলমাত্র স্মৃতিশক্তি দ্বারা রক্ষিত হইয়া আসিতেছিল। বহুকাল পরে এই পবিত্র বানী সমূহের প্রথম সংগ্রহ ও সঙ্কলন আরম্ভ হয়। কাজেই অনেক হাদীছবানীর সত্যতা ও বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। 'ওলামাগণ' কতকগুলি ছহি বা সন্দেহশূন্য, কতকগুলি জয়ীফ্‌ বা সন্দেহমূলক, কতককে হাছান বা এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী এবং আর কতকগুলি মউজু বা অমূলক বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু এই সমস্ত বিভাগ সর্ব্বস্থলে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ কি না বলা যায় না। কোরাণমজীদ নিহিত বৈজ্ঞানিকতত্ত্ব, ঐতিহাসিক ঘটনা ও 'শানেনজুলের' ব্যাখায় কোন কোন টীকাকার ভ্রান্তমত ও ইহুদিগণ-মধ্যে-প্রচলিত প্রাচীন কাহিনী এবং জয়ীফ্‌ হাদীছ

সন্নিবেশ করিয়াছেন। ইহাদের উপর আস্থা রাখা না রাখা সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন, ইহা ইছলামের অঙ্গ নহে। ইছলাম-বিরোধিগণ হিংসা, কুসংস্কার অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া ইছলাম-নীতি ও কোরাণ-মজীদ সমালোচনা করিতে গিয়া এই সকল ইছলাম গণ্ডীর বহির্ভূত উক্তির আনুকুল্যে ইছলামের মাহাত্ম্য বিনষ্ট করিতে প্রয়াসী হইতেছেন।..........আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিব ঈদৃশ কারণে বঙ্গদেশে ইছলামের সুবিমল জ্যোতিঃ ক্রমে ক্রমে হীনপ্রভ হইতেছে। বঙ্গভাষায় এ পর্য্যন্ত বিস্তৃত তফছীর ও ইছলাম ধর্ম্ম-নীতি প্রণয়ন হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই অভাব কিয়ৎপরিমাণে দুরীকরণ মানসে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করা হইল।"

এইরূপ বাইবেলের এবং ইঞ্জিল কিতাবেরও বহুস্থান দ্ব্যার্থবোধক এবং নানাপ্রকার আলঙ্কারিকভাবে নিগূঢ়বৈজ্ঞানিকতত্ত্বে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। অতএব হিন্দুর রামায়ণ, মহাভারত, তন্ত্র, চণ্ডী ও শ্রীমদ্ভগবৎ, মুসলমানের কোরাণশরিপ, খৃষ্টীয়ানের বাইবেল ও ইঞ্জিল কিতাবের বৃত্তান্ত সকল কিছুই অসম্ভব এবং মিথ্যা নহে। ঐ সকল মহাগ্রন্থে শুধু অন্ন, জল বা খাদ্য ও পানীয়বস্তুশক্তি, মানুষ রূপকে আবৃত হইয়া জগতের আত্মতত্ত্ব নিগূঢ় বৈজ্ঞানিক মীমাংসায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে। মায়া-মুগ্ধ জীব অর্থাৎ সর্ব্বসাধারণলোক সহজেতাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া উহা হইতে নানাপ্রকার বিকৃত অর্থ করিয়া শুধু মানুষ-জ্ঞানে সকলই অসম্ভব বলিয়া মনে করে। এবং একজন আর একজনেয় ধর্ম্মগ্রন্থের নিন্দা করিয়া কতভাবে কত প্রকার অশান্তির সৃষ্টি করিয়া থাকে। এই সকল কারণে একজন আর একজনের উপাস্যকে মানিতে চাহে না। আমি ভগবৎকৃপায় জগদগম্ভীর-স্বরে ঘোষণা করিতেছি যে, জগতের প্রত্যেক ধর্ম্মগ্রন্থেই দেশ, কাল ও পাত্র বিচারে শুধু প্রাকৃত খাদ্যবস্তু অর্থাৎ কৃষিজাত খাদ্য-বস্তুশক্তি বা শস্যকণা প্রভৃতি ও পানীয়শক্তিকে কেহ নবী বা

আংশিক অবতার এবং অপ্রাকৃত খাদ্যবস্তু শুধু দুগ্ধশক্তিকেই কেহ ঈশ্বরের পুত্র, কেহ আল্লার রছুল এবং কেহ ভগবানের পূর্ণ অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়া রাখিয়াছে। সূর্য্যের উদয় অস্ত মিথ্যা হওয়া সম্ভবপর হইলেও ভগবৎকৃপায় আমার এই কথার একটি কথাও মিথ্যা হইবে না বলিয়া মনে করি। মানুষ যখন যে কোন ধর্ম্মপ্রচারকের নামের সহিত, দেহের গঠনের সহিত এবং তাহার কার্য্যকলাপ ও জীবনবৃত্তান্ত প্রভৃতি সকল বিষয়ের সহিত অনন্ত খাদ্য ও পানীয়বস্তুশক্তির কার্য্যকলাপ, বিশেষতঃ দুগ্ধের সহিত সর্ব্বতোভাবে মিলিয়া যাইতে দেখিয়াছিল তখনই দেশ, কাল ও পাত্র বিচারে তাহাদের ভিতর কাহাকে কেহ ঈশ্বরের পূর্ণঅবতার. কাহাকে কেহ ঈশ্বরের পুত্র, কাহাকে কেহ আল্লার রছুল বা বন্ধু বলিয়া বর্ণনা করিয়া রাখিয়াছে। ইহার ভিতর হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে এই অনন্তখাদ্য ও পানীয়শক্তিরভাবপ্রকৃতিপুরুষরূপে, খৃষ্টানশাস্ত্রে পুত্র ও পিতারূপে এবং মুসলমানশাস্ত্রে বন্ধুরূপে বর্ণনা করিয়া রাখিয়াছে এইমাত্র প্রভেদ দেখা যায়। আমার এই কথা সত্য কিনা, তাহা প্রমাণ করাইবার জন্য আমি সর্ব্বপ্রথমে আপনাদিগকে খৃষ্টীয়ানের বাইবেলে বর্ণিত প্রভু যীশুখৃষ্টের জন্মবৃত্তান্ত ও জীবনের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি। তাহা হইলেই আপনারা অতি সহজে সকল বিষয় উপলব্ধি করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করি। বাইবেলে বলিতেছে যে,—কুমারী মরিয়মের গর্ভে ভগবানের ঔরষে প্রভুযীশুর জন্ম হইয়াছিল। এই কথা খৃষ্টানগণ ব্যতীত আর সকলেই হয়তো অসম্ভব বলিয়া মনে করে। কিন্তু যীশুকে যদি জগতের প্রধান উপাদেয় খাদ্যবস্তুদুগ্ধশক্তিরূপ ধরিয়া লওয়া হয়, তবে নিশ্চয়ই বাইবেলের প্রত্যেক কথা সম্ভবপর বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। কারণ গো, মেষ প্রভৃতি দুগ্ধবতী প্রাণিগণের দেহস্থ চন্দ্রশক্তি হইতেই যে দুগ্ধ উৎপন্ন হয়,

তাহা বোধ হয় আপনারা সকলেই অবগত আছেন। তাহারা যে পুরুষ গো, মেষের সহিত সঙ্গম করিয়া থাকে তৎজন্য শাবক প্রসব করে। কিন্তু সে সময়ে ঐ সকল প্রাণিগণ হইতে আমরা যে অমৃতসম দুগ্ধলাভ করিয়া থাকি, উহা প্রকৃত প্রস্তাবে ভগবানের ঔরষে অর্থাৎ তাহাদের খাদ্য ও পানীয়বস্তুশক্তি হইতেই উৎপন্ন হয়।

যীশু জন্মিবামাত্র যীশুর মা, গাভীর যাব খাওয়া খড় বিচালি পরিপূর্ণ টবের ভিতর যীশুকে রাখিয়াছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, খড় বিচালি প্রভৃতি হইতেই গাভীর দুগ্ধ উৎপন্ন হয়। যীশুর মৃত্যুর তিন দিবসপর স্বর্গারোহন এবং পুনরায় পৃথিবীতে প্রত্যাগমন করিয়া ভক্তগণকে দর্শন দেওয়া প্রভৃতি কার্য্য শুধু দুগ্ধের সহিতই আলঙ্কারিক ভাবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। কারণ সাধারণতঃ আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন যে, দুগ্ধে পিত্তরস মিশ্রিত হইলেই দুগ্ধ নষ্ট বা মৃত্যু মুখে পতিত হয়। তারপরদিন উহা দধিতে পরিণত হইলে, ঐ দধি শরযষ্টি বা মন্থন দণ্ড দ্বারা মন্থন অর্থাৎ ক্রুশে বিদ্ধ করিলে ঐ দিন উহা হইতে মাখন উৎপন্ন হয়। পরে ঐ মাখন জলের উপর রাখিয়া দিলে উহা জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায়। এই ভাব হইতেই বাইবেলে বলে যে, "ভগবানের আত্মা জলের উপর বিচরণ করিতেছিল।" তারপর ঐ মাখনকে আগুনে উত্তপ্ত করিলে ঘৃতে পরিণত হয় এবং ঐ ঘৃতকে ক্রমান্বয়ে অগ্নি দ্বারা অধিক উত্তপ্ত করিলে উহা ধূম্রবৎ হইয়া বাষ্পাকারে আকাশে উড়িয়া যায়। আবার ঐ বাষ্প শীতল বায়ুর সংস্পর্শে ঘনীভূত হইয়া মেঘ যোগে জলরূপে পৃথিবীতে পতিত হয়। ঐ জল হইতেই আবার প্রাণিগণের খাদ্যবস্তু উৎপন্ন হইয়া দুগ্ধবতী প্রাণিগণেরও দুগ্ধ উৎপাদন করে। হিন্দুগণ তাই বোধ হয় ঘৃত অগ্নিতে আহুতি দিয়া যজ্ঞ করিয়া থাকেন। ঐরূপে দুগ্ধে পিত্তরস বা বিষ মিশ্রিত করিয়া শরযষ্টিদ্বারা

মন্থন বা ক্রুশে বিদ্ধ করিলে প্রথমতঃ মাখন, তারপর ঘৃত, ঘৃত হইতে বাষ্পাকারে স্বর্গে বা আকাশে যাওয়া এবং মেঘ সংযোগে জলরূপে আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীতে প্রত্যাগমন করিয়া দুগ্ধবতী প্রাণিগণের খাদ্যে পরিণত হইয়া পুনরায় দুগ্ধে পরিণত হওয়া প্রভৃতি কার্য্যই রূপকাবৃত হইয়া যীশুর মৃত্যুর পর স্বর্গারোহন এবং পরে পৃথিবীতে প্রত্যাগমন প্রভৃতি কার্য্য বাইবেলে আলঙ্কারিকভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। মানবহস্তাঙ্গুলীই যে প্রকৃত ক্রুশ চিহ্ন তাহা আমি পরে দেখাইব। কিন্তু ঐ ক্রুশ চিহ্নের উপরিভাগ ঘুরাইয়া নিম্নদিকে ধরিলে দুগ্ধের মন্থন দণ্ডেও পরিণত হয়। ক্রুশ যথা ┼ মন্থন দণ্ড যথা ┼

বাইবেলে লেখা আছে, প্রভু যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করিবার সময় তাঁহার হাতে শরযষ্টি দেওয়া হইয়াছিল, পিত্ত মিশ্রিত দ্রাক্ষারস, অম্লরস বা সিরকা পান করিতে দেওয়া হইয়াছিল এবং শরযষ্টি দ্বারা তখন তাঁহাকে আঘাতও করা হইয়াছিল। তাই বাইবেলের মথি লিখিত সুসমাচারে যীশুর ক্রুশারোহন ও মৃত্যু সম্বন্ধে বলিতেছে, "আর বাহির হইয়া তাহারা শিমুন নামে একজন কুরনীয় লোকের দেখা পাইল; তাহাকেই তাঁহার ক্রুশ বহন করিবার জন্য বেগার ধরিল। পরে গলগথা নামক স্থানে অর্থাৎ যাহাকে মাথার খুলির স্থান বলে, সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহারা তাঁহাকে [পিত্ত মিশ্রিত দ্রাক্ষারস পান করিতে দিল।"] এইরূপ লূক লিখিত সুসমাচারেও বলে, "আর সেনাগণও তাঁহাকে বিদ্রূপ করিল, নিকটে গিয়া তাঁহার কাছে [অম্লরস লইয়া বলিতে লাগিল,] তুমি যদি য়ীহুদিগের রাজা হও, তবে আপনাকে রক্ষা কর।" আবার যোহন লিখিত সুসমাচারে এই সময়ের ঘটনা সম্বন্ধে বলে, "ইহার পর যীশু, সমস্তই এখন সমাপ্ত হইল জানিয়া, শাস্ত্রের বচন যেন সিদ্ধ হয়, এইজন্য কহিলেন, ['আমার পিপাসা পাইয়াছে।' সেই স্থানে সিরকায় পূর্ণ একটি পাত্র ছিল; তাহাতে লোকেরা সিরকাপূর্ণ একটী স্পঞ্জ এসোবনলে লাগাইয়া তাঁহার মুখের

নিকটে ধরিল। সিরকা গ্রহণ করিবার পর যীশু কহিলেন, 'সমাপ্ত হইল'। পরে মস্তক অবনত করিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন"।]
এখন আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, দুগ্ধে পিত্তরস, অম্লরস বা সিরকা মিশ্রিত করিয়া শরযষ্ঠি দ্বারা আঘাত করা বা মন্থন করার ভাব এবং যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করিবার সময়ের ভাব সকল একইরূপে রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে কিনা? যদি তাহাই হয়, তবে প্রভু যীশু যে দুগ্ধশক্তি সদৃশ তাহাতে আর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। আর সচরাচর মানুষ হস্তস্থিত বৃদ্ধাঙ্গুলী, তর্জ্জনীর উপর স্থাপন করিয়া পশুর পালানস্থ বাঁট বিদ্ধ করিয়াই দুগ্ধশক্তি সদৃশ যীশুকে বাহির করিয়া লয়। এবং খৃষ্টীয়ানগণও হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী, তর্জ্জনীর উপর স্থাপন করিয়াই পিতা, পুত্র এবং পবিত্রাত্মার নামে কপোলে, বক্ষেঃও দুই স্বন্ধে স্পর্শ করিয়া ঈশ্বরকে প্রণাম করেন। এইরূপ বৃদ্ধাঙ্গুলীর মধ্যস্থল, তর্জ্জনীর মধ্যস্থলে স্থাপন করিলে ক্রুশ চিহ্নে পরিণত হয় কিনা তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখুন! অতএব বাইবেলের প্রত্যেক ঘটনাবলি যদি প্রভু যীশুর স্থলে দুগ্ধ শক্তিকে ধরিয়া লওয়া হয় তবে বাইবেলের সমস্ত বাক্যই ধ্রুব সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। যেমন বাইবেলে বলিতেছে যে, যীশু কুষ্ঠব্যাধি-গ্রস্থব্যক্তিদিগকে আরোগ্য করিয়াছিলেন, অন্ধের চক্ষুদান করিয়াছিলেন এবং মৃতব্যক্তিকেও জীবিত করিয়াছিলেন। আপনারা হয়ত অনেকেই অবগত আছেন যে, দুগ্ধ কুষ্ঠব্যাধির মহৌষধ। বর্ত্তমানে ডাক্তারগণ কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্থ লোকের ক্ষতস্থান দুগ্ধ দ্বারা ধৌত করিয়া নিরাময় করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ মেষদুগ্ধ ঘায়ের মহৌষধ। দুগ্ধ, মাখন এবং ঘৃত চক্ষুরোগেরও মহৌষধ। বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক ডাক্তারগণ, চক্ষু রোগের জন্য দুগ্ধের ইন্‌জেক্‌শন আবিষ্কার করিয়াছেন। বাইবেলে বলিতেছে যে, "ভগবান আমাদিগকে অনন্তজীবন দিয়াছেন, সেই জীবন তাঁহার পুত্রে আছে।" বা

বর্ণিত ঈশ্বরেরপুত্র প্রভুযীশু যদি দুগ্ধশক্তি সদৃশ হয়, তবে দুগ্ধেরই প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা যে মৃতব্যক্তি ও পুনর্জীবিত হইতে পারে ইহাও ধ্রুব সত্য। এবং এই জন্যই বোধ হয় বাইবেলে বলিতেছে যে, "একমাত্র সত্য ঈশ্বর ও তাঁহার পুত্র যীশুকে জ্ঞাত হওয়াই অনন্ত জীবন, খৃষ্ট আমাদের যজ্ঞ, প্রভুর নাম দৃঢ় দুর্গ স্বরূপ এবং ধার্ম্মিক লোক তাহাতে পলায়ন করিয়া রক্ষা পায়"। তাই যীশু বলিয়াছেন, "যে আমার মাংস ভোজন ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্তজীবন পাইয়াছে এবং আমি তাহাকে শেষ দিনে উঠাইব। কারণ আমার মাংস প্রকৃত ভক্ষ্য, এবং আমার রক্ত প্রকৃত পেয়।" "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন।" এবং "আমিই সেই জীবনখাদ্য, যাহা স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়াছে।"

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যজ্ঞ শব্দের অর্থ সেবা বা পান ভোজনকেই বুঝায়। বাইবেলেও বলিতেছে প্রভুযীশুখৃষ্ট আমাদের যজ্ঞ। তাহা হইলে দেখা যায় প্রভু যীশু প্রকৃত প্রস্তাবেই দুগ্ধ শক্তিসদৃশ বা মানবের প্রধান উপাদেয় খাদ্য বস্তুশক্তি। দুগ্ধে খাদ্য ও পানীয়বস্তু একত্রে মিলিত অবস্থায় আছে, তাই মানুষ শুধু দুগ্ধ সেবন করিয়াও জীবন ধারণ করিতে সক্ষম হয়। পানীয় বা রসময় পদার্থ সূর্য্যশক্তি সদৃশ, ঐ পানীয় বা রসময়শক্তি হইতেই আমাদের খাদ্যবস্তু রূপ চন্দ্রশক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব দুগ্ধস্থ খাদ্যবস্তু চন্দ্রশক্তি। দুগ্ধে স্বর্গস্থপিতা বা রসময় পদার্থ ও তাহার পুত্র বা খাদ্যবস্তুশক্তি উভয়ে প্রাণে প্রাণে মিশিয়া আছে। আপনারা একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, বাইবেলে যীশুকে দুগ্ধের ভিতরস্থ খাদ্যশক্তি বা মাখনশক্তিরূপকে আর তাহার ভিতরের পানীয়বস্তুশক্তিকে স্বর্গস্থ পিতারূপকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। আর দুগ্ধের পানীয়শক্তি ও খাদ্যশক্তিতে যে

সর্ব্বভূতের প্রাণ বা বীজ সুক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান আছেন তাহাকেই পবিত্র আত্মা বলিয়া বর্ণনা করিয়া রাখিয়াছে।

এই হিসাবে দেখা যায়, প্রভুযীশু খাদ্যশক্তি স্বরূপ চন্দ্রশক্তি বা প্রকৃতিশক্তি সদৃশ। বাঙ্গলার শ্রীগৌরাঙ্গ ও প্রভুযীশু একই রূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছেন। কারণ শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্তগণও শ্রীগৌরাঙ্গকে বাহিরে রাধাশক্তি বা প্রকৃতিশক্তি, ভিতরে কৃষ্ণশক্তি বা পুরুষশক্তি সদৃশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গও যে দুগ্ধস্থ খাদ্যশক্তি বা চন্দ্রশক্তি অর্থাৎ মাখনসদৃশ রূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছেন তাহা আমি পরে তাঁহার জীবন বৃতান্ত সকল আলোচনা করিয়া আপনাদিগকে স্পষ্টতঃভাবে দেখাইতে পারিব বলিয়া আশা করি। মাখনের বহিঃর্ভাগরূপ খাদ্যবস্তুই সদ্ভাব বা ব্রহ্মভাব অর্থাৎ খাদ্যশক্তিরূপ পরমাপ্রকৃতি শ্রীরাধা। আর মাখনের ভিতরস্থ পানীয়শক্তি তদ্ভাব অর্থাৎ কূটস্থ চৈতন্য বা শ্রীকৃষ্ণরূপপুরুষশক্তি। মাখনস্থ এই খাদ্য ও পানীয়শক্তির ভিতর সর্ব্বভূতের বীজস্বরূপ যিনি সূক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান আছেন তিনিই হিন্দুশাস্ত্রে "ওঁ" নামে কথিত হন। যেমন শ্রীগৌরাঙ্গ বৈরাগ্য গ্রহণ করিয়া সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, তেমন কোরানমজ্বীদেও বলে যে, "যীশুকে ঈশ্বর বৈরাগ্যদ্বারা উন্নমিত করিয়াছিলেন।" অতএব শ্রীগৌরাঙ্গ ও প্রভুযীশুখৃষ্টকে একভাবাপন্ন বলিয়াই বোধ হয়। কোরাণ-মজ্বীদে হজরৎ মহম্মদকে যে, দুগ্ধের পানীয়শক্তি বা পুরুষশক্তি রূপকে, হিন্দুর রামায়ণে শ্রীরামকে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকেও দুগ্ধস্থ পানীয়শক্তি বা পুরুষশক্তি রূপকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, ইহা আমি পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব। জগতে সচরাচর দেখা যায় প্রকৃতিশক্তি বা স্ত্রীজাতি, পুরুষজাতি অপেক্ষা অধিক স্থলে অক্রোধী ও অধিক কষ্ট সহিষ্ণু। তাই প্রভুযীশুকে ও শ্রীগৌরাঙ্গকে প্রকৃতিশক্তিসদৃশই দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর হজরৎ মহম্মদ, শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোচিত যুদ্ধবিগ্রহাদি

করিয়াছেন বলিয়াই ধর্ম্মশাস্ত্রে বর্ণিত রহিয়াছে। প্রভূযীশু যে প্রকৃতই দুগ্ধশক্তি সদৃশ নিম্নে তাহার আরও দুই একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা আপনাদিগকে জানাইতেছি। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাইবেলে বলে, ভগবানের ঔরসে কুমারী মরিয়মের গর্ভে যীশুর জন্ম হইয়াছিল। আমরা ভারতবর্ষে যে কদাচিৎ দুই একটি কামধেনু বা কপিলা গাভী দেখিতে পাই প্রকৃত প্রস্তাবে শুধু উহাদের খাদ্য ও পানীয় শক্তিরূপ ভগবানের ঔরসেই কুমারী অবস্থায়, উহাদের পালানে যীশুশক্তি সদৃশ দুগ্ধ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বাইবেলে মথি লিখিত সুসমাচার বলে, "যেন ভাববাদী দ্বারা কথিত প্রভুর এই বচন পূর্ণ হয়" "আমি মিশর হইতে আপন পুত্রকে ডাকিয়া আনিলাম"। বাইবেলে, কোর-আনে ও ইঞ্জিল কিতাবে "মিশর" বাক্যটি যে, কৃষিজাত শস্যকণা বা তৃণলতা প্রভৃতি রূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে তাহা আমি পরে দেখাইব। অতএব "মিশর হইতে আপন পুত্রকে ডাকিয়া আনিলাম" অর্থে কৃষিজাত ঐ সকল খাদ্য বস্তু হইতেই যে দুগ্ধবতী পশুদের দুগ্ধ উৎপন্ন হয়, সেই কথা আলঙ্কারিকভাবে এস্থলে বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার বলা হইয়াছে, "কেননা লেখা আছে, "তিনি আপন দূতগণকে তোমার বিষয়ে আজ্ঞা দিবেন, আর তাঁহারা তোমাকে হস্তে করিয়া তুলিয়া লইবেন, পাছে তোমার চরণে প্রস্তরের আঘাত লাগে"। এই বাক্যের ভাবার্থ এই যে, যেহেতু দুগ্ধবতী পশুদোহনকালে, যে কোন পাত্রদ্বারা মানুষ, যীশুশক্তিসদৃশ ঐসকল পশুদের দুগ্ধকে, হস্তে করিয়াই তুলিয়া লইয়া থাকে। আমি এখন হিন্দুর রামায়ণ, মহাভারত শ্রীমদ্ভাগবৎ, চণ্ডী ও তন্ত্র এবং মুসলমানের কোর-আন শরিফের ঘটনা সকল হইতেও আপনাদিগকে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, জগতের সকল ধর্ম্মগ্রন্থেই অপ্রাকৃত খাদ্যবস্তু অর্থাৎ শুধু দুগ্ধশক্তিকেই প্রধান নায়ক বা নায়িকারূপে মানুষ সাজাইয়া নানাপ্রকার আলঙ্কারিকভাবে বর্ণনা করিয়া রাখিয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়।

হিন্দুশাস্ত্রে চারিটি যুগের কথা উল্লেখ আছে,—যথা সত্য ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি। এই চারি যুগে প্রধানতঃ ভগবানের চারিটি অবতারের কথাও বর্ণিত রহিয়াছে। যথা সত্যযুগে শ্রীহরি, ত্রেতায় শ্রীরাম, দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ ও কলিতে শ্রীবুদ্ধ বা বৈষ্ণব মতে শ্রীগৌরাঙ্গ। এখন আমি সর্ব্বপ্রথম সত্যযুগের হরি বা বিষ্ণু সম্বন্ধে আপনাদিগকে কিছু জানাইতেছি। হৃ ধাতু ইন্ প্রত্যয় করিলে হরিপদ সিদ্ধ হয়। হৃ ধাতুর অর্থ হরণ করা বা নষ্ট করা। অর্থাৎ পৃথিবীর ভার বা পাপ হরণ অর্থাৎ নষ্ট করেন যিনি বা যে বস্তু, তাঁহাকেই হরি বা বিষ্ণু বলা হয়। হরি শব্দের ভাবার্থ এই যে, ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বা ক্ষুদ্র পৃথিবীরূপ মানবদেহস্থভার বা পাপ হরণ অর্থাৎ নষ্ট করেন যিনি বা যে বস্তু। অতএব বস্তুতত্ত্ব হিসাবে উহা গোদুগ্ধকেই নির্দ্দেশ করে। যেহেতু কৃষিজাত ভক্ষ্যবস্তু ও জীবজন্তুর মাংসরূপ খাদ্যের পাপ বা বিষকে শুধু গোদুগ্ধেই নষ্ট করিতে সক্ষম হয়। হিন্দুশাস্ত্রে হরি বা বিষ্ণুকে পীতাম্বর বা পীতবসনধারী বলিয়া কথিত হয়। বিশুদ্ধ গোদুগ্ধের বর্ণ যে পীতবর্ণ, ইহা বোধ হয় আপনারা অনেকেই অবগত আছেন। অতএব গোদুগ্ধশক্তিই হরি বা বিষ্ণু সদৃশ। অর্থাৎ সূক্ষ্মাণুসূক্ষ্মভাবে জ্যোতির্ম্ময়রূপে যে ব্রহ্মশক্তি উহাতে বর্ত্তমান আছেন, তাঁহাকেই হরি বা বিষ্ণু বলে। এইজন্যই হিন্দুশাস্ত্রে গোমাতাকে বিষ্ণুর বা হরির আশ্রয়স্থান

বলিয়াই নির্দ্দেশ করে। নাম এবং নামী অভেদ অর্থাৎ নাম করিলেই নামীকে বুঝায়। হিন্দুশাস্ত্রে বলে, হরি বা রাম নামে মৃত্যু দূরে পালায়। ঐ হরি বা রামরূপ গোদুগ্ধে যে মানবের অমরত্ব বর্ত্তমান আছে, এস্থলে এই বাক্যে তাহাই প্রমাণ করিতেছে। তাই শব বহনকালে, "রাম নাম সত্য হায়" পশ্চিম দেশীয়, ও "বল হরি, হরি বোল" বলিয়া, বাঙ্গালী হিন্দুগণ ধ্বনি করে। হিন্দুগণ বলেন, "হরিনাম বড় মিঠা" ইহার অর্থ এই যে, হরি স্বরূপ গোদুগ্ধ সুস্বাদু বলিয়াই তাঁহার নামও মিষ্টি। তাই হিন্দুশাস্ত্রে বলে যে, প্রকৃত্যা মধুরম্ গবাং পয়ঃ। অর্থাৎ প্রকৃতি হইতেই গোদুগ্ধ সুমিষ্ট। আবার হিন্দুশাস্ত্রে বলে, জগতের ধর্ম্মতত্ত্ব, পর্ব্বতের গুহার ভিতর নিহিত আছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গোমাতারূপ গোমুখী পর্ব্বতের নিম্নস্থিত সছিদ্র বাঁটযুক্ত পালানই এস্থলে গুহারূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। এবং ঐ পালানস্থ রসময়হরি বা বিষ্ণু সদৃশ গোদুগ্ধেই জগতের আত্মতত্ত্ব বা ধর্ম্মতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। হিন্দু ব্রাহ্মণগণ, ঘটোৎসর্গ করিবার কালে মন্ত্রে বলিয়া থাকেন,—"প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরোহরিঃ।" অর্থাৎ হে পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্ব-যজ্ঞেশ্বর হরি, তুমি প্রীত হও। এস্থলে যজ্ঞ শব্দের অর্থ যদি ভোজন কার্য্য ধরিয়া লওয়া হয় তবে হরিস্বরূপ গোদুগ্ধই যে সকল প্রকার ভোজ্যবস্তুর ঈশ্বর বা শ্রেষ্ঠ উক্ত বাক্যে তাহাই সপ্রমানিত হয়। হিন্দুশাস্ত্রে সত্যযুগের লোকদিগকে অমর বলিয়া কথিত হয়। "সত্যযুগে হরি ছিলেন" ইহার ভাবার্থ এই যে, সত্যযুগে মানবের শুধু গোদুগ্ধই খাদ্য ছিল। তারপর ত্রেতাযুগের রামকেও গোদুগ্ধশক্তিই নির্দ্দেশ করিতেছে। যেহেতু রাম, হরি বা বিষ্ণুরই অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপে দ্বাপরে কৃষ্ণ ও কলিতে বুদ্ধ এবং গৌরাঙ্গ, ইঁহারাও সকলেই হরি বা বিষ্ণুর অবতার বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত রহিয়াছে। অতএব ইঁহারাও যে প্রত্যেকেই গোদুগ্ধশক্তিরূপে শাস্ত্রে আলঙ্কারিকভাবে বর্ণিত রহিয়াছে তাহাও আপনাদিগকে পরে

দেখাইতে চেষ্টা করিব। কলির শেষে শ্রীগৌরাঙ্গ, অভক্ষ্য ভক্ষণজনিত বিষদ্বারা আক্রান্ত মৃত প্রায় কলির জীব উদ্ধারের জন্যই হরিনাম কীর্ত্তণ প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কারণ কলির শেষে মানবের গোদুগ্ধ সেবন প্রায় একেবারে উঠিয়া যাওয়ার উপক্রম হওয়ায় শ্রীগৌরাঙ্গ, মুমুর্ষু কলির জীবের জন্য প্রথমতঃ গোদুগ্ধরূপ হরিনামে রুচিবর্দ্ধনের জন্যই তিনি আচণ্ডাল ব্রাহ্মণে কোল দিয়া হরিনাম প্রচার করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে গোদুগ্ধই চৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত "উন্নত উজ্জ্বলরস।" তাই বৈষ্ণবগ্রন্থে বলে যে, কোটিযুগ করে যদি হরিনাম সংকীর্ত্তন. তথাপি না পায় ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দন। যেহেতু শুধু গোদুগ্ধই শাস্ত্রে ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ মুসলমানশাস্ত্রেও বলে যে, লাএলাহা ইল্ আল্লা মোহাম্মদ রছুল উল্লা এই কলেমা শুধু কেহ মুখে উচ্চারণ করিলেই প্রকৃত মমিন (মুসলমান) হইতে পারে না। কারণ মুসলমানশাস্ত্রেও বলে যে, এই কলেমারজাত ও ছিফাত অর্থাৎ সামঞ্জস্যভাব ও স্বভাব বর্ত্তমান আছে। তাহা কামেল-পীরের (সৎগুরুর) নিকট জানিয়া লইতে হয়। এইরূপ হিন্দুগণের হরিনামেরও সামঞ্জস্যভাব এবং স্বভাব বস্তুশক্তিতে বর্ত্তমান আছে। তাহাও সৎগুরুর নিকট জানিয়া লইতে হয়। হিন্দুর হরিনামের সামঞ্জস্যভাব ও স্বভাব এবং মুসলমানের কলেমার জাত ও ছিফাত শুধু এক দুগ্ধেই যে, একমাত্র সম্যকরূপে পরিলক্ষিত হয় ইহা পরেজানাইব। হিন্দুশাস্ত্রে বলে, বিষ্ণু বা হরির বাহন গরুড়পাখী। এই গরুড়পাখী সর্প (বিষ) ভক্ষণ করে বলিয়া কথিত হয়। এই গরুড়পাখীকে আর্য্যগণ রণদেবতা বলিয়া পূজা করিতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে গোদুগ্ধই গরুড়-পাখিরূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। পবিত্র কোর-আনেও যে একস্থলে দুগ্ধকে পাখীরূপকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে তাহা পরে দেখাইব। গোদুগ্ধই গোমাতার পালানস্থ দুই বাঁটরূপ ডানাদ্বারা পতিত হয় এবং পৃথিবীজাত শস্যকণা প্রভৃতি খাদ্যের বিষকে (সর্পকে) ভক্ষণ বা নষ্ট করিয়া থাকে। হিন্দুশাস্ত্রেবলে সত্যযুগে প্রহ্লাদ হরিভক্ত

ছিলেন। এবং তিনি হরিনামের গুণে বিষপান হইতে, হস্তির পদতল হইতে, সাগরের জলে নিক্ষেপ হইতে এবং অগ্নিদ্বারা প্রজ্জ্বলিত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন। অর্থাৎ হরিনামের গুণে এই সমস্ত বিপদেও তাঁহার প্রাণ নষ্ট হয় নাই। এই প্রহ্লাদকেও শুধু গোদুগ্ধরূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। কারণ হিন্দুদের শাস্ত্রে বলে যে, একাগ্রচিত্তে যে যাহার ভাবনা বা উপসনা করে সে তখন সর্ব্ববিষয়ে তদ্ভাবপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেইরূপ প্রহ্লাদও একাগ্রচিত্তে হরিকে চিন্তা করিতে করিতে হরি অর্থাৎ গোদুগ্ধেরই ভাবপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যেহেতু প্রহ্লাদের পিতা প্রহ্লাদকে বিষপান করিতে দিয়াছিলেন। তারপর হস্তিপদতলে, সাগরের জলে এবং সর্ব্বশেষে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষেপ করা সত্ত্বেও প্রহ্লাদের কোনই ক্ষতি হইয়াছিল না। আমি পূর্ব্বেও প্রভুযীশুর ঘটনাবলি উপলক্ষে আপনাদিগকে দেখাইয়াছি এবং এখনও পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, দুগ্ধে পিত্তরস বা টকরস মিশ্রিত করাই গোদুগ্ধরূপ প্রহ্লাদের বিষপান করা, মন্থনদণ্ডদ্বারা মন্থন করাই হস্তিপদতলে নিক্ষেপ করা, মন্থিত দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন মাখনকে জলে রাখা কার্য্যই প্রহ্লাদকে সাগরে নিক্ষেপ করা এবং ঐ মাখনকে পুনঃ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া ঘৃতে পরিণত করা কার্য্য প্রভৃতিকেই প্রহ্লাদকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষেপ করা রূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। দুগ্ধে পিত্তরস বা টকরস অর্থাৎ বিষ মিশ্রিত করিয়া ঐ সকল কার্য্যের দ্বারা ঘৃতে পরিণত করা পর্য্যন্ত যেমন দুগ্ধের সত্ত্বের কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না, তদ্রূপ প্রহ্লাদকেও ঐ সমস্ত কার্য্যদ্বারা তাঁহার পিতা তাঁহার কোন ক্ষতি করিতে সক্ষম হন নাই। যে স্ফটিকের স্তম্ভ হইতে হরি নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বাহির হইয়াছিলেন, ঐ স্ফটিকস্তম্ভ মাখনের স্তম্ভরূপকেই আবৃত হইয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ আপনারা লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে, গোমাতাকে কোন আসনে মানুষের ন্যায় হস্তপদাদিবিশিষ্ট

করিয়া বসাইলে ঐ নৃসিংহমূর্ত্তি, গোমাতার আকারের অনুরূপই দেখায়। প্রহ্লাদের জীবনবৃত্তান্ত হইতেও বেশ বুঝা যায় যে, গোদুগ্ধে মানুষের অমরত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে। আজকাল ভারতে মহাত্মা গান্ধী যে, অহিংসা ব্রত অবলম্বন করিয়াছেন, ভাবিয়া দেখিলে তাঁহার বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে, কৃষিজাত শস্যকণা ও জীবজন্তুর মাংস প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া শুধু দুগ্ধের উপর খাদ্য নির্ভর করিলেই প্রকৃত অহিংস হওয়া যায়; নচেৎ নহে। কারণ আমরা যে গোধূম ও ধান্য হইতে তণ্ডুল বাহির করিয়া অন্ন প্রস্তুত করিয়া থাকি উহাতেও জীবহিংসা করা হয়। যেহেতু ঐ গোধূম ও ধান্য হইতে তাহার গায়ের খোষা বা তুষ না ছাড়াইয়া লইলে উহা হইতে অন্ন প্রস্তুত করা যায় না। ঐ সকল শস্যকণা হইতে খোসা বা তুষ না ছাড়াইলে উহা হইতে পুনর্ব্বার শস্যকণার গাছ সকল জন্মিয়া থাকে। অর্থাৎ ঐ সকল শস্যকণাতে তাহাদের শস্যলতার জীবনীশক্তি নিহিত থাকে। বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকগণও বলিতেছেন যে, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি জীব জন্তুর ন্যায় বৃক্ষ লতারও জীবনীশক্তি আছে। এবং অন্যান্য প্রাণিদের ন্যায় উহাদেরও বহু বিষয়ে অনুভূতি আছে। সত্যযুগের নারদকে হিন্দুশাস্ত্রে অমর বলিয়া কথিত হয়। এবং নারদ ঢেঁকি বাহনে গমনাগমন করিতেন বলিয়া উল্লেখ আছে। নার শব্দ দা ধাতু ড প্রত্যয় করিলে নারদ এই পদ সিদ্ধ হয়। ইহার ভাবার্থ এই যে, নার অর্থাৎ জল দান করেন যিনি বা যে বস্তু। বিশেষতঃ খাদ্যবস্তুতত্ত্ব হিসাবে নারিকেলকেই নারদশক্তি বুঝায়। নারিকেল বৃক্ষ সচরাচর বৃহৎ ঢেঁকি সদৃশই দেখায়। নারিকেলের খোলে ভাল বীণাযন্ত্র প্রস্তুত হয় বলিয়া, নারদ বীণাযন্ত্র বাজাইতেন বলিয়া উল্লেখ আছে। নারদের অমরত্বের ভাবার্থে বুঝা যায় যে, বিশেষ কোন কারণবশত নারিকেলেও মানুষের অমরত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে; যদিও তাহার বীজ নষ্ট করিয়াই

উহা হইতে আমরা খাদ্য সংগ্রহ করি। হিন্দুশাস্ত্রে ত্রেতা-যুগের বিভীষণ ও দ্বাপরের যুধিষ্ঠির প্রভৃতি অমর ব্যক্তি-গণকেও যে, এই নারিকেলরূপকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে তাহাও আমি পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব। নারিকেলেও যে মানুষের অমরত্ব শক্তি বর্ত্তমান আছে, আর্য্যমুনিঋষিগণ তাহা বহু গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়া হিন্দুর প্রত্যেক পূজা পার্ব্বনে নৈবেদ্যরূপে নারিকেল সেবার বিধান প্রচার করিয়া গিয়াছেন। মুসলমান, খৃষ্টীয়ান, য়ীহুদি প্রভৃতির ইঞ্জিল কিতাবে (পুস্তকে) লেখা আছে যে, হজরত আদম ও ইভের অর্থাৎ জগতের আদি মানবের দুইটি পুত্র ছিল। তাহাদের একজনের নাম হাবিল (Abel) এবং অপর একজনের নাম কাবিল (Cain) ছিল। ইহাদের ভিতর হাবিল মেষ পালক ছিলেন এবং কাবিল কৃষিকার্য্য করিতেন। উভয়ে অনাদি প্রভুর অনুকম্পালাভ করিবার জন্য, হাবিল তাহার মেষজাত খাদ্যবস্তু লইয়া এবং কাবিল তাহার কৃষিজাত খাদ্যবস্তু লইয়া ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইলেন। ঈশ্বর হাবিলের মেষজাত খাদ্যবস্তু গ্রহণ করিলেন কিন্তু কাবিলের কৃষিজাত খাদ্যবস্তু গ্রহণ করিলেন না। এস্থলে হাবিলের মেষজাত খাদ্যবস্তুর ভাবার্থে মেষের মাংসকে না বুঝাইয়া তাহার দুগ্ধকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। এইরূপ বাইবেলেরও অনেক স্থলে বৃষ এবং মেষের রুধির অর্থে গো এবং মেষের দুগ্ধরূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। হিন্দুদের কালীমূর্ত্তি প্রভৃতির পূজার সময় যে, ছাগ, মহিষ মেষ প্রভৃতি বলি দেওয়া বা হত্যা করিবার বিধান রহিয়াছে উহাও উহাদের দুগ্ধে পিত্তরস বা টকরস মিশ্রিত করিয়া ভোজন করাই রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। মানুষ ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বৃথা জীব হিংসা করিয়া থাকে। হিন্দু আর্য্যঋষিগণ বহু গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়া গিয়াছেন, যেমন মহিষ দুগ্ধে অনাসক্ত তাড়িৎ বা বিষ বর্ত্তমান আছে; তদ্রূপ

ছাগ ও মেষ দুগ্ধেও কিছুনা কিছু বিষ বর্ত্তমান আছে। এবং অনাসক্ত তাড়িৎ বা বিষযুক্ত খাদ্য মাত্রই যে, কালী বা মৃত্যু সদৃশ, ইহা আমি পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব। তাই ঐ সকল প্রাণিগণের দুগ্ধে টকরস বা পিত্তরস সংযোগে দধিতে পরিণত করিয়া অর্থাৎ উহাদের দুগ্ধকে বলি দিয়া বা হত্যা করিয়া ভোজন করিলে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না এবং ঐ প্রকারে উহাদের দুগ্ধের দধি কিম্বা তাহা হইতে উৎপন্ন খাদ্যবস্তু সেবন করিলেই প্রকৃত কালীপূজা করা হয়। অর্থাৎ মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ সকল প্রাণিগণের শুধু দুগ্ধ পান করা নিতান্তই অবিধেয় কার্য্য। তাহাতে মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া প্রকৃতই অসম্ভব। এইরূপ ছাগল ও মেষ দুগ্ধে টকরস বা পিত্তরস মিশ্রিত করা কার্য্যই উহাদিগকে বলি দেওয়া বা হত্যা করার বিধান, শাস্ত্রে আলঙ্কারিকভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। ইহার যথাযথ ভাব হিন্দুর দক্ষরাজ (ছাগশক্তি) কর্ত্তৃক শিবরহিত যজ্ঞে বিশেষরূপ পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে। কারণ গো, মেষ ও ছাগ প্রভৃতি দুগ্ধবতী প্রাণিগণের দুগ্ধের দধিই প্রকৃত শিবযুক্ত যজ্ঞ বা ভোজন বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হয়। যেহেতু ঐ সকল প্রাণিগণের দুগ্ধের ভিতর যে পানীয় শক্তি দৃষ্ট হয়, উহাই শিবশক্তি সদৃশ। আর ঐ দধির ভিতর যে খাদ্যবস্তুশক্তি বর্ত্তমান থাকে উহাই সতীশক্তি এবং দুগ্ধস্থ খাদ্য ও পানীয়শক্তি একত্রে হরিশক্তি সদৃশ।

দক্ষরাজ (ছাগশক্তি) শুধু দুগ্ধকেই জগতের খাদ্যরূপে প্রচলন করিতে প্রয়াসী হইয়া শিবরহিত যজ্ঞের বা ভোজনের আয়োজন করিয়াছিলেন। তাহাতে সকল দেবতাগণই অসম্মত হইলেন এবং দধীচিমুনি তৎজন্য যজ্ঞস্থল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এই দধীচিমুনিই, শাস্ত্রে দধিশক্তিরূপে এবং তাঁহার হাড় অর্থাৎ দধি হইতে উৎপন্ন মাখনশক্তিই, বৃত্রাসুর বা অনাশক্তি তাড়িৎ অর্থাৎ স্বর্গের চিরশত্রু—মৃত্যুসংহারকবজ্ররূপে রূপকাবৃত হইয়া

রহিয়াছে। দধীচিমুনি বা দধি যজ্ঞস্থলে বা ভোজবাড়ীতে উপস্থিত না থাকিলে যজ্ঞ বা ভোজন কার্য্য যে, সুসম্পন্ন হয় না তাহা বোধ হয় হিন্দুমাত্রই অবগত আছেন। এইজন্যই দক্ষের (ছাগশক্তির) যজ্ঞ পণ্ড হইয়াছিল। এবং সতী, পতিনিন্দারূপ টকরস বা বিষ সংযোগে দেহত্যাগ করিলে, যখন শিব সতীর মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিলেন, সেই সময় বিষ্ণু সুদর্শনচক্র সহযোগে সতীর দেহ অর্থাৎ দুগ্ধস্থ ছানাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া একান্ন ভাগে বিভক্ত করিলেন। এবং এই প্রকারে একান্ন প্রকার দুগ্ধস্থ উপাদেয় খাদ্যবস্তুরূপে জগতে প্রচার করিয়া একান্ন পীঠ নামে পরিচিত করিলেন। দক্ষরাজার ছাগ মুণ্ডে পরিণত হওয়া কার্য্যই ছাগশক্তি যে, দক্ষরাজরূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছেন তাহাই প্রমাণ করিতেছে। শুধু দুগ্ধেই হরি এবং হরের মিলন দৃষ্ট হয়। এইজন্যই কেহ কেহ "হর" এবং "হরি" একই অর্থবোধক বলিয়া থাকেন। সতীর শিবকে বিবাহ করার ভাব হইতেও বুঝা যায় যে, দুগ্ধে পানীয়শক্তিরূপে শিব (মৃত্যু বা বিষ) বর্ত্তমান আছেন।

বর্ত্তমান যুগের ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের এই বৈজ্ঞানিক আত্মতত্ত্বের কথা কালপ্রভাবে বিস্মরণ হেতু একে আর করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহারা বৃথা ছাগ, মহিষ প্রভৃতি প্রাণিগণকে হত্যা করিয়া কালী প্রভৃতি দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। এবং তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষকৃত শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া বলিয়া থাকেন যে, আমাদের শাস্ত্রে ঐ সকল প্রাণিগণকে এইরূপ ভাবে বলি দেওয়া বা হত্যা করার বিধান রহিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সকল প্রাণিগণের দুগ্ধে টকরস বা পিত্তরস মিশ্রিত করিয়া উহাকে দধিতে পরিণত করাই শাস্ত্রে আলঙ্কারিক ভাবে উহাদিগকে বলি দেওয়া বা হত্যা করার কথা বর্ণিত রহিয়াছে। জগতের কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেই "জীবহিংসা" ধর্ম্মকার্য্য বলিয়া প্রচারিত হয় নাই। এইরূপে কোর-আন লিখিত গো

হত্যাও যে, মোতাশাবেহাতুন বা আলঙ্কারিকভাবে বর্ণিত রহিয়াছে আমি পরে তাহা পবিত্র কোর-আনের সূরা "বকরা" হইতে যথাসাধ্যমতে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। এবং হিন্দু আর্য্যঋষিগণ যে, একবিংশতি দিনের গোবৎসকে হত্যা করিয়া অতিথিসৎকার করিতেন তাহাও যে, আলঙ্কারিকভাবে ইঞ্জিলকিতাবে বর্ণিত হজরত এব্রাহিম কর্ত্তৃক পুত্র কোরবাণীর সহিত একইরূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহাও আমি পরে আপনাদিগকে দেখাইতে চেষ্টা করিব। মুসলমান শাস্ত্রে বলে যে, হজরৎ মোহাম্মদ মেরেজে অর্থাৎ আটতালা উপরিস্থিত স্বর্গে, ফেরেস্তা কর্ত্তৃক নীত হইলে তথায় তাঁহার নিকট এক পেয়ালা দুগ্ধ, এক পেয়ালা জল ও এক পেয়ালা মদ্য উপস্থিত করিয়া উহাদের ভিতর যে কোন একটিকে ইচ্ছানুরূপ পান করিতে ফেরেস্তাগণ তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাহাতে হজরত মোহাম্মদ জল ও মদ্যের পেয়ালা ত্যাগ করিয়া শুধু দুগ্ধ পেয়ালাই পান করিয়াছিলেন। ইঞ্জিল কিতাবের একস্থানে দেখা যায় যে, "হজরত এব্রাহিম তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রী হাজেরা ও হাজেরার গর্ভজাত পুত্র বালক স্ইমাইলকে কিছু খাদ্যবস্তু ও পানীয় সহযোগে নিঃসহায় ও নিরাশ্রয়ভাবে বৃক্ষলতাদিশূন্য আরবের মরুভূমিতে নির্ব্বাসিত করেন। অল্প স য়ের মধ্যেই হাজেরা ও ইস্মাইলের খাদ্য ও পানীয় নিঃশেষ হওয়ায়, বালক ইস্মাইল জল পানের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। হাজেরা ইস্মাইলের এই ভাব নিরীক্ষণ করিয়া অতি ব্যাকুল হৃদয়ে ছাফা ও মারওয়া পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তীস্থলে জল অন্বেষণে ধাবমান হইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। সেই সময় ঈশ্বরের ফেরেস্তা, স্বর্গ হইতে হাজেরাকে ডাকিয়া কহিলেন যে, "হাজেরা! তুমি কাতরা কেন, ভয়াতুরা হইও না। ঈশ্বর বালকের কাতরধ্বনি শুনিয়াছেন; উঠ, বালকটিকে তুলিয়া কোলে লও, ঈশ্বর তাহা হইতে এক

মহাজাতি উৎপন্ন করিবেন।” ঈশ্বর হাজেরার চক্ষুর্দ্বার উদ্ঘাটিত করিলেন। হাজেরা জলপূর্ণ এক কূপ দেখিতে পাইলেন এবং তথা হইতে জল আনিয়া বালকের তৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। ছাফা ও মারাওয়া পর্ব্বতদ্বয় এই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ এখনও বর্ত্তমান আছে। হাজিগণ হজের সময় ক্ষমা ও করুণা প্রার্থী হইয়া হাজেরার অনুকরণে ছুটাছুটি করিয়া থাকেন। ঐ কূপই জম্‌জম্ কূপ নামে বিখ্যাত। ভবিষ্যতে ঐ স্থানে মক্কা নগর প্রতিষ্ঠিত হইল। এখনও মক্কার কাবাসরিপে হজগৃহের বাহিরে এক জম্‌জম্ কূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে।” মুসলমানগণ মক্কায় হজকরিতে যাইয়া ঐ জম্‌জম্ কূপের জল অতি পবিত্র জ্ঞানে সকলেই কিছু পান করিয়া থাকেন। এখন আপনারা চিন্তা করিয়া দেখুন যে, এই জম্‌জম্ কূপের পানি বা জল অর্থে শুধু দুগ্ধকেই বুঝাইতেছে কিনা? কারণ ঈশ্বরের ফেরেস্তাগণ, হাজেরাকে শুধু জম্‌জম্ কূপের পানিই দেখাইয়াছিলেন। অথচ অন্য কোনও খাদ্যবস্তুর কথা উল্লেখ করিলেন না। শুধু জল খাইয়া মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু শুধু একমাত্র দুগ্ধ খাইয়া মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে সক্ষম হয়। বিশেষতঃ মরুভূমিতে অন্য কোন প্রকার খাদ্যবস্তু থাকাও সম্ভবেনা। অতএব এখানে জম্‌জম্ কূপের পানি অর্থে শুধু ছাগলের দুগ্ধকেই বুঝাইতেছে। অর্থাৎ ছাফা ও মারওয়া পর্ব্বতে অবশ্য ছাগল বর্ত্তমান ছিল। তাই শুধু ছাগলের দুগ্ধ পান করিয়াই হাজেরা ও ইস্‌মাইল জীবিত ছিলেন। বিশেষতঃ কোর্-আনে এবং ইঞ্জিল কিতাবে, দুগ্ধবতী প্রাণিগণই যে, ঈশ্বরের ফেরেস্তাগণরূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে, তাহা আমি পরে ঈশ্বরের আজ্ঞায় ফেরেস্তাগণ কর্ত্তৃক আদমকে ছেজ্‌দা (নমস্কার বা মান্য) করার ভাব হইতে দেখাতে চেষ্টা করিব। এই ইস্‌মাইলের বংশ হইতেই মুসলমানদের শেষ নবি হজরত মোহাম্মদের জন্ম হয়। ইঞ্জিল কিতাবের এই

সকল ঘটনা মুসলমান, খৃষ্টীয়ান, য়ীহুদি প্রভৃতি সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। এক তত্ত্বকেই দেশ কাল ও পাত্রভেদে জগতের ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন রূপকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। মায়ামুগ্ধ জীব সহজে তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জগতের প্রত্যেক ধর্ম্মগ্রন্থের ভাবই অনেকস্থল দ্ব্যর্থবোধক এবং বহুস্থান বহু আলঙ্কারিকভাবে পরিপূর্ণ। যাঁহারা স্থূলে বা সরিয়তে অর্থাৎ সংসারে বদ্ধজীবরূপে আছেন, তাঁহারা ঐ সকল ধর্ম্মগ্রন্থের বাক্য আপন আপন ইচ্ছানুরূপ ভুল অর্থ করিয়া জগতে নানাভাবে নানাপ্রকার অশান্তির সৃষ্টি করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষ বা ভাববাদী তাঁহারাই উহার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া থাকেন। এই পর্য্যন্ত জগতের যে সকল মহাপুরুষগণ ঐ সকল ধর্ম্মগ্রন্থের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, দেশ, কাল ও পাত্রভেদে তাঁহাদের ভিতরেই কেহ ঈশ্বরের নবি, কেহ রছুল, কেহ পুত্র, কেহ আংশিক অবতার, কেহ পূর্ণ অবতার হইয়া গিয়াছেন। এবং এই পর্য্যন্ত তাঁহারা নিজদের বিশেষ কোন অন্তরঙ্গ শিষ্য কিম্বা আপনাপন সন্তান সন্ততিগণ ভিন্ন অপর কাহারও নিকট এই গোপন তথ্য প্রকাশ করিতেন না। এইজন্যই কাল প্রভাবে তাহা সমস্তই প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এবার কলি বা কুড়ি প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এখন পুষ্পবন্তযুগ আরম্ভ হইয়াছে। অতএব করুণাময়ের কৃপায় আর ঐ ফুলের সৌরভ বা আত্মতত্ত্ব গোপন থাকিবে না। এইবার হাওয়ার সহিত মিশিয়া জগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এই "সুসমাচার" পরিব্যপ্ত হইয়া পড়িবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

এখন আপনাদিগকে হিন্দুর ত্রেতাযুগের সীতা ও রাম সম্বন্ধে কিছু জানাইতেছি। হিন্দুশাস্ত্রে বলে অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রাম জন্মিবার ষাট হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাল্মিকমুনি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, বাল্মিক-মুনি শুধু আত্মতত্ত্ব বা নিত্য প্রকৃতিপুরুষরূপ খাদ্য ও পানীয়বস্তুশক্তির ভাব লক্ষ্য করিয়াই প্রথমতঃ রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। তারপর লীলাতে ষাট হাজার বৎসর পরে, অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্রের জীরনচরিত যখন সর্ব্বতোভাবে ঐ নিত্য পুরুষরূপপানীয়বস্তুশক্তির সহিত মিলিয়া যাইতে দেখা গিয়াছিল, তখনই ভারতের আর্য্যঋষিগণ দশরথের পুত্র রামকে পূর্ণব্রহ্মনারায়ণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল কথা সত্য কিনা, তাহা আপনারা আমার নিম্নলিখিত ঘটনা সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলেই অতি সহজে অনুভব করিতে পারিবেন বলিয়া আমি আশা করি। রম্ ধাতু ঘঞ্ প্রত্যয় করিলে রাম এই পদ সিদ্ধ হয়। রম্ ধাতুর অর্থ রমণ করা। অর্থাৎ আত্মায় রমণ করেন যিনি বা যে বস্তু। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রাম শব্দের প্রকৃত অর্থ পরমাত্মা বা রসঘনরূপবস্তু-

শক্তি। রামের পিতার নাম দশরথ। দশরথের পিতার নাম অজ। অজ শব্দের অর্থ যাহা জন্মায় না। শাস্ত্রে বলে যে, পরব্যোম বা পরমাত্মার কখনও জন্ম এবং মৃত্যু নাই। তাহা হইলে পরব্যোমকেই এই হিসাবে অজ বলা যায়। এই পরব্যোম হইতে উৎপন্ন ব্যোমই প্রকৃত দশরথ শক্তি সদৃশ। কারণ ব্যোম বা অনন্ত শূন্যের দশদিগেই পথ উন্মুক্ত রহিয়াছে। অর্থাৎ দশদিগেই তাঁহার রথ অর্থে, বায়ু চলাচল করিতে সক্ষম হয়। শূন্যের বা ব্যোমের শব্দগুণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইজন্যই রামায়ণেও বলিতেছে যে, দশরথের শব্দভেদী বান জানা ছিল। পরশুরাম শব্দের অর্থ উত্তপ্ত বা অগ্নিময় জলীয়বাষ্প বা অগ্নিময় বায়ু। অর্থাৎ উষ্ণ রসময় পদার্থ। তাই রাজা দশরথ বা অনন্ত শূন্য, পরশুরাম বা অগ্নিময় বায়ুর বানের বোঝা গ্রীষ্মকালে বহন করিয়া থাকে। ঐ উষ্ণ বা অগ্নিময় বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় পৃথিবীর বৃক্ষ সকল একেবারে দগ্ধ বা প্রায় নির্ম্মূল হইয়া যায়। তাই হিন্দুশাস্ত্রে বলে যে, ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। এস্থলে জগতের বৃক্ষ সকলকে ক্ষত্রিয় রূপকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে লীলাতে পরশুরাম ক্ষত্রিয়বংশ নির্ম্মূল করিয়াছিলেনও বটে। সে যাহা হউক, আমাদের ভারতবর্ষে বর্ষা সমাগমের পূর্ব্বে অর্থাৎ বসন্ত কালের শেষে ও গ্রীষ্মকালের প্রথমেই এই অগ্নিময় বায়ু প্রবাহিত হয় বা পরশুরামের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ঐ সময়ে রাজা দশরথ বা অনন্তশূন্য শব্দভেদীবান দ্বারা অন্ধমুনিরপুত্র সিন্ধু মুনিকে বধ করাতে, অন্ধমুনির অভিশাপে দশরথের ঔরষে ভগবান রামচন্দ্র চারি অংশে বিভক্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সুমেরু পর্ব্বত অথবা আর্য্যাবর্ত্তের হিমালয় পর্ব্বতই অন্ধমুনি সদৃশ এবং তাহার চূড়ায় বা মস্তকে যে তুষার বা বরফ জমিয়া থাকে, তাহাই সিন্ধুমুনি সদৃশ। ঐ বরফে রাজা দশরথ বা অনন্তশূন্য উষ্ণ বায়ু অর্থাৎ পরশুরাম কর্ত্তৃক প্রাপ্ত

বাণ দ্বারা আঘাত করাতে পর্ব্বতস্থ বরফ দ্রবীভূত হইয়া জলরূপে পরিণত হয় এবং তখনই বর্ষা সমাগনে পৃথিবীতে রাম সদৃশ রসময় পদার্থ বা জল আসিয়া আবির্ভূত হয়। এই জল বা রসময়শক্তিকেই বাল্মিকিমুনি পূর্ণব্রহ্ম রাম বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাই হিন্দুশাস্ত্রে জলকে নারায়ণও বলিয়া থাকে। ইহা হইতে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় যে, বাল্মিকী মুনি শুধু নিত্যবস্তু স্বরূপ অনন্ত প্রকৃতিপুরুষকেই অবলম্বন করিয়া রামায়ণ লিখিয়াছিলেন। যেহেতু লীলার রাম জন্মিবার ষাট হাজার বৎসর পূর্ব্বে তিনি রামায়ণ লিখিয়াছিলেন। রাম স্বরূপ জল বা রসময় পদার্থ চারিভাগে বিভক্ত অর্থাৎ রাম জল, লক্ষণ তাঁহার তরঙ্গ বা উর্ম্মি, ভরত স্রোত অর্থাৎ কাল বা মৃত্যু ও শত্রুঘ্ন জলস্থ ফেনরাশি বা লবনশক্তি সদৃশ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি হিন্দুর সত্যযুগের অবতার হরি বা বিষ্ণুরূপই ত্রেতার রাম অবতার। সেই হিসাবে রামও গোদুগ্ধস্থপানীয়শক্তি সদৃশ, এবং সীতা দুগ্ধস্থ খাদ্যশক্তি সদৃশ। এইজন্যই হিন্দুশাস্ত্রে বলে,—"সীতাজগদ্গীতা"। সত্যযুগে হরি বা গোদুগ্ধই প্রধান খাদ্য ছিল। তারপর ত্রেতাতেও এই রামই রাজা হইবার কথা ছিল অর্থাৎ গোদুগ্ধই জগতে খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইবার কথা ছিল। কিন্তু কৈকেয়ীর কুপরামর্শে রাম এবং সীতা বনে গমন করিলেন এবং তদ্স্থলে ভরত রাজা হইলেন। এইস্থলেই যত সর্ব্বনাশের বীজ অঙ্কুরিত হইল। রাম সীতার বনে যাওয়ার ভাব অর্থাৎ জগতে তখন হইতেই কৃষিজাত খাদ্যবস্তু প্রচলিত হইল। এবং ভরত রাজা হইলেন অর্থাৎ জগতে মহিষ দুগ্ধ, মাখন, ছানা, ঘৃত প্রচলিত হইল এবং তখন হইতেই জগতে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল। যেহেতু হিন্দুশাস্ত্রে মহিষকে যমের বাহণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছে। আমরা জগতে সচরাচর গো, মহিষ, ছাগল, মেষ প্রভৃতি প্রাণিগণ হইতেই দুগ্ধ পাইয়া থাকি এই হিসাবে রাম

গোদুগ্ধ, ভরত মহিষদুগ্ধ, লক্ষণ ছাগদুগ্ধ ও শত্রুঘ্ন মেষদুগ্ধশক্তি সদৃশ। এবং দুগ্ধরূপব্রহ্ম ও সাধারণতঃ এই চারি ভাগেই বিভক্ত। হিন্দুর গীতায় বলে, "ব্রহ্ম অক্ষর হইতে জাত"। অক্ষর অর্থে যাহা ক্ষরে না বা বিনা কারণে পতিত হয় না। আপনারা বোধ হয় প্রায় সকলেই অবগত আছে যে, দুগ্ধবতী প্রাণিগণের স্তন বা পালানস্থ দুগ্ধ, তাহাদের বৎসগণ দ্বারা অথবা মানুষের হস্তদ্বারা আকর্ষিত না হইলে সচরাচর আপন ইচ্ছায়, উহা ক্ষরিত বা পতিত হয় না। যদিও উহাদের সছিদ্র বাঁট নিম্নমুখী হইয়াই উহাদের স্তন বা পালানের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব ঐ সকল প্রাণিগণের দুগ্ধই প্রকৃত ব্রহ্ম বলিয়া কথিত হয়। এবং হিন্দুশাস্ত্রেও যে, উহাদের দুগ্ধকেই ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছে, ইহাও ধ্রুবসত্য। তাই হিন্দুশাস্ত্রে ব্রহ্ম বা ব্রহ্মাকে এই অর্থেই চতুরানন বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। সে যাহাই হউক বাল্মিকমুনি রামায়ণে প্রধাণতঃ রাম ও সীতাকে পৃথিবীজাত শস্যকণা, ফলমুল প্রভৃতি রূপ পানীয় ও খাদ্য-শক্তিরূপেই ব্যাখ্যা করিয়া রাখিয়াছেন। রামায়ণে বলে রাম, মিথিলার রাজা রাজর্ষি জনকের কন্যা সীতাকে হরধনু ভঙ্গ করিয়া লাভ করিয়াছিলেন। সীতা যজ্ঞভূমি কর্ষণকালে লাঙ্গলের সীস্ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ঐ সীতা নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই সকল কথার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বেও বলিয়াছি হিন্দুগণ অনন্ত খাদ্য ও পানীয়শক্তিকে প্রকৃতিপুরুষরূপেই ব্যাখ্যা করিয়া রাখিয়াছেন। গীতায় বলিতেছে জল বা রসময় পদার্থ হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়। সেই হিসাবে জল বা রসময় পদার্থ পুরুষশক্তি এবং খাদ্যবস্তুমাত্রই তাহার প্রকৃতিশক্তি। যজ্ঞভূমি অর্থে যে সকল ভূমিতে যজ্ঞবস্তু বা সেবার বস্তু সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে বা আর্য্যাবর্ত্তে প্রধানতঃ যব হইতেই অন্ন প্রস্তুত হয়। যব উৎপন্ন করিতে হইলে ভূমি কর্ষণ করিয়াই লাভ

করিতে হয়। তাই সীতাকে অর্থাৎ যবরূপ প্রধান খাদ্যবস্তুকে যজ্ঞভূমি কর্ষণকালে পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

যবের ভিতর যে, প্রায় দ্বিখণ্ডিত তণ্ডুলকণা দৃষ্ট হয়, উহাই সীতার যমজসন্তানসদৃশ লব ও কুশ। সীতার স্বয়ম্বরের সময় হরধনু ভঙ্গ করার ভাবার্থ এই যে, পরশুরাম কর্তৃক আনীত হরধনু অর্থাৎ উত্তপ্ত বায়ু দ্বারা বসন্তকালের শেষে বা গ্রীষ্মকালের প্রথমে যবের শীষ্ সুপক্ক অবস্থাপ্রাপ্ত হইলে, ধনুকের মতই বাঁকিয়া পড়ে, তাই ঐ সুপক্ক যবের শীষ্কে হরধনুরূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। ঐ শীষ্ হইতে শস্যকণা লাভ করিতে হইলে রামের হাতের বান অর্থাৎ শরযষ্টি দ্বারা আঘাত কিম্বা রামশক্তিসদৃশ গোজাতি দ্বারা পদদলিত না করিলে, উহা হইতে শস্যকণা বা সীতাশক্তিরূপ খাদ্যবস্তু, অন্য কাহারও দ্বারা লাভ করা যায় না। রাম যজ্ঞভূমি রক্ষার্থে তারকা রাক্ষসীকে বধ করিলেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যে সমস্ত ভূমিতে মানবের খাদ্যবস্তু উৎপন্ন হয় তাহা যদি বালুকারাশিতে পরিপূর্ণ থাকে তবে তাহাতে ভালরূপ কোন শস্য উৎপন্ন হয় না; তাই রাম অর্থাৎ জল বা রসময়শক্তি সমাগমে বর্ষাকালে ঐ বালুকা ভূমির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উজ্জ্বল তারকারাক্ষসীসদৃশ বালুকারাশি বিধৌত হইয়া পলি দ্বারা ভূমিকে উর্ব্বর করে। ইহাই যজ্ঞভূমি রক্ষার্থে রাম কর্তৃক তারকা রাক্ষসী বধের ভাব আলঙ্কারিকভাবে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। রামের চোরাবানে বালিরাজাকে বধের ভাবার্থেও এই ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে অর্থাৎ বর্ষাকালে জল সমাগমে বালিসংযুক্ত মালভূমি বা শস্যক্ষেত্র অতি গোপনভাবে আস্তে আস্তে ভাঙ্গিয়া পড়ে। এইরূপে বালুকাময় মালভূমি সদৃশ বালিরাজা জলে মগ্ন বা মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, বর্ষাকালে উচ্চ গ্রীবা বা উচ্চ চূড়াযুক্ত পর্ব্বতের উপরে শস্যকণা বা মানবের খাদ্যবস্তু জন্মাইয়া থাকে। তাই বালিকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে

রাজা করা হইয়াছিল বলিয়া রূপকাবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। ঐ পর্ব্বতস্থ বালুকাময় মৃত্তিকাতেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উজ্জ্বল তারকা সদৃশ পদার্থ বিদ্যমান থাকে। তাই তখন বালির স্ত্রী তারা সুগ্রীবের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। রামায়ণে হনুমানকে পবননন্দন বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অর্থাৎ মেঘকেই হনুমানরূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। যেহেতু পবন বা বায়ু হইতেই মেঘের উৎপত্তি হয়। হনুমান বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া রামরূপ দেখাইয়াছিলেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, হনুমান সদৃশ মেঘের বক্ষে বা ভিতরে রামস্বরূপ জল বা রসময় পদার্থ সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে। যেমন হিন্দুর নারায়ণ পূজার্থে জল বা রসময়শক্তির পূজা নির্দ্দেশ করে, তদ্রূপ হনুমান বা মহাবীরের পূজার্থেও মেঘের পূজাকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। রামায়ণে বলে হনুমান কুক্ষিতে সূর্য্যকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আপনারা অনেকেই হয়তো ধারণা করিতে পারেন যে, পৃথিবী হইতে চৌদ্দ লক্ষগুণ সুবৃহৎ সূর্য্যকে কি করিয়া হনুমান কুক্ষিতে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল? নিশ্চয়ই ইহা গাঁজাখুরি গল্প মাত্র। কিন্তু আপনারা বর্ত্তমানেই বর্ষাকালে, মেঘ সদৃশ হনুমান দ্বারা সূর্য্যকে তাহার কুক্ষিতে আবৃত হইতে দেখিতে পান। যোগাবশিষ্ট রামায়ণে বলে যে, রাম হনুমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে হনুমান তুমি কে? তখন হনুমান বলিলেন,—"দেহের দিকে লক্ষ্য করিলে তুমি প্রভু আমি তোমার দাস, আর জীববুদ্ধিদ্বারা দেখিলে, আমি তোমার অংশ। তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিলে তুমি আমি অভেদ।" ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, রাম যদি জল বা রসময়শক্তি সদৃশ হয় এবং হনুমান যদি মেঘশক্তি সদৃশ হয় তবে উপরোক্ত ভাবার্থই প্রকাশ পায়। রামায়ণে বলে যে, রামের চরণস্পর্শে কাষ্ঠের তরি সোনা

হইয়াছিল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গো, মেষ, প্রভৃতি দুগ্ধবতী প্রাণিগণ, কাষ্ঠ সদৃশ চারিখানা ক্ষুরে ভর করিয়াই যাতায়াত করে। তাই উহাদিগকে কাষ্ঠের তরিরূপে রূপকাবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। লৌহ নিগেটিভ্ (Nigetive) বা অনাসক্ত সদৃশ অর্থাৎ উহাকে সূর্য্যশক্তি স্বরূপ বলা যাইতে পারে। আর স্বর্ণ পজেটিভ্ (Positive) বা আসক্ত অর্থাৎ চন্দ্রশক্তি স্বরূপ। কিন্তু পৃথিবীজাত শস্যকণা ও জীবজন্তুর মাংস প্রভৃতি খাদ্যবস্তু অনাসক্তযুক্ত বা লৌহযুক্ত চন্দ্রশক্তিসদৃশ। তাই গো, মেষ প্রভৃতির দুগ্ধ অর্থাৎ তাহাদের চন্দ্রশক্তিকে স্বর্ণ সদৃশ চন্দ্র বা "হেমচন্দ্র" রূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। রাম বা রসময় পদার্থের চরণস্পর্শে বা সংস্পর্শে যে, কাষ্ঠের তরি সোনা হইল ইহাই তাহার ভাবার্থ। যেহেতু দুগ্ধবতী প্রাণিগণের খাদ্যস্থ রসময়রূপ রামশক্তি হইতেই দুগ্ধ উৎপন্ন হইয়া থকে। কোন কোন স্থলে গো, মেষ প্রভৃতি দুগ্ধবতী প্রাণিগণকে "কাঠুরিয়া" বলিয়াও আলঙ্কারিকভাবে ব্যাখ্যা করিয়া রাখা হইয়াছে। যেমন এদেশে গ্রাম্যভাষায় একটি গানে বলে যে, "কাঠুরিয়া এক মাণিক পেল, অযতনে তা ফেলে দিল; মাণিক কাঁদে মনের দুঃখে কাঠুরিয়া তা টের পেল না।" এখানে গো, মেষ প্রভৃতির দুগ্ধকেই কাঠুরিয়ার মাণিকরূপে রূপকাবৃত্ত করিয়া রাখা হইয়াছে। বাঙ্গলাদেশে একটি প্রবাদ আছে যে, গোজাতি মৃত্যুর হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার ঔষধ (মৃতসঞ্জীবনী ঔষধ) জানা সত্ত্বেও প্রথমতঃ তাহারা উহা ব্যবহার করে না অর্থাৎ খায় না। কিন্তু মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইলে ঐ ঔষধ অনুসন্ধানার্থে জিভ্ বাহির করিয়া অন্বেষণ করে। তখন আর কিন্তু তাহা প্রাপ্ত হয় না। ইহারও ভাবার্থে বুঝা যায় যে, গোদুগ্ধে অমরত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে। গোমাতাকে কোন কোন স্থলে হাড়ী বলিয়াও উল্লেখ করা হয়। যেমন বৈষ্ণবগ্রন্থের কোন একস্থলে

লেখা আছে যে, "অপ্রাকৃত বেদহাড়ী, শুকদেব তাহাতে সুরী।" এস্থলে অপ্রাকৃত বেদ অর্থে গোমাতাকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে গোমাতাই যে, হিন্দুর সামবেদ সদৃশ ইহা আমি পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব। এইরূপে গোমাতাকে পাষাণ, পর্ব্বত বা গিরি, রোহি, রোহিত প্রভৃতি নামেও হিন্দুশাস্ত্রে নানা স্থলে আলঙ্কারিকভাবে বর্ণনা করিয়া রাখিয়াছে। এবং গোদুগ্ধকেও পাষাণনন্দিনী, গিরিকুমারী, স্পর্শমণি, রোহিতাশ্ব, রোহিদাস, সাবিত্রী বা গায়ত্রী ও সত্যবান, গৌতম ও অহল্যা, এবং বেহুলা ও লখিন্দর প্রভৃতি রূপকে যে, আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে ইহা পরে ক্রমান্বয়ে আপনাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। রামায়ণে বলে রাম-নামের গুণে পাষাণ বা শিলা জলে ভাসিয়াছিল। উহা দুগ্ধস্থ মাখনরূপকেই আবৃত হইয়া রহিয়াছে। যেহেতু মাখন জলের উপর ভাসিয়া বেড়ায়। রামের চরণস্পর্শে পাষাণ মানব হইয়াছিল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পাষাণ সদৃশ দুগ্ধস্থ মাখনে যে, মানবাত্মা বর্ত্তমান রহিয়াছে, এস্থলে শুধু তাহাই প্রমাণ করিতেছে। এবং এস্থলে বাইবেলের লিখিত যীশু যে, মৃতব্যক্তির প্রাণদান করিয়াছিলেন সেই ভাবের সহিত ইহা সামঞ্জস্য হইয়া রহিয়াছে। অতএব যীশু যে, মৃতকে জীবিত করিতেন এবং রামের চরণস্পর্শে যে, পাষাণ মানব হইয়াছিল ইহা একই অর্থমুলক বাক্য। এবং কোর-আনের সূরাবকবায় বর্ণিত "ঈশ্বর যে, হতগোর অঙ্গবিশেষ দ্বারা আঘাত করিয়া মৃতব্যক্তিকে পুনর্জীবিত করেন" তাহাও যে উপরোক্ত ভাবের সহিত সামঞ্জস্য হইয়া রহিয়াছে, ইহা আমি পরে আপনাদিগকে বুঝাইতে বিশেষ চেষ্টা করিব। রামায়ণে বলে যে, পাষাণরূপিণী গৌতমমুনির স্ত্রী অহল্যা রামের চরণস্পর্শে মানবত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই কথার তাৎপর্য্য এই যে; গো শব্দের অর্থ বহুপ্রকার কিন্তু প্রধানতঃ গো-

জাতি পৃথিবীকেই বুঝায়। কোন ব্যক্তির বা বস্তুর উৎকর্ষার্থে "তম" প্রত্যয় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পৃথিবীজাত খাদ্য অর্থাৎ শস্যকণা প্রভৃতি খাদ্যবস্তু হইতে গোদুগ্ধই মানবের শ্রেষ্ঠতম খাদ্য। অতএব এস্থলে গোমাতা বা গাভীকে গোতম বলা যাইতে পারে। এই গোতম শব্দের সহিত ভাবার্থে "ষ্ণ" প্রত্যয় করিলেই গৌতম পদ সিদ্ধ হয়। এখানে গোদুগ্ধস্থ পানীয় শক্তিই গৌতমমুনি ও তাহার স্ত্রী অহল্যাকে গোদুগ্ধস্থ খাদ্যশক্তিরূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। ইন্দ্র শব্দের অর্থ তাড়িৎ বা টক্‌রসযুক্ত বস্তু। গোদুগ্ধ টক্‌রসযুক্ত বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইলে উহা দোষিত বা নষ্টপ্রাপ্ত হয়। অতএব তখন ঐ দোষিত দুগ্ধ বা দধিকে মন্থনদণ্ড দ্বারা মন্থন বা ক্রুশে বিদ্ধ করিলে উহা হইতে মাখন উৎপন্ন হয়। ঐ মাখনকেই পাষাণরূপিণী অহল্যারূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। এস্থলে টক্‌রসযুক্ত আনারসকেই ইন্দ্র বা তাড়িৎশক্তিরূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। ঐ ইন্দ্র সদৃশ আনারসের গায়ে সহস্র লোচন অর্থাৎ অসংখ্য চক্ষু সদৃশ চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে ইন্দ্রকে সহস্রলোচন বলিয়াই কথিত হয়। এইজন্যই হিন্দুশাস্ত্রে বলে যে, গৌতমমুনির স্ত্রী অহল্যা, ইন্দ্রের সহিত সঙ্গম করায় তাঁহার সতীত্ব নষ্ট হইয়াছিল। আজকাল ভারতের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কেহ কেহ বলেন যে, আনারস ভারতীয় ফল নহে। তাঁহারা বলেন, আনারস দক্ষিণ আমেরিকা হইতেই ভারতে আসিয়াছে। তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত নিতান্তই ভুল। ভারতের আনারস শব্দ হইতেই দক্ষিণ আমেরিকার 'আনানস" বাক্যের সৃষ্টি হইয়াছে। গৌতমমুনি ন্যায়দর্শন প্রণয়ণ করিয়া গিয়াছেন। ন্যায়দর্শন অনুমানও প্রত্যক্ষ এই দুই ভাগে বিভক্ত। গোদুগ্ধেও যে, মানবের অমরত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহাও প্রথমতঃ অনুমান পরে প্রত্যক্ষ ভাব দৃষ্ট হইবে।

রামায়ণে বলে, রাম সীতা বনে গেলে পর লঙ্কার রাজা রাক্ষসাধিপতি রাবণ, সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এস্থলে অনাসক্ত তাড়িৎ বা বিষশক্তিকেই রাক্ষসাধিপতি রাবনরূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ পৃথিবীজাত খাদ্যবস্তু বা শস্যকণা প্রভৃতি স্বরূপা সীতা বা ভূগর্ভস্থ চন্দ্রশক্তি অনাশক্ত বা নিগেটিভ (Nigetive) তাড়িৎ অর্থাৎ বিষদ্বারা আক্রান্ত হইলেন। এখানে দেখা যায় যে, হিন্দুর রামায়ণে বর্ণিত রাবন কর্ত্তৃক সীতা হরণের ঘটনার সহিত, মুসলমান, খৃষ্টান ও য়ীহুদি প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ ইঞ্জিল কিতাবে বর্ণিত জগতের আদি মানব আদমের স্ত্রী, ইভ্ বা হাবাকে যে, শয়তান মিথ্যা কথায় প্রলোভিত করিয়া নিষিদ্ধ বৃক্ষ ফলরূপ কৃষিজাত খাদ্যবস্তু অর্থাৎ "গন্দম বা গন্ধম্" খাইতে বাধ্য করিয়াছিল, তাহার সহিত একই রূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। রামায়ণের রাক্ষস রাজা রাবণ ও ইঞ্জিল কিতাবে বর্ণিত শয়তান একই অর্থবোধক। যেহেতু ইঞ্জিল কিতাবে বলে যে, শয়তান বা ইব্‌লিশ আদমকে সেজ্‌দা না করাতে ঈশ্বর যখন তাহাকে অভিশপ্ত করিয়া স্বর্গ হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন; তখন শয়তান বলিয়াছিল, "হে ঈশ্বর আমি তোমার প্রিয় আদমকে অবশ্য দশদিক হইতে আক্রমণ করিয়া সত্যধর্ম্ম হইতে পথভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিব"। হিন্দুদের রামায়ণে রাবণকেও দশানন বা দশমুখবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করিয়া রাখিয়াছে। অতএব দশদিক হইতে আক্রমণকারী শয়তান ও দশমুখবিশিষ্ট রাবণ যে, একই অর্থবোধক ইহা নিশ্চয় সত্য বলিয়া মনে হয়। আদম ও রাম এবং আদমের স্ত্রী ইভ্ বা হাবা ও রামের স্ত্রী সীতা ইঁহারা যে পরস্পর একই অর্থবোধক কিনা তাহা আপনারা ইঞ্জিল কিতাবে বর্ণিত, আদম ও ইভ নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণজনিত অপরাধে ঈশ্বর কর্ত্তৃক স্বর্গোদ্যান হইতে বিতাড়িত হইয়া মৃত্যুর অধীন

পৃথিবীতে আসিয়া, তাঁহারা উভয়ে যখন নানাস্থানে পর্য্যটন করেন তখনকার কোন কোন ঘটনার সামঞ্জস্য ভাব বিচার করিয়া দেখিলে অতি সহজেই তাহা বুঝিতে পারিবেন।

মুসলমানশাস্ত্রে বলে—"কথিত আছে আদুম ও হাবার মধ্যে প্রথমতঃ বিচ্ছেদ ঘটে এবং হজরত আদমকে সিংহল দ্বীপে (লঙ্কায়) এবং হাবাকে জেদ্দায় থাকিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত বিচ্ছেদ যাতনা ভোগ করিতে হয়।" এই ঘটনা হইতে সিংহল দ্বীপের বা লঙ্কার অদম গিড়ি (Adam's peak) ইসলামের একটি তীর্থস্থানরূপে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। আরবি ভাষায় জেদ্দাহ্ শব্দের অর্থ মাতামহী। জেদ্দা আরবের একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। মুসলমানশাস্ত্রে বলে যে, জগতে হজরত আদম পিতামহ ও হাবা মাতামহী বলিয়া আখ্যাত। বিচ্ছেদাবস্থায় হাবা এইস্থানে অবস্থিতি করেন, তথায় তাঁহার সমাধিও বর্ত্তমান আছে। এইজন্য এইস্থানকে জেদ্দাহ্ বা মাতামহীর স্থান বলা হয়।" হিন্দুশাস্ত্রও বলে, সীতা বাল্মিকির বন হইতে আসিয়া অযোধ্যায় মৃত্তিকাভ্যান্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। উপরোক্ত ঘটনা সকল হইতে অনুমান হইতেছে যে, হিন্দুর রামায়ণে বর্ণিত "অযোধ্যা" শব্দটী মুসলমানশাস্ত্রে "জেদ্দা" শব্দে পরিণত হইয়াছে। আর একটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য কথা এই যে, যেমন ভারতের "সিন্ধু" শব্দ হইতেই "হিন্দু" এবং "ইণ্ডু" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়, তদ্রূপ "সীতা" শব্দ হইতেও "হীবা, বা হাবা" এবং "ইভা, বা ইভ্" শব্দ উৎপন্ন হওয়া খুবই সম্ভবপর কথা এবং এইরূপে "রাম" শব্দ ও "আদাম" বা "আদম" শব্দে পরিণত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ যেমন মুসলমান, খৃষ্টীয়ান ও য়ীহুদী প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে বলে যে, হজরত আদম ও ইভ্ বা হাবা নিষিদ্ধবৃক্ষফল ভক্ষণ করাতেই অর্থাৎ কৃষিজাত খাদ্যবস্তু গ্রহণ করাতেই জগতে মৃত্যু আসিয়া

পৌঁছিয়াছে ; তদ্রূপ হিন্দুশাস্ত্র হইতেও বুঝা যায় যে, ত্রেতাযুগে খাদ্য ও পানীয়শক্তি সদৃশ সীতা ও রাম বনে গমন করিলে অর্থাৎ কৃষিজাত খাদ্যে পরিণত হইলে বা জগতে কৃষিজাত খাদ্যবস্তু প্রচলন হওয়াতেই তখন হইতে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কারণ হিন্দুশাস্ত্রে সত্যযুগের লোকদিগকে অমর বলিয়াই কথিত হয়। অতএব সর্ব্বতোভাবে রাম ও সীতার এবং আদম ও ইভ্ বা হাবার ঘটনাবলী একই ভাবাপন্ন বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। এই ঘটনা হইতে ইহাও স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, জগতে ধর্ম্মগ্রন্থের ভিতর হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। কারণ রামায়ণের ঘটনা সকল হিন্দুর ত্রেতাযুগের কার্য্য। এই ত্রেতা-যুগের পূর্ব্বেও হিন্দুধর্ম্মে সত্যযুগ প্রচলিত ছিল বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত রহিয়াছে। এস্থলে আমি বাঙ্গলার পৃথিবীর ইতিহাস লেখক ৺দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের প্রণীত পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম খণ্ডে, ভারতের হিন্দুধর্ম্মের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বর্ত্তমান যুগের পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি,—"জার্ম্মানীর প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পরিব্রাজক কাউণ্ট জোর্ণস্ জারণা—পাশ্চাত্য জগতে যাঁহার পাণ্ডিত্য—খ্যাতির অবধি নাই,—তিনি পুনঃপুনঃ বলিয়া গিয়াছেন, "ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ও সভ্যতার প্রাচীনত্বে পৃথিবীর কোনও জাতিই সমকক্ষতালাভে সমর্থ নহে।" আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ "ইয়েল কলেজের" প্রেসিডেণ্ট ষ্টাইলস্, হিন্দুদিগের রচনাবলির প্রাচীনত্বের বিষয় আলোচনা করিয়া, বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া, সার উইলিয়ম জোন্‌সকে অনুরোধ করিয়াছিলেন,—"আমাদের ইতিহাসমূলক আদিপুস্তকও, বোধ হয়, হিন্দুদিগের নিকট অনুসন্ধান করিলে পাওয়া যাইতে পারে।" খৃষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থের মতে ঈশ্বর মনুষ্য সৃষ্টির প্রারম্ভেই আদম ও ইভ্‌কে (হাবাকে) সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কিন্তু ডাক্তার ষ্টাইলস্, সেই আদম ও ইভের

বৃত্তান্ত কথা হিন্দুজাতির নিকট সন্ধান লইবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। তবেই বুঝুন, ভারতীয় হিন্দুজাতির প্রাচীনত্ব বিষয়ে তাঁহাদের মনে কি ধারণাই উদিত হইয়াছিল? হিন্দুজাতির যুগ চতুষ্টয়ের বিষয় আলোচনা করিতে করিতে, সসম্মানে মস্তক অবনত করিয়া, মিঃ হ্যালহেড্ বলিয়াছেন,—"সে তুলনায় বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বকে কল্যকার ঘটনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।" প্রসিদ্ধ ফরাসী জ্যোতির্ব্বিদ মুসে বেলির মতে—"খৃষ্ট জন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ জ্যামিতি ও জ্যোতি-বিদ্যায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল।" একটি জাতি কতদূর উন্নত হইলে, এতাদৃশ বিদ্যায় পারদর্শী হইতে পারে, তাহা স্মরণ করিয়াও হিন্দুজাতির প্রাচীনত্ব বিষয়ে অধুনা বহু পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মস্তক বিঘূর্ণিত হইতেছে।" এখন আপনারা চিন্তা করিয়া দেখুন যে, হিন্দুর ত্রেতাযুগের রামায়ণে বর্ণিত রাম ও সীতার ঘটনা সকল যদি খৃষ্টীয়ধর্ম্মগ্রন্থে বর্ণিত জগতের আদি মানব আদম ও ইভের ঘটনা সকল একভাবাপন্ন হয়, তাহাহইলে, আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ 'ইয়েল কলেজের' প্রেসিডেন্ট ষ্টাইলস, সার উইলিয়ম জোন্সকে যে, আদম ও ইভের বিষয় হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থের ভিতর অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাহা হিন্দুর ত্রেতাযুগের রামায়ণে বর্ণিত রাম ও সীতার জীবনচরিতরূপে পাওয়া যাইতেছে কিনা? সে যাহাইহউক হিন্দুধর্ম্মের যুগবিভাগ সম্বন্ধে হিন্দুদিগের ভিতরেও কেহ কেহ বলেন যে, দ্বাপর যুগের পূর্ব্বে ত্রেতাযুগ কি করিয়া আসিল? কিন্তু তাঁহারা যুগ বিভাগ সম্বন্ধে যে অর্থ করেন, যুগপরিবর্ত্তন সেইভাবে হয় নাই। হিন্দুর যুগ বিভাগ শুধু গোদুগ্ধের উপর জগতের খাদ্য বস্তু নির্ভর করিয়াই হইয়াছে। ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, সত্যযুগে হরি অর্থাৎ শুধু গোদুগ্ধই মানবের খাদ্য ছিল। তাই হিন্দুশাস্ত্রে বলে যে, সত্যযুগে চারিপোয়া বা ষোলআনা ধর্ম্মই প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই চারিপোয়া

ধর্ম্মার্থে শুধু গোদুগ্ধরূপ খাদ্যকেই বুঝাইতেছে। তাই সত্যযুগের লোক অমর ছিলেন। তারপর ত্রেতায় অর্থাৎ তিনপোয়া ধর্ম্ম অর্থে তিনভাগ গোদুগ্ধ ও একপোয়া বা একভাগ কৃষিজাত খাদ্যবস্তুরূপ অধর্ম্ম আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতেই একপোয়া ধর্ম্ম নষ্ট হইল। এবং তখন হইতেই মানুষ মৃত্যুর অধীন হইল। এখন এস্থলে আপনারা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, ইঞ্জিল কিতাবের আদি মানব আদম ও ইভ্ বা হাবা এবং হিন্দুর ত্রেতাযুগের অবতার রাম ও সীতা পরস্পর একই অর্থমূলক কিনা? এইরূপে দ্বাপরে দুইপোয়া বা দুইভাগ গোদুগ্ধ ও দুইভাগ কৃষিজাত শস্যকণা খাদ্যরূপে চলিয়াছিল। এবং কলিতে একপোয়া বা একভাগ মাত্র গোদুগ্ধ এবং তিনপোয়া বা তিনভাগ কৃষিজাত খাদ্য বস্তুরূপ অধর্ম্ম চলিতে লাগিল। এই কারণ বশতঃই হিন্দুশাস্ত্রে বলে যে, কলিতে শুধু একপোয়া ধর্ম্ম বর্ত্তমান। হিন্দুদের কলির আগমন স্বরূপ মূর্ত্তিতে বা ছবিতে ইহা বেশ হৃদঙ্গম হয়। কারণ উহাতে দেখা যায়, কলিরাজ অশ্বরোহনে রহিয়াছেন এবং শুধু একপদ বিশিষ্ট একটি গাভী-মূর্ত্তি নানাভাবে উৎপিড়িত অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। কলির আগমনের পর ক্রমান্বয়ে যতই কলি শেষ হইয়া আসিতে লাগিল ততই মানুষ ধর্ম্মহীন হইতে লাগিল অর্থাৎ গোদুগ্ধ প্রায় একবারে পরিত্যাগ করিয়া অনাসক্ত বা বিষদ্বারা আক্রান্ত কৃষিজাত খাদ্যবস্তু ও জীব জন্তুর মাংস প্রভৃতি খাদ্যরূপে গ্রহণ করিতে লাগিল। এইজন্যই কলির শেষে মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, চুরি ডাকাতিও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং জগতে অকালমৃত্যুর সংখ্যাও ক্রমাগত দিন দিনই বাড়িতে লাগিল। কলির শেষে এইরূপ ঘটিলে অর্থাৎ গোদুগ্ধ সেবন একেবারে জগত হইতে উঠিয়া যাওয়ার উপক্রম হইলে, বাঙ্গলার শ্রীগৌরাঙ্গদেব মুমূর্ষু কলির জীব উদ্ধারের জন্য প্রথমতঃ ঐ গোদুগ্ধরূপ হরিনামে মানুষের রুচিবর্দ্ধন করিবার জন্যই তিনি আচণ্ডালে কোল দিয়া হরিনাম প্রচার করিয়াছিলেন। যেহেতু নাম এবং নামী অভেদ।

নামে রুচি হইলেই নামীকে অন্বেষণ করিতে লোকের ইচ্ছা হয়। যদিও জগতের প্রায় প্রত্যেক লোকই গোত্নগ্ধ সেবনের উপকারিতা অনুভব করিয়া থাকে বটে তথাপি গোত্নগ্ধের প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা মানুষ যে, অমরত্ব লাভ করিতে সক্ষম হয়, তাহা বোধ হয় জগতের অনেকেই অবগত নহে। শ্রীগৌরাঙ্গ পুষ্পবন্ত যুগের পূর্ব্বাভাসে হরিনাম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এবার জগতে প্রকৃতপ্রস্তাবে পুষ্পবন্ত যুগের বা মুসলমান খৃষ্টীয়ান ও য়ীহুদী প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থে বর্ণিত পুনরুত্থানের সময় আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছে। অতএব এবার হরিশক্তিরূপ বস্তুতত্ত্ব বা হরিনামরূপ গোত্নগ্ধের প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা উৎপন্ন বস্তু সেবন বিধি জগতের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রচারিত হইবার সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাই বোধ হয় আজকাল তুই একবৎসর যাবৎ ভারতে একনূতন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ আজকাল অনেকস্থলে বিশেষতঃ পল্লীগ্রাম সমূহে গোত্নগ্ধ পূর্ব্বাপেক্ষা অতি সুলভে মূল্যে পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে ভারতের অনেক স্থানের অনেক গরিব তুখীঃরাও কখনও কখনও গোত্নগ্ধ সেবন করিতে সক্ষম হইতেছে। ইহা যে ভারতের পক্ষে অত্যন্ত শুভজনক ঘটনা সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। হিন্দুর পুষ্পবন্তযুগ এবং মুসলমানশাস্ত্রে বর্ণিত কেয়ামত ও খৃষ্টীয়ান, য়ীহুদী প্রভৃতি শাস্ত্রে বর্ণিত পুনরুত্থান যে, একই অর্থমূলক, ইহা আমি পরে আপনাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। অতএব মুসলমান-শাস্ত্রে বর্ণিত কেয়ামত ও খৃষ্টীয়ান, য়ীহুদী প্রভৃতির পুনরুত্থানের সময় যে, জগতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহাও সুনিশ্চিত। সে যাহা হউক এখন আপনাদিগকে রামও সীতা সম্বন্ধে আরও কিছু জানাইতেছি। সীতার জমজ সন্তান অর্থাৎ খাদ্য স্বরূপ যবের ভিতর যে, প্রায় দ্বিখণ্ডিত চাউল দৃষ্ট হয়, উহাই লব এবং কুশ রূপকে যে, আবৃত হইয়া রহিয়াছে ইহা পূর্ব্বেও একবার বলিয়াছি। ঐ যবস্থ তণ্ডুলকণাকে জলে ভিজাইলে কিম্বা অগ্নিদ্বারা

জলে সিদ্ধ করিলে উহা জলস্বরূপ রামকে শুষিয়া লয়। ইহাই রামায়ণে বর্ণিত পিতা পুত্রের যুদ্ধ।

যখন রাবণকে হত্যা করিয়া সীতাকে উদ্ধার করা হইয়াছিল, তখন ঐস্থানে আবার কৃষিজাত খাদ্যবস্তুসমসীতা অনাসক্ত তাড়িতের আক্রমণ বা বিঁষ হইতে মুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ চন্দ্রশক্তিতে অর্থাৎ গোদুগ্ধস্থ খাদ্যে পরিণত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে সীতার অগ্নি পরীক্ষা হইয়াছিল। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, গোদুগ্ধস্থ খাদ্যস্বরূপ মাখনকে অগ্নিতে জ্বালাইলে উহা ঘৃতে পরিণত হয়। কিন্তু উহাতে মাখনের কোন প্রকার সত্ত্বা বা সতীত্ব নষ্ট হয় না। ইহাই সীতার অগ্নি পরীক্ষা রূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। লক্ষণ রামের সহিত বনে গমন করিয়া ছিলেন। এস্থলে ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কৃষিজাত খাদ্যের ভিতর রসময় ইক্ষু দণ্ডকেই লক্ষণরূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। ইক্ষুদণ্ডে কোন প্রকার ফুল ও ফল ধারণ করে না। এই জন্যই রামায়ণে বলা হইয়াছে যে, লক্ষণ বনে গমন করিয়া কোন স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন করেন নাই। এবং অন্যার্থে লক্ষণ শক্তিস্বরূপ ছাগলকে খাঁসি করিলেও এই ভাবার্থ প্রকাশ পায়। তাই বোধ হয় রামায়ণে বাল্মিকিমুণি লক্ষণের বনে গমনের পর হইতে তাঁহার স্ত্রী উর্ম্মিলা সম্বন্ধে আর কোনও বিশেষ কিছু আলোচনা করেন নাই বা করিবার আবশ্যকও হয় নাই। রামায়ণে বলিতেছে, রাম লক্ষণ ইক্ষাকু বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ইক্ষাকু শব্দ হইতে বোধ হয় আকের নাম ইক্ষু হইয়াছে। যেমন রামকে গোদুগ্ধরূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে, তদ্রূপ লক্ষণকেও ছাগদুগ্ধস্বরূপ বলিয়া বর্ণণা করিয়া রাখা হইয়াছে। এই লক্ষণশক্তিরূপ ছাগদুগ্ধ রামশক্তিরূপ গোদুগ্ধ অপেক্ষা অধিক তেজস্কর বটে। কিন্তু উহাতে শক্তিশেলরূপ মৃত্যু ভয় রহিয়াছে। অর্থাৎ ছাগদুগ্ধেও কিছু না কিছু বিষ বা অনাসক্ত তাড়িৎ বর্ত্তমাম রহিয়াছে। কিন্তু ঐ শক্তিশেলের বিষ

গন্ধমাদন পর্ব্বতস্থ বিশল্যকরনীতে নষ্ট করিতে সক্ষম হয়। এইস্থলে গন্ধমাদন পর্ব্বতস্থ বিশল্যকরণী শব্দের ভাবার্থ এই যে, পৃথিবীরই গন্ধগুন বর্ত্তমান আছে এবং এই পৃথিবীজাত খাদ্য অর্থাৎ কৃষিজাত শস্যকণার বিষকে মাদন অর্থাৎ মর্দ্দন বা নষ্ট করে যে, তাহাকেই গন্ধমাদনপর্ব্বত বলে। গোদুগ্ধই কৃষিজাত ভক্ষবস্তুর বিষকে নষ্ট করিতে সক্ষম হয়। অতএব গোমাতাই গন্ধমাদন পর্ব্বত সদৃশ। এবং তাহার দুগ্ধই গন্ধমাদন পর্ব্বতস্থ বিশল্যকরণী সদৃশ।

হিন্দু আর্য্যমুনি ঋষিগণ, কোন দুগ্ধবতী প্রাণীর কোন দুগ্ধ কি প্রকার তাহার নিগূঢ়তত্ত্ব বৈজ্ঞানিকভাবে বিচার করিয়া রামায়ণে ও মহাভারতে উহা মানুষরূপকে আবৃত করিয়া, যাহার যেরূপ শক্তি ও ভাব, তাহা বর্ণনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু উহার গূঢ় রহস্য ভেদ করা শ্রীগুরুর কৃপায় ভিন্ন মানববুদ্ধির অগোচর। শুধু ছাগদুগ্ধ ভক্ষণ করিলেও মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কিন্তু গোদুগ্ধে, ছাগদুগ্ধ ভক্ষণজনিত বিষকে যে, নষ্ট করে ইহাই রামায়ণে লক্ষণের শক্তিশেলরূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। রামায়ণে অন্যদিকে রাবণকে ঘোড়া, বিভীষণকে হাতী, কুম্ভকর্ণকে গর্দ্দভ ও ইন্দ্রজিতকে উষ্ট্রশক্তি সদৃশ রূপকে বর্ণনা করিয়া রাখিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে বলে, সমুদ্র মন্থনকালে শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট উচ্চৈঃশ্রবা নামক একটি ঘোড়া উত্থিত হইয়াছিল। রাবণের পিতার নাম রামায়ণে, বিশ্বৈঃশ্রবা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, রাবণ ঘোড়াশক্তি। লক্ষ্মণ রাবণের ভগিনী সূর্পণখার নাসিকা ছেদন করিয়া দিয়াছিলেন। সূর্পণখা অর্থে সূর্প অর্থাৎ কুলার ন্যায় নখ যাহার। স্ত্রী ও পুরুষজাতীয় ঘোড়ার পায়ের ক্ষুর বা নখ সূর্প সদৃশই দৃষ্ট হইয়া থাকে যথা—U (সূর্প)। সচরাচর ঘোড়ার নাসিকার অগ্রভাগ কর্ত্তিত অবস্থাই দৃষ্ট হয়। অতএব সূর্পণখা স্ত্রীজাতীয় ঘোড়া ও রাবণ পুরুষজাতীয় ঘোড়া বলিয়াই বিবেচিত হয়। বিশেষতঃ

সীতাশক্তিসদৃশ যব বা পায়রার শীষ্ সুপক্ক হইলে, ঘোড়া ভিন্ন অন্য কোন পশু সহজে উহা ভক্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। সুপক্ক যব বা পায়রার শস্যক্ষেত্রে ঘোড়া প্রবেশ করিয়া অবাধে তাহা খাইয়া নির্ম্মূল করিতে সক্ষম হয়। তাই বাঙ্গলায় একটি কথার প্রবাদ আছে যে, "মরা ঘোড়া (কৃশ বা দুর্ব্বল) যব বা পায়রা খাবার যম" ইহা হইতেও রাবণকে ঘোড়াশক্তি বলিয়াই মনে হয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি ইঞ্জিল কিতাবে বর্ণিত শয়তান বা ইবলিস্ ও রামায়ণের রাবণ একই অর্থ বোধক। তাহা হইলে শয়তান বা ইবলিস্‌কেও ঘোড়াশক্তি বলিয়াই মনে হয়। মুসলমানের শাস্ত্রে প্রধাণতঃ পাঁচটী ফেরেস্তা বা স্বর্গ দূতের উল্লেখ আছে। যথা জিব্রাইল, মেকাইল, এস্রাফিল (এস্রাইল), আজ্রাইল ও আজাজিল। ইহার আলঙ্কারিক ভাবার্থ এই যে, গোশক্তি জিব্রাইল, ছাগলশক্তি মেকাইল, মেষশক্তি এস্রাফিল (এস্রাইল), মহিষ বা উটশক্তি আজ্রাইল এবং ঘোড়াশক্তি আজাজিল বা ইব্‌লিস্ অর্থাৎ শয়তান নামে অভিহিত। এবং যেমন হিন্দুশাস্ত্রে মহিষকে যমের বাহন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছে তদ্রূপ মুসলমানশাস্ত্রেও বলে মহিষ বা উষ্ট্রশক্তি সদৃশ আজ্রাইলও মানুষের "জান কবজ" অর্থাৎ জীবন হরণ করে। ইঞ্জিল কিতাবে বর্ণিত আছে যে, ঈশ্বর আদমকে সৃষ্টি করিয়া ফেরেস্তাগণের নিকট উপস্থিত করিলেন এবং ফেরস্তাগণকে আদেশ করিলেন যে, তোমরা আমার প্রিয় আদমকে সেজ্‌দা কর (মান্যকর)। ইব্‌লিস ব্যতীত আর সকল ফেরেস্তাই আদমকে অর্থাৎ মানবকে সেজ্‌দা করিল। এই সেজ্‌দা করার ভাবার্থে ইহাই প্রকাশ পায় যে, গো, মেষ, ছাগল, মহিষ ও উট প্রভৃতি দুগ্ধবতী প্রাণিগণ তাহাদের দুগ্ধ মানবের প্রধান উপাদেয় খাদ্যবস্তুরূপে প্রদান করিল, কিন্তু ইব্‌লিস বা ঘোড়া তাহার দুগ্ধ মানবকে প্রদান করিল না অথবা অন্যার্থে ঘোড়ার দুগ্ধ মানবের অস্বাস্থ্যকর, এই ভাবার্থে ইব্‌লিস বা ঘোড়া আদমকে সেজ্‌দা করিল না।

বিশেষতঃ ঘোড়ার দুগ্ধে যে, অনাসক্ত তাড়িৎ বা বিষ যে, বিশেষভাবে অধিক পরিমাণ বর্ত্তমান আছে, তাহার প্রমাণ এই যে, আরবের কিরঘীজজাতি (বেছুইনরা) ঘোড়ার দুগ্ধ হইতে কিমা বাহির করিয়া তাহা হইতে এক প্রকার তিব্র মদ্য প্রস্তুত করিয়া পান করিয়া থাকে। মুসলমান শাস্ত্রে ইব্‌লিস বা শয়তানকে জ্বেনজাতীয় বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং ঘোড়াকেও অনেকে জ্বেন পরী বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। বাঙ্গালা দেশের 'ঘোড়ার ডিম' বাক্যটি ও রাবনের "স্বর্গের সিঁড়ি" নির্ম্মাণ একঐ অর্থবোধক বলিয়াই মনে হয়। এবং ইঞ্জিল কিতাবে বর্ণিত, শয়তান যে, আদমকে বলিয়াছিল, "হে আদম এই বৃক্ষফল ভক্ষন করিলে অবিনশ্বর রাজত্ব বা স্বর্গসুখ লাভ করিবে" এই বাক্যও ঐ ঘোড়ার ডিম ও রাবণের স্বর্গের সিঁড়ির ন্যায় একই অর্থবোধক বলিয়াই মনে হয়। ঐ সকল কথা হইতে স্পষ্টতই বুঝা যায় রাবণ ঘোড়া-শক্তি সদৃশ। এবং জগতের অনাসক্ত তাড়িৎ বা বিষযুক্ত খাদ্যবস্তু মাত্রই শয়তান বা অশ্বশক্তি সদৃশ। তাই কোর্-আনে বলিতেছে যে, "হে মানবগণ, পৃথিবীতে যাহা স্বাস্থ্যকর এবং পবিত্র তাহা ভক্ষণ কর, শয়তানের পদানুসরণ করিওনা।" অতএব পৃথিবী জাত খাদ্যবস্তুমাত্রই অশ্বশক্তি সদৃশ। রামের "অশ্বমেধ যজ্ঞ" অর্থে জগতে কৃষিজাত খাদ্যবস্তু প্রচলন হওয়াই রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। এইরূপে হিন্দুর সত্যযুগের "গোমেধ যজ্ঞ"ও গোদুগ্ধ সেবনের সহিত রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে এবং রাজা যজাতির "নরমেধযজ্ঞ"ও যে, সুরা বা মদ্য পানের সহিত রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে তাহা আমি পরে হিন্দুর তন্ত্রশাস্ত্র ব্যাখ্যার সময় দেখাইতে চেষ্টা করিব। আর একটি কথা এই যে, রামায়ণে বলে,—ছাগশক্তি সদৃশ লক্ষণ উষ্ট্রশক্তি সদৃশ ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলা যজ্ঞের কলসী ভাঙ্গিয়া দিয়া যজ্ঞ অসম্পূর্ণ করিয়া ইন্দ্রজিতকে বধ করিয়া ছিলেন। আপনারা হয়তো অনেকে অবগত আছেন যে, উষ্ট্র একদিন প্রচুর পরিমাণে

জল পান করিয়া জলশূন্য মরুভূমিতে এক সপ্তাহ কিম্বা দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত আর জলপান না করিয়া রীতিমত কাজকর্ম্ম করিতে সক্ষম হয়। তারপরে যে সময়ে জলপানের আবশ্যক হয় অর্থাৎ উষ্ট্রশক্তি সদৃশ ইন্দ্রজিত যে সময় জলপানরূপ নিকুম্ভিলার যজ্ঞ করে, সেই সময় যদি তাহার পানীয় জলের কলসী কেহ ভাঙ্গিয়া ফেলে অর্থাৎ উষ্ট্র জলপান করিতে না পারে তবে তখন তাহার মৃত্যু সুনিশ্চিত। ইহাই ছাগশক্তি সদৃশ লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক উষ্ট্রশক্তি সদৃশ ইন্দ্রজিতের নিকুম্ভিলাযজ্ঞ নষ্ট করার ভাব রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে।

গো মেষ প্রভৃতি দুগ্ধবতী প্রাণিগণের খাদ্য স্বরূপ কুশ প্রভৃতি তৃণাদি, যাহা হইতে ঐ সকল প্রাণিগণের দুগ্ধ উৎপন্ন হয়, তাহাতে যে, অমৃত বিদ্যমান আছে; এবং হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত সমুদ্র মন্থন হইতে উত্থিত উচ্চৈঃশ্রবাই (শ্বেতবর্ণ অশ্ব) যে, কৃষ্ণবর্ণ বা অনাসক্ত তাড়িৎ অর্থাৎ বিষদ্বারা কিরূপে আক্রান্ত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে বর্ণিত কদ্রু ও বিনতার উপখ্যান এবং হিন্দুর সমুদ্র মন্থনের ঘটনা সকল সম্বন্ধে আপনাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এবং ঐ উচ্চৈঃশ্রবা বা শ্বেতবর্ণ অশ্বই যে, কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হইয়া ইঞ্জিল কিতাবে বর্ণিত শয়তান বা ডেভিল ও হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত রাবণ শক্তিতে পরিণত হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে সকলের অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে বলিয়া আমি আশা করি। হিন্দুশাস্ত্রে বলে,—"পূর্ব্বকালে দক্ষরাজার দুইকন্যা ছিল। কশ্যপ ঐ দুই কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের একজনের নাম কদ্রু ও অপর জনের নাম বিনতা। উভয়েই সাতিশয় পতিপরায়ণা ছিলেন। একদিন মহর্ষি কশ্যপ সন্তুষ্ট হইয়া উভয়কে বর প্রার্থনা করিতে বলায় প্রথমে কদ্রু যোড়করে কহিলেন "নাথ! আমি যেন সহস্র নাগের জননী হই।" অতঃপর বিনতা কহিলেন, "আমার যেন দুইটী পুত্র হয় ও তাহারা কদ্রু পুত্রাপেক্ষা যেন বলবান্ হয়।" তখন মহর্ষি কশ্যপ, উভয়কে বর প্রদানান্তর

বনপ্রদেশে গমন করিলেন। কিছুদিন পরে কদ্রু ও বিনতা উভয়েই গর্ভবতী হইলেন। পরে কদ্রু সহস্র ডিম্ব ও বিনতা দুইটি মাত্র ডিম্ব প্রসব করিলেন। কালক্রমে কদ্রু সহস্র নন্দনের জননী হইলেন; কিন্তু বিনতার এপর্য্যন্ত কিছুই না হওয়ায় ঈর্ষ্যা পরবশ হইয়া দুইটি ডিম্বের একটি ডিম্ব ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তন্মধ্য হইতে রক্তবর্ণ একটি অর্দ্ধকায় সন্তান বহির্গত হইয়াই ক্রোধে জননীকে কহিতে লাগিল, "তুমি যেমন, ভগিনীর প্রতি ঈর্ষ্যা পরবশ হইয়া অকালে ডিম্ব নষ্ট করিয়া, আমার অপূর্ণ দেহ করিলে সেই অপরাধে তোমায় উহার দাসী হইয়া থাকিতে হইবে। অতঃপর তুমি যদি দ্বিতীয় ডিম্ব সযত্নে রক্ষাকর তবে সহস্র বৎসরান্তে উহা হইতে এক মহাবীর জন্মগ্রহণ করিয়া, তোমার দাসীত্ব মোচন করিবে।" বিনতার ঐ পুত্রের নাম অরুন। ইনি সূর্য্যের সারথিত্বে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পুরাকালে দেবাসুরে মিলিত হইয়া অমৃতলাভ প্রত্যাশায় সমুদ্র মন্থন করেন। তাহাতে চন্দ্র, ঐরাবত কৌস্তুভমণি, উচ্চৈঃশ্রবা, লক্ষ্মী, সুরা ও ঘৃতাদি এবং পরিশেষে ধন্বন্তরি অমৃতকলসসহ উদ্ভূত হন। দেবাসুরগণ লোভপরতন্ত্র হইয়া দ্বিতীয়বার মন্থনের চেষ্টা করিলে কালকূট হলাহল উৎপন্ন হইয়া ত্রিভুবন দগ্ধ করিতে লাগিল। তখন দেবগণের অনুরোধে দেবাদিদেব মহাদেব সেই বিষ পান করিয়া লোকরক্ষা করেন ও স্বয়ং নীলকণ্ঠ নামে অভিহিত হন।

একদা রুদ্র ও বিনতা সাগরোদ্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব দেখিতে যাইবার মনস্থ করিল। ঐ অশ্ব স্বর্ণবর্ণের ছিল। কিন্তু কদ্রু ভ্রমবশতঃ ঐ অশ্বকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া উল্লেখ করায়, বিনতার সহিত এই পণ স্থির হইল যে, আমাদিগের মধ্যে, যাহার বাক্য মিথ্যা হইবে, সে অপরের দাসীত্বে নিযুক্ত হইবে। অতঃপর কদ্রু যখন জানিতে পারিল যে, অশ্ব প্রকৃতই শ্বেতবর্ণ তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া আপন পুত্রগণকে ডাকিয়া কহিল, "দেখ, আমি বিনতার

সহিত সাগরসম্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা দেখিতে যাইব, তোমরা পূর্ব্বাহ্নে গমন করিয়া সকলে মিলিয়া তাহার পুচ্ছদেশ বেষ্টন করিয়া শ্বেতবর্ণকে ঢাকিয়া কৃষ্ণবর্ণে পরিণত করিবে।” প্রথমে কদ্রুপুত্রগণ জননীর এই কুটিলতায় অনুমোদন করিল না। তাহাতে কদ্রু ক্রোধভরে তাহাদিগকে বলিলেন, “তোমরা রাজা জন্মজয়ের ভাবী সর্পযজ্ঞে দগ্ধ হইবে।” এই অভিসম্পাতে নাগগণ ভীত হইয়া জননীর অভিমত কার্য্য করায়, বিনতা কৃত্রিম পণে পরাস্ত হইয়া, কদ্রুর দাসীরূপে নিযুক্ত হইলেন। কিয়ৎকালানন্তর বিনতার অপর ডিম্ব হইতে মহাবীর দিবাকরের ন্যায় তেজঃপুঞ্জকলেবর গরুড় জন্মগ্রহণ করিয়া, জননীকে দাসীত্বে নিযুক্ত থাকিতে দেখিয়া কদ্রু-সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক তন্মোচনের প্রার্থনা করিল। কদ্রু শুনিয়া কহিল, “যদি তুমি স্বর্গ হইতে অমৃত আহরণ করিয়া আমার পুত্রগণকে পান করাইতে পার, তাহাহইলে তোমার জননী মুক্ত হইতে পারে।” এই কথা শুনিয়া গরুড় অমৃত আহরণার্থে স্বর্গে গমন করিল এবং ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া, তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিল। দেবগণ গরুড়ের অদ্ভুত কার্য্য-দর্শনে তাহার সহিত সন্ধি-সংস্থাপন করিলেন। পরে যাহাতে কদ্রুনন্দন নাগগণ অমৃতপানে বঞ্চিত থাকে, অথচ গরুড়ের জননীও মুক্ত হইতে পারেন, দেবগণ এই প্রকার ষড়যন্ত্র করিয়া সুধাভাণ্ডসহ মর্ত্ত্যে আসিয়া কুশোপরি ঐ অমৃতভাণ্ড স্থাপন করিলেন। পরে নাগগণ স্নানার্থে গমন করিলে পর, ইন্দ্র গোপনে ঐ সুধাভাণ্ড লইয়া প্রস্থান করেন। অনন্তর নাগগণ হতাশ হইয়া ঐ কুশসমূহ পরিলেহন করিতে লাগিল এবং তজ্জন্যই তাহাদের জিহ্বা দ্বিখণ্ডিত হইল। এই প্রকারে বিনতা, পুত্রকর্ত্তৃক মুক্ত হইল।” উপরোক্ত ঘটনা হইতে জানা যায় যে, দেবগণ স্বর্গ হইতে সুধার ভাণ্ড আনিয়া মর্ত্ত্যে অর্থাৎ এইপৃথিবীতে কুশোপরি স্থাপন করিলেন। তাহাহইলে গো, মেষ প্রভৃতি দুগ্ধবতী প্রাণিগণের প্রধান খাদ্যবস্তু

কুশরূপ তৃণ প্রভৃতিতে যে, অমৃত বিদ্যমান আছে এস্থলে তাহাই প্রকাশ করিতেছে। এবং কদ্রুর পুত্রগণ (সর্পগণ) জননীর উপদেশে কিরূপে সমুদ্র মন্থন হইতে উত্থিত উচ্চৈঃশ্রবাকে বিষদ্বারা আক্রমণ করিয়া উহাকে কৃষ্ণবর্ণে বা রাবণ (শয়তান) অর্থাৎ জগতের মৃত্যুশক্তিতে পরিণত করিয়াছিল, উপরোক্ত ঘটনায় তাহাও বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে কি না? তাহা আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন। এইরূপ বাইবেলেরও কোন কোন স্থলে এই কৃষ্ণবর্ণ অশ্বেরও শ্বেতবর্ণ অশ্বের বিবরণ দৃষ্ট হয়।

হিন্দুশাস্ত্রে যে, সমুদ্রমন্থনের কথা উল্লেখ আছে; ঐ সমুদ্র মন্থন করিলে পর, চন্দ্র এবং লক্ষ্মী তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া জানা যায়। সমুদ্র অনন্ত জল বা রসময় পদার্থ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। জল বা রসময় পদার্থ নারায়ণস্বরূপ বলিয়া উক্ত আছে। অতএব জল বা রসময় পদার্থস্বরূপ নারায়ণ হইতেই চন্দ্রের এবং লক্ষ্মীর যে, জন্ম হইয়াছে ইহা সত্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। তাহাহইলে লক্ষ্মীকে নারায়ণের কন্যা বলা যাইতে পারে। আবার হিন্দুশাস্ত্রে চন্দ্রকে পুরুষ অথবা একাধারে পুরুষপ্রকৃতির মিলন স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়া রাখিয়াছে। সমুদ্র মন্থনের ভাব হইতে বুঝা যায় যে, লক্ষ্মী চন্দ্রের সহোদরা ভগ্নী স্বরূপা। হিন্দুশাস্ত্রে লক্ষ্মীকে নারায়ণের স্ত্রী বলিয়াও কথিত হয়। এইজন্যই বোধ হয় বাঙ্গলার একটি গানে বলে,—"তুলনা কি দিব অন্যে, ব্রহ্মা হরেণ নিজ কন্যে।"

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, হিন্দুর সর্ব্বশক্তিমান নারায়ণ বা অনন্ত রসময়পদার্থ, একহিসাবে চন্দ্রের পিতা ও অন্যদিকে ভগ্নীপতি ও বটে। বাইবেলের যীশুকে পূর্ব্বেই দুগ্ধশক্তি বা চন্দ্রশক্তিস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। অতএব দুগ্ধ বা চন্দ্রশক্তিসদৃশ যীশু যে, হিন্দুর নারায়ণ সদৃশ ঈশ্বরের পুত্র, তাহা হিন্দুশাস্ত্রেও সমর্থন করিতেছে। হিন্দুশাস্ত্রে বলে সমুদ্র, মন্থনের পূর্ব্বে উহা দুগ্ধসমুদ্র সদৃশ ছিল।

তারপরে, উহা দধি সমুদ্রে পরিণত হইলে, উহাকে মন্থন করা হয়। এবং ঐ দধিসমুদ্র, মন্থিত হইলে পর, জগতের সর্ব্বব্যাধি নাশকারী ধন্বন্তরি, অমৃতের কলস মাথায় করিয়া উত্থিত হইয়াছিলেন। ইহা হইতেও প্রমানিত হয় যে, দুগ্ধস্থ মাখন বা ঘৃত মানুষকে অমরত্ব দান করিতে সমর্থ হয়। যেহেতু এস্থলে দধিস্থ মাখন বা ঘৃতকেই ধন্বন্তররি অমৃতের কলস নির্দ্দেশ করিতেছে। আবার হিন্দুশাস্ত্রে কথিত আছে, দধীচিমুনির অস্থি দ্বারা বজ্র নির্ম্মান করিয়া দেবতাগণ, বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন। এস্থলে দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত দধিকেই দধীচিমুনি, দধি হইতে উৎপন্ন মাখনকে দধীচির হাড় এবং জগতের অনাসক্ত তাড়িৎ বা মৃত্যুশক্তিকেই বৃত্রাসুররূপকে যে, আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বেও একবার বলিয়াছি।

হিন্দুশাস্ত্রে যে, বেহুলা ও লখিন্দরের উপাখ্যান বর্ত্তমান আছে, তাহাতে বলা হইয়াছে, লখিন্দর চাঁদসওদাগরের পুত্র। বাসরঘরে লখিন্দরকে সর্পে দংশন করিলে, তাহার স্ত্রী সতী বেহুলা, লখিন্দরের মৃতদেহ লইয়া ভেলায় জলের উপর ভাসিতে ভাসিতে দেবের নগর বা স্বর্গে কোন প্রকারে পৌঁছাইলে, দেবতাগণের কৃপায় তাহার মৃতস্বামী পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল। এস্থলে গোদুগ্ধস্থ খাদ্য ও পানীয়-শক্তিকে যথাক্রমে বেহুলা ও লখিন্দররূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। গোমাতার বাঁট হইতে খাদ্য ও পানীয়শক্তি স্বরূপ দুগ্ধ, নির্গত হওয়া মাত্র তাহাকে যে কোন স্থানে, বা যে কোন পাত্রেই রাখা হউক না কেন? উহা ভূগর্ভস্থ অনাসক্ত তাড়িতের সংস্পর্শে বিষদ্বারা আক্রান্ত হইয়া থাকে। এইহেতু সচরাচর কোন পাত্রে অধিকক্ষণ দুগ্ধ রাখিয়া দিলে উহাকে জমিয়া বা নষ্ট হইয়া যাইতে দেখা যায়। জগতের সমস্ত বস্তুই যে, সছিদ্র তাহার প্রমাণ এই যে, দুগ্ধশক্তি সদৃশ লখিন্দরকে লৌহ নির্ম্মিত ঘরে রাখিয়াও সর্পের দংশন হইতে বা অনাসক্ত তাড়িতে আক্রমন হইতে রক্ষা করিতে পারিয়াছিল না। এবং বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞানও বলে যে,

জগতের সমস্ত বস্তুই সছিদ্র। এস্থলে বেহুলার মৃতস্বামীসহ ভেলায় জলে ভাসার ভাবও দুগ্ধস্থ মাখন জলে ভাসার সহিত সামঞ্জস্য হইয়া রহিয়াছে এবং এস্থলে চন্দ্রশক্তিকে চাঁদসওদাগররূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। তাই গোদুগ্ধসদৃশ লখিন্দরকে চন্দ্রশক্তিসদৃশ চাঁদসওদাগরের পুত্র বলা হইয়াছে। এইরূপে জগতের প্রত্যেক ধর্ম্মগ্রন্থের যে কোন উপাখ্যানে মৃতব্যক্তির পুনরুত্থান দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা দেশ, কাল ও পাত্রভেদে নানাস্থানে নানা আলঙ্কারিকভাবে শুধু দুগ্ধের সহিতই যে, রূপকাবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে, ইহা ধ্রুবসত্য। নিম্নে আর কয়েকটি ঘটনার বিষয় আপনাদের অবগতির জন্য উল্লেখ করিতেছি,—হিন্দুশাস্ত্রে অনেক স্থলে বর্ণিত আছে, ব্রহ্মা তাঁহার কমণ্ডলু হইতে জল সিঞ্চন করিয়া মৃতকে জীবিত করিতেন। ব্রহ্মার কমণ্ডলুস্থ জল, গোমাতার পালানস্থ দুগ্ধের সহিত রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ গোদুগ্ধের প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা মৃত যে, জীবিত হইতে পারে এস্থলে তাহাই প্রকাশ করিতেছে। যেমন একই লৌহের প্রক্রিয়া বিশেষে লৌহ নির্ম্মিত ক্ষুদ্র ছুঁচের দ্বারা, যে কার্য্য অতি সহজে সুসম্পন্ন হয়, তাহা কিন্তু লৌহনির্ম্মিত বৃহৎ কুঠার দ্বারাও হওয়া সম্ভবপর নহে। তদ্রূপ গোদুগ্ধ, দধি, মাখন ও ঘৃতের ক্ষুদ্র প্রক্রিয়া বিশেষদ্বারা যে কার্য্য (এস্থলে মানুষের অমরত্ব) অতি সহজে সুসম্পন্ন হইতে পারে, তাহা কিন্তু গোদুগ্ধ দধি, মাখন ও ঘৃত প্রভৃতি শুধু সাধারণভাবে অতি মাত্রায় পান ভোজনের দ্বারা সম্পাদিত হয় না। হিন্দুশাস্ত্রে যে, সাবিত্রী, সত্যবান এবং রাজা হরিশ্চন্দ্রেব পুত্র রোহিতাশ্বর উপাখ্যান বিদ্যমান আছে, বিশেষরূপ বিচার করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, উহাও শুধু গোদুগ্ধ শক্তিরূপকেই আবৃত হইয়া রহিয়াছে। যেহেতু বান শব্দের অর্থে জল বা রসময় শক্তিকেই বুঝায়। অতএব এস্থলে সত্যবান অর্থে গোদুগ্ধকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। এবং সাবিত্রী বা গায়ত্রী অর্থে দুগ্ধস্থ মাখনকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। এইরূপে রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্বকেও

গোদুগ্ধ এবং রাজা হরিশ্চন্দ্রকে চন্দ্রশক্তি নির্দ্দেশ করিতেছে। এই দুই ঘটনা হইতেও বেশ হৃদয়ঙ্গম হয় যে, গোদুগ্ধের প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা মৃতকে জীবিত করা যায়। যেহেতু উপরোক্ত সত্যবান ও রোহিতাস্য উভয়কেই সর্পে দংশন করিয়াছিল এবং পরে উভয়েই পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিলেন।

রামায়ণে বলে যে, রাম বনে যাইয়া স্বর্গমৃগ দেখিয়া সীতার অনুরোধে উহাকে ধরিতে যান এবং কিছুকাল পর লক্ষ্মণও রামের অনুগামী হন। এই অবসরে সীতাকে একাকিনী পাইয়া রাবণ, সীতাকে হরণ করিয়া লঙ্কায় প্রস্থান করে। উপরোক্ত স্বর্ণমৃগের ঘটনা সম্বন্ধে হিন্দুদের ভিতরও কেহ কেহ বলেন যে, রাম পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ হইয়াও কি তিনি বুঝিতে পারিলেন না যে, সজীব মৃগ কখনও স্বর্ণের হইতে পারে না? এবং কেনইবা তাঁহার স্বর্ণমৃগ বলিয়া ভুল ধারণা হইয়াছিল? এস্থলে এই স্বর্ণমৃগের আলঙ্কারিক ভাবার্থ এই যে, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গো, মেষ, ছাগল ও মহিষ প্রভৃতি দুগ্ধবতী প্রাণিগণের দুগ্ধই প্রকৃত ব্রহ্মবস্তু এবং এই হিসাবেই হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত ব্রহ্ম বা ব্রহ্মাকে চতুরানন বলা হয়। আবার হিন্দুশাস্ত্রে ইহাও বলে যে, ব্রহ্মার পূর্ব্বে পাঁচ মুখই ছিল, পরে শিবের সহিত যুদ্ধে এক মুখ নষ্টপ্রাপ্ত হইয়াছে। ব্রহ্মার এই পাঁচ মুখ হইতেই হিন্দুর পঞ্চবেদ যথা—সাম, যজুঃ, ঋগ্, অথর্ব্ব ও গন্ধর্ব্ব বেদের উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রহ্মার যে মুখ নষ্টপ্রাপ্ত হইয়াছে, উহা হইতেই গন্ধর্ব্ব বেদের সৃষ্টি হইয়াছিল।

বর্ত্তমানে উহা ভারতে অজ্ঞাত রহিয়াছে এবং উহা শুধু গন্ধর্ব্বদেশেই প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান জগতের মেরু সন্নিহিত দেশ অর্থাৎ এস্কিমোদের দেশই গন্ধর্ব্বদেশ বলিয়া খ্যাত। ঐ এস্কিমো জাতি, বল্গাহরিণের দুগ্ধ পান করিয়া থাকে। এবং উহার দুগ্ধই তথায় ব্রহ্মবস্তু বা ব্রহ্মার পঞ্চম মুখরূপে বিদ্যমান

রহিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতে গো, মহিষ ও ছাগলদুগ্ধই প্রধাণতঃ মানবের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং এই ভাবার্থেই হিন্দুশাস্ত্রে বলে যে, ভারতে এখন শুধু সাম, যজুঃ ও ঋগ্‌ বেদই প্রচলিত আছে। অতএব এস্থলে গোদুগ্ধ সামবেদ, মহিষদুগ্ধ যজুর্ব্বেদ এবং ছাগলদুগ্ধ ঋগ্‌বেদ সদৃশ। এইরূপে মেষদুগ্ধ অথর্ব্ববেদ ও হরিণদুগ্ধ গন্ধর্ব্ববেদ সদৃশ। শেষোক্ত দুই বেদ অর্থাৎ অথর্ব্ববেদরূপ মেষদুগ্ধ ও গন্ধর্ব্ববেদরূপ হরিণদুগ্ধ বর্ত্তমান ভারতে মানবের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় না। এইজন্যই হিন্দুশাস্ত্রে বলে যে, বর্ত্তমান ভারতে সাম, যজুঃ ও ঋগ্‌বেদই প্রচলিত আছে কিন্তু অথর্ব্ববেদ ও গন্ধর্ব্ববেদের প্রচলন নাই। রামায়ণে বলে যে, রামের চরণস্পর্শে কাষ্ঠেরতরি সোনা হইয়াছিল। সেই হিসাবে দেখা যায় যে, গো, মেষ প্রভৃতির দুগ্ধের ন্যায় হরিণদুগ্ধও স্বর্ণসদৃশ হওয়া সম্ভবপর কথা। কিন্তু আর্য্য ঋষিগণ বহু গবেষণাদ্বারা স্থির করিয়া গিয়াছেন যে, হরিণদুগ্ধ ব্রহ্মার পঞ্চমমুখ সদৃশ হইলেও উহা প্রকৃত প্রস্তাবে স্বর্ণসদৃশ নহে। এইজন্যই ব্রহ্মার ঐ মুখ নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণনা করিয়া রাখিয়াছে। উপরোক্ত ভাব হইতেই প্রথমতঃ রাম বনে যাইয়া হরিণকেও স্বর্ণ সদৃশ মনে করিরাছিলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে হরিণদুগ্ধ বা হরিণ সদৃশ কাষ্ঠের তরি রামেরচরণস্পর্শে স্বর্ণ সদৃশ হইতে পারে নাই। ঐ স্বর্ণমৃগ মায়ায় বা মৃত্যুতে পরিপূর্ণ। অতএব রামায়ণে বর্ণিত রামের স্বর্ণরূপ মৃগ ভুল ধারণা হইবার ঘটনা উপরোক্ত ঘটনা সকলের ভাবের সহিত রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে।

আবার রামায়ণের একস্থলে বর্ণিত আছে যে, চণ্ডালবংশজাত বা নীচবংশজাত শম্বুক, ব্রহ্মশক্তি লাভ করাতে বশিষ্ঠের আদেশে রামচন্দ্র, তাহাকে হত্যা করিয়াছিলেন। এই ঘটনার আলঙ্কারিক ভাবার্থ এই যে, এস্থলে জলচর শামুক বা মৎস্য প্রভৃতিই

শম্বুকরূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। যদিও ভারতের কোন কোন স্থলের হিন্দুগণ শামুক বা মৎস্য প্রভৃতি জলচর প্রাণিগণের মাংস খাদ্যরূপে বা ব্রহ্মশক্তিরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন বটে, তথাপি উহাকে ভারতের আর্য্যজাতি কখনও খাদ্যশক্তিরূপ ব্রহ্মবস্তু বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। অদ্যাবধি ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ ঐ শামুক বা মৎস্য প্রভৃতি জলচর প্রাণিগণের মাংস আহার করেন না বা ব্রহ্মবস্তু বলিয়া স্বীকার করেন না। তথাকার নীচ বংশজাত চণ্ডাল প্রভৃতিরাই উহা খাদ্যরূপে বা ব্রহ্মবস্তুরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। অতএব রামায়ণে বর্ণিত নীচবংশজাত শম্বুক, ব্রহ্মশক্তি লাভ করিলেও বশিষ্ঠের আদেশে রামচন্দ্র যে, তাহাকে হত্যা বা নষ্ট করিয়াছিলেন, ইহা উপরোক্ত ঘটনা সকলের সহিত রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে।

অন্যদিকে মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ফল, মূল শস্যকণা প্রভৃতির ভিতর তাল রাবণশক্তি সদৃশ। তাল বৃক্ষের মস্তকে শিবের জটা সদৃশ, তাল জন্মিবার সময় জটা বাহির হয়। ঐ জটাস্থ কচি তালের ভিতর জল বা গঙ্গা বর্ত্তমান থাকে। তাই তালবৃক্ষ সদৃশ রাবণকে শিবভক্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তালবৃক্ষেও যে, বিষ বর্ত্তমান আছে তাহার প্রমাণ এই যে, ভারতীয় বৈদ্যগণ কোন উৎকট ব্যাধিগ্রস্থ রোগীকে চিকিৎসার অতীত অবস্থায় তালবৃক্ষের ডালার রসের সহিত বিষের ঔষধ সেবন করাইয়া থাকেন এবং সুপক্ক তাল ফলেও তিক্ত আস্বাদ বর্ত্তমান আছে। ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়গণ উপবিত গ্রহণ করার পর তালফল ভক্ষণ করেন না। এমন কি তাঁহারা তালগাছ স্পর্শ পর্য্যন্ত করেন না। হিন্দুশাস্ত্রে বিভীষণকে অমর বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। নারিকেলশক্তিই বিভীষণ সদৃশ। তাই রামভক্ত বিভীষণরূপ নারিকেলে, রসময় রাম বা জল পরিপূর্ণ অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। এইজন্যই পূর্ব্বেও একবার বলিয়াছি যে, সত্যযুগের

নারদ ও ত্রেতার বিভীষণ একই অর্থবোধক। খেজুরবৃক্ষশক্তি কুম্ভকর্ণ সদৃশ। কারণ খেজুর গাছের কর্ণে কুম্ভ অর্থাৎ কলস বাঁধিয়া তাহা হইতে রস নির্গত করা হয়। ঐ খেজুরগাছ হইতে সচরাচর বৎসরে একবার অর্থাৎ শীতকালেই তাহা হইতে রস নির্গত করা হইয়া থাকে। কিন্তু অসময়ে অর্থাৎ অন্য ঋতুতে রস নির্গত করিলে (তাহাকে জাগাইলে) কুম্ভকর্ণশক্তি সদৃশ খেজুরগাছ, মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সুপারীবৃক্ষ ইন্দ্রজিতশক্তি সদৃশ এবং পান বা তাম্বুলশক্তি সরমা সদৃশা। পান গাছেরলতা প্রধাণতঃ নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ আকাড়াইয়া ধরিয়া বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এইহেতু সরমা সদৃশা পানকে বিভীষণের স্ত্রীবলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

যখন সীতা, লঙ্কায় রাক্ষসগণে পরিবেষ্টিতা হইয়া অতি দুঃখে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় সরমাই তাঁহার প্রিয় সঙ্গিনী ছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সরমা সদৃশা পান বা তাম্বুল, সীতা সদৃশা ভক্ষ্যবস্তুর অতি আদরের জিনিষ, অর্থাৎ আহারের পর পানের লালা বা রস আমাদের ভক্ষ্যবস্তুকে সহজে পরিপাক করাইয়া থাকে। এইস্থলে মানবের পাকস্থলীকে লঙ্কা এবং পাকস্থলীস্থ অগ্নিকে রাবণের চিতারূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। তাই হিন্দুশাস্ত্রে বলে, রাবণের চিতা অদ্যাবধি অনবরত জ্বলিতেছে। মানুষের পাকস্থলীস্থ অগ্নিও দিবারাত্র জ্বলিতেছে। রাবণের মাতা নিকষা খয়ের ও রাবণের স্ত্রী, ময়দানবের কন্যা মন্দোদরী, চুনশক্তি সদৃশা। এস্থলে পাহাড়কে ময়দানবরূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। যেহেতু পাহাড়ের পাথর হইতেই চুন প্রস্তুত হয়। বিভীষণপুত্র তরণীসেনকে নারিকেলের শাঁস বা অন্য হিসাবে সুপারীরূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। ভারতবর্ষের পশ্চিম অঞ্চলে সুপারীর পরিবর্ত্তে শুক্‌নো নারিকেলের শাঁস দ্বারা পান খাওয়া এখনও কোন কোন

স্থলে বর্ত্তমানে দেখিতে পাওয়া যায়। রাবণ মন্দোদরীর সহযোগে বহু সন্তান উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, রাবণশক্তি সদৃশ বস্তু যা বিষ দ্বারা আক্রান্ত কৃষিজাত শস্যকণা উৎপন্ন করিতে হইলে, কৃষিকার্য্যে চূন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাররূপে ব্যবহৃত হয়। এইজন্যই আসামে যত চূন প্রস্তুত হয়, তাহার প্রায় অর্দ্ধেক অংশই চা বাগানে সাররূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আজকাল কিন্তু এই তথ্য জানিবার জন্য শিক্ষিত ভারতীয় যুবতী ও যুবকগণ ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে যাইয়া কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকেন। রাবণের মৃত্যুবান মন্দোদরীর নিকটে ছিল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কৃষিজাত ভক্ষ্যবস্তু ভক্ষণজনিত আমাদের দেহস্থ বিষ, চূন ঘটিত (Lime) ঔষধ সেবনে যে, নষ্টপ্রাপ্ত হয়, বর্ত্তমান যুগের ডাক্তারগণেরও এই অভিমত। আবার রাবণ সদৃশ তাল ফলের গোলা অর্থাৎ তালমারীর সহিত চূন মিশ্রিত হইলে উহা তৎক্ষণাৎ জমিয়া যায় বা তালগোলার ভিতরস্থ রসশক্তি নষ্ট হয় অর্থাৎ রাবণ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। বর্ত্তমান যুগের ডাক্তারগণ প্রত্যেক পূর্ণ বয়স্ক মানুষকে দৈনিক অন্ততঃপক্ষে দুইসের করিয়া জল পান করিতে বলিয়া থাকেন এবং তাঁহারা বলেন যে, এইরূপ জল পান করিলে, দেহস্থ বিষ প্রস্রাবরূপে বহির্গত হইয়া যায়। ইহা হইতেও আপনারা সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, রাম সদৃশ জল, কৃষিজাত ভক্ষ্যবস্তু ও জীবজন্তুর মাংস ভক্ষণজনিত মানব দেহস্থ বিষ সদৃশ রাবণকে বিনাশ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। হিন্দুশাস্ত্রে বলে যে, রাবনের চিতা এখনও সদা সর্ব্বদাই জ্বলিতেছে এবং দন্তকাষ্ঠ ঐ চিতার জ্বালানি কাষ্ঠরূপে সহায়তা করিয়া থাকে। এই সকল কথার তাৎপর্য্য এই যে, মানবের পাকস্থলীস্থ অগ্নিকেই রাবনের চিতারূপকে যে, আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে এবং মানবের পাকস্থলিস্থ অগ্নি দিবা রাত্রই জ্বলিতেছে, ইহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্ত পরিস্কার

পরিচ্ছন্ন রাখিলে, দন্ত বহুদিন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান থাকে। এবং তাহাতে সহসা কোন ব্যাধিও জন্মায় না এবং দন্ত ভাল থাকিলে তদ্দ্বারা চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষ্যবস্তু আহার করিলে উহা সহজেই পরিপাক হয় এবং স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। অতএব এই কার্য্যে অর্থাৎ দন্তকাষ্ঠদ্বারা দন্ত মার্জ্জনে পাকস্থলিস্থ অগ্নির কার্য্য বা রাবনের চিতা সদাসর্ব্বদা প্রজ্জ্বলিত হইবার সহায়তা করিয়া থাকে। বিভীষণ, রামের পক্ষ সমর্থন করিয়া রাবণ বধের সহায়তা করিয়াছিলেন। ইহার বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে, বিভীষণ সদৃশ নারিকেলের জল অর্থাৎ ডাবের জলপান করিলে রাবণ সদৃশ মানবের দেহস্থ বিষ প্রস্রাবরূপে অতিরিক্তভাবে দেহ হইতে বহির্গত হইয়া থাকে। এইজন্যই আজকাল ডাক্তার ও কবিরাজগণ, উৎকট ব্যাধিগ্রস্থ (অতিরিক্তভাবে অনাশক্ত তাড়িৎ বা রাবণ সদৃশ ভক্ষ্যবস্তুর বিষদ্বারা আক্রান্ত) রোগীগণের জন্য অধিকাংশস্থলেই শুধু ডাবের জলই পথ্য নিরুপণ করিয়া থাকেন। বিভীষণ সদৃশ নারিকেলের খোলদ্বারা হুকা নির্ম্মান করিবার সময় ঐ হুকার গায়ে চুণ মাখানো হইয়া থাকে। এই অর্থেই রাবণের স্ত্রী বা চূণ সদৃশা মন্দোদরী- বিভীষণের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াছিল বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। আজকাল অনেকে বলিয়া থাকেন যে, ভারতবর্ষে, মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্ব সময়ে, তামাক সেবন প্রথা বা হুঁকা কল্কির প্রথম প্রচলন হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত ভূল বলিয়াই মনে হয়। কারণ উপরোক্ত রামায়ণে বর্ণিত মন্দোদরীকে বিভীষণের অঙ্কলক্ষ্মী হওয়ার ভাব হইতে বেশ বুঝা যায় যে, ভারতবর্ষে, তামাক সেবন প্রথা বা হুকা কল্কির প্রচলন ত্রেতাযুগ হইতেই চলিয়া আসিতেছে।

রামায়ণে যে, সবরীর উপাখ্যান বিদ্যমান আছে; তাহাতে বলা হইয়াছে যে, নীচবংশজাতা সবরী, বনের ভিতর মুনির আশ্রমে থাকিয়া অতি যত্নসহকারে পীড়িতের সেবা শুশ্রূষা

করিত। এস্থলে সবরিআম বা পিয়াড়াকেই সবরীরূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। সবরিআম বা পিয়াড়া শুধু চর্ব্বণ করিলে পীড়িতের বা রোগীর মুখে রুচি বর্দ্ধিত হয়। কিন্তু উহা ভক্ষণ করিলে, উহার দানাতে রোগীর পেটের অসুখ বৃদ্ধি করে। শুধু চর্ব্বণে পীড়িতের মুখে রুচিবর্দ্ধনের ভাবার্থ হইতে সবরীকে শুশ্রূষাকারিণী এবং ভক্ষণে পীড়িতের পেটের অসুখ বৃদ্ধি করার ভাবার্থ হইতে তাহাকে নীচবংশজাতা বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অনেকেই বলেন—"রাম রহিম না জুদা কর" মুসলমান শাস্ত্রে আল্লাহুকেই রহমান ও রহিম বলা হয়। কিন্তু হিন্দুর রামের ন্যায় আল্লাহু কখনও মানুষরূপ ধারণ করেন না। অতএব আদি মানব হজরত আদমের সহিতই হিন্দুর রাম একভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছেন। ইঞ্জিল কিতাবে বর্ণিত এব্রাহিমের জীবনবৃত্তান্তও রামের সহিত প্রায় সকল স্থানে একভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয় না। যেহেতু রাম, তাঁহার স্ত্রী সীতাকে অগ্নি দ্বারা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু এব্রাহিম, রাজা নেমরুদ কর্ত্তৃক নিজেই অগ্নিদ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছিলেন। এস্থলে এব্রাহিম, দুগ্ধস্থ খাদ্যশক্তিরূপে বা মাখনশক্তিরূপে রূপকাবৃত হইয়া আছেন। রাম, পিতৃআজ্ঞা পালনের জন্য বনে গমন করিয়াছিলেন কিন্তু এব্রাহিম, পিতার সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায়, স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তবে ইব্রাহিমের মিশর যাত্রার সহিত রামের বনে গমনের ভাব কিছু সামঞ্জস্য আছে বলিয়া মনে হয়। যেমন রাম বনে গেলে পর রাবণ, সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল, তদ্রূপ এব্রাহিমও মিশরে পৌঁছিলে মিশর রাজ, তাঁহার অতি সুন্দরী ও সাধ্বী স্ত্রী সরার সতীত্ব নষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। এই মিশর রাজই কৃষিজাত খাদ্যরূপকে আবৃত হইয়া আছে। যেহেতু মিশর দেশের মধ্য দিয়া নীলনদ প্রবাহিত হওয়ায়, তথায় কৃষিজাত শস্যকণা প্রচুর

পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এইজন্যই ইঞ্জিল কিতাবে, বাইবেলে ও কোর-আনের অনেক স্থলে মিশর দেশ বা মিশরবাসী, কৃষিজাত খাদ্যবস্তুরূপে আলঙ্কারিকভাবে ব্যবহৃত হইয়া রহিয়াছে। আবার এইরূপে সাম দেশ বা সাম দেশবাসী অর্থেও গোদুগ্ধকে নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছে এবং এস্রাইল বা এস্রাফিল বংশকে দুগ্ধবতী প্রাণী বা মেষশক্তিরূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। এব্রহিম মিশর রাজ্যে যাইয়া মিশর রাজকন্যা হাজেরাকে লাভ করেন। (আবার কেহ কেহ হাজেরাকে মিশর রাজার দাসী বলিয়াও নির্দ্দেশ করেন।) এই হিসাবে দেখা যায় হাজেরা কৃষিজাত খাদ্যবস্তুরূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছেন অথবা অন্যার্থে এব্রহিমের প্রথমা স্ত্রী সরাকে মেষ দুগ্ধস্থ খাদ্যশক্তি ও তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রী হাজেরাকে ছাগদুগ্ধস্থ খাদ্যশক্তি বলা যাইতে পারে। যেহেতু সরার গর্ভজাত ইছাহাকের বংশ হইতেই মেষশক্তি সদৃশ ইস্রাইল বংশের উদ্ভব্ হইয়াছে। এবং এই ইস্রাইল বংশেই মেষদুগ্ধ শক্তি সদৃশ প্রভু যীশুখৃষ্টের জন্ম হইয়াছে। আর হাজেরার গর্ভজাত ইস্মাইলের বংশেই ছাগল বা বক্রী দুগ্ধশক্তি সদৃশ হজরৎ মোহাম্মদ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দুগণ বসন্ত কালের শেষভাগে বাসন্তী ও অন্নপূর্ণা পূজা করিয়া থাকেন। এই সময়ে ভারতে যাবতীয় রবিশস্য ও প্রধান খাদ্য যব, গোধূম সুপক্ক হয়। এস্থলে বাসন্তী ও অন্নপূর্ণা পূজা ঐ সকল খাদ্যবস্তুরূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু রাম বনে গমন করিয়া অকালে বোধন করিয়া দশভূজা বা দূর্গাপূজা করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা দেশেই বহুল পরিমাণে অর্থাৎ প্রায় ঘরে ঘরেই আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে দুর্থাপূজা প্রচলিত হইয়া রহিয়াছে। বাঙ্গলার দশভুজারূপ অন্নপূর্ণা বা জগধাত্রী রূপিণী প্রধান খাদ্যবস্তুরূপ ধান্য, এই সময় হইতেই পাকিতে আরম্ভ হয়, অর্থাৎ আশুধান্য এই সময়ই সুপক্ক হয়। এই ধান্য কৃষি-জাত খাদ্যবস্তু অতএব তাহাতে অনাশক্ত তাড়িৎ বা বিষ বর্ত্তমান

রহিয়াছে বলিয়াই বিষের পূর্ণমূর্ত্তি জীবন সংহারকারিনী কলিকা মূর্ত্তিরও এই সময়ে পূজা হইয়া থাকে। হিন্দুশাস্ত্রে বলে, কালীপূজায় মদ্য, এবং ছাগ প্রভৃতি পশুর রক্ত দিতে হয়। এই ছাগবলি বা হত্যা অর্থে ছাগের রক্তকে বুঝায় না। ইহা আলঙ্কারিকভাবে বর্ণিত রহিয়াছে অর্থাৎ ছাগরক্ত অর্থে তাঁহাদের দুগ্ধকেই নির্দ্দেশ করিতেছে এবং উহাদের দুগ্ধে টকরস বা পিত্তরস মিশ্রিত করাই ঐ সমস্ত পশুহত্যা রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। হিন্দু আর্য্যমুণি ঋষিগণ বহু গবেষণার দ্বারা স্থির করিয়া গিয়াছেন যে, ছাগদুগ্ধে ও মৃত্যুরূপিণী কলিকামুর্ত্তি বা বিষ বর্ত্তমান রহিয়াছে। আর বিশেষতঃ কৃষিজাত খাদ্যরূপ ভক্ষ্যবস্তুর শেষ নির্য্যাস স্বরূপ মদ্যেও পূর্ণমাত্রায় ঐ কালিকামুর্ত্তি বা বিষের মূর্ত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। বর্ত্তমান হিন্দুগণ ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়াই ছাগদুগ্ধ স্থলে ঐ সকল পশু হত্যা করিয়া বা জীবহিংসা করিয়া কালীপূজা করিয়া থাকেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে জীবহিংসা করা, কোন ধর্ম্মই হইতে পারে না। মায়ামুগ্ধ বদ্ধ লৌকিক পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম না বুঝিয়াই পশুহত্যা অনুমোদন করেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত নিতান্তই ভুল। জগতের কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেই যে, এইরূপ হত্যা করিবার বিধান লিখা নাই, ইহা পূর্ব্বেও একবার বলিয়াছি। সে যাহা হউক রামের একই স্ত্রীর গর্ভজাত লব ও কুশ নামে দুইটী পুত্র ছিল। আর এব্রহিমের স্ত্রী হাজেরার গর্ভজাত ইস্মাইল ও সরার গর্ভজাত ইছাহাক্ নামে দুইটী পুত্র সন্তান ছিল। রাম নিজের পুত্রের সহিত যুদ্ধে একবার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন কিন্তু এব্রহিম ঈশ্বরের আদেশে আপন পুত্রকে কোরবাণী দিয়াছিলেন। রামায়ণের পিতা পুত্রের যুদ্ধ অর্থাৎ রাম ও তাঁহার পুত্রদিগের সহিত যুদ্ধ সম্বন্ধে যেমন পূর্ব্বে আপনাদিগকে আলঙ্কারিকভাব দেখাইয়াছি, ইঞ্জিল কিতাবের এব্রহিম কর্ত্তৃক পুত্র কোরবাণীও তদ্রূপ আলঙ্কারিকভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। মুসলমানগণ এই কোরবাণীর ভাবার্থে

খোদার নামে গো, মেষ, ছাগল ও উষ্ট্র প্রভৃতি প্রাণীগণকে হত্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই পশু কোরবাণী বা হত্যা শব্দের অর্থ লইয়া ধর্ম্মজগতে এক বিষম ভুলধারণা রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কোরবাণী শব্দের প্রকৃত অর্থ "আত্মবলির নিদর্শন" অথবা অন্যার্থে কোন বস্তু বা কোন প্রাণিকে, যে কোন প্রকার কোন অস্ত্রদ্বারা কিম্বা ক্রুশে বিদ্ধ করা। কোর্-আন মজীদে স্পষ্ট বলিতেছে যে, একের পাপ অন্যে হরণ করিতে পারে না এবং কোর্-আনে জীবহিংসা করা একেবারেই নিষিদ্ধ রহিয়াছে। কোর্-আনে সূরাবকরায় বর্ণিত গোহত্যাও যে, মোতাশাবেহাতুন বা আলঙ্কারিকভাবে বর্ণিত রহিয়াছে তাহাও আমি পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব। এব্রহিমের পুত্র কোরবাণী শব্দের আলঙ্কারিক ভাবার্থ এই যে,—জগতের প্রাণিমাত্রেরই যার যার মাতৃস্তন্যদুগ্ধ, তার তার নিজের উপভোগের জন্যই ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার প্রিয় মানবের জন্য গো, মেষ, মহিষ ও ছাগ প্রভৃতি দুগ্ধবতী প্রাণিগণকে মানবের উপকারার্থে তাহাদের নিজ নিজ সন্তানগণ কোরবাণী দিতে বলিলেন অর্থাৎ তাহাদের সন্তানগণ বা বৎসগণের জন্য দুগ্ধ না রাখিয়া মানবের সেবা বা পান ভোজনের জন্য তাহাদের সমস্ত দুগ্ধ উৎসর্গ করিতে বলিলেন। তাহাতে ঐ সকল প্রাণিগণ প্রথমে মনে করিয়াছিল যে, ঐরূপ করিলে তাহাদের সন্তানগণ বা বৎসগণ দুগ্ধাভাবে মরিয়া যাইবে। কিন্তু যখন ঈশ্বরের প্রীত্যার্থে মানবের জন্য তাহাদের দুগ্ধ উৎসর্গ করিল বা তাহাদের সন্তান কোরবাণী দিল, তখন দেখিতে পাইল যে, তাহাদের সন্তানগণ মৃত্যুমুখে পতিত না হইয়া বরং হৃষ্ট পুষ্ট অবস্থায় জীবিতই রহিয়াছে। কারণ আমরা যখন গো, মেষ, মহিষ ও ছাগল প্রভৃতি দুগ্ধবতী প্রাণিগণ হইতে দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়া লইয়া থাকি তখন ঐ সকল প্রাণিগণ, নিজেদের সন্তানগণ বা বৎসগণ পোষনোপযোগী দুগ্ধ, যে কোন প্রকারেই হউক বা করুণাময় ঈশ্বরের সৃষ্টি কৌশলেই হউক, নিজ নিজ স্তনে

রাখিয়া দিয়া থাকে। অথবা অল্প সময়ের মধ্যেই উহাদের স্তনে আবার ঐরূপ দুগ্ধ আসিয়া উপস্থিত হয়। মানুষ দোহন করিয়া চলিয়া গেলে পর, তাহারা তাহাদের সন্তানগণকে বা বৎসগণকে ঐ দুগ্ধ পান করাইয়া থাকে। তাহাতেই তাহাদের বৎসগণ দুগ্ধাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত না হইয়া বরং জীবিতই থাকে। নিজের সন্তান ভোগ্য দুগ্ধ মানবকে দান করা কার্য্যই ঐ সমস্ত পশুদের আত্মবলির নিদর্শন বা ঈশ্বরের প্রীত্যার্থে সন্তান কোরবাণী দেওয়ারূপে এস্থলে আলঙ্কারিক-ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। ইঞ্জিল কিতাবে এব্‌রহিমকে এস্থলে দুম্বাশক্তি বা মেষশক্তিরূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। তাই তিনি নিজের পুত্রকে ঈশ্বরের প্রীত্যার্থে কোরবাণী দিয়া দেখিলেন যে, উহা দুম্বা বা মেষশাবকে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বে যে, হিন্দুদের গোঘ্ন শব্দের ভাবার্থে বলা হইয়াছে যে, আর্য্যগণ অতিথি সৎকারের জন্য গোবৎস হত্যা করিতেন। এখন এব্‌রহিমের পুত্র কোরবাণী বা হত্যার আলঙ্কারিক ভাব হইতে বুঝা যায় যে, আর্য্যঋষিগণ, তাঁহাদের বাড়ীতে অতিথি উপস্থিত হইলে একুশ দিনের বয়স্ক গোবৎসকে বাঁধিয়া রাখিয়া গোমাতার দুগ্ধ দোহন করিয়া অতিথিকে সেবা করাইতেনএবং ইহারই ভাবার্থেই গোঘ্ন বা গোবৎসহত্যা আলঙ্কারিকভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। যেহেতু বর্ত্তমানেও প্রায় অনেক স্থলে হিন্দুদের বাড়ীতে গাভী বৎস প্রসব করিলে বিশ দিন পর্য্যন্ত তাঁহারা তাহার বৎস্যকেই গাভীর সমস্ত দুগ্ধ পান করাইয়া থাকেন তারপর যেদিন একুশ দিন হয় সেই দিন হইতে নিজেরা পান করিয়া থাকেন বা অতিথিকেও পান করিতে দিয়া থাকেন।

সপ্তম অধ্যায়।

এখন আপনাদিগকে হিন্দুর দ্বাপরযুগের বলরাম ও কৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছু জানাইতেছি। হিন্দুগণ বলরাম ও কৃষ্ণকে দ্বাপরযুগের অবতার বলিয়া স্বীকার করেন। বলরামকে হলধর বলা হয় এবং তাঁহার স্কন্ধে হল অর্থাৎ লাঙ্গলও বর্ত্তমান আছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বলরামকে এস্থলে ভূমি কর্ষণকারী বলদশক্তিরূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। এইজন্যই হিন্দুশাস্ত্রে বলরামের স্ত্রী রেবতীর নাম উল্লেখ থাকিলেও হিন্দুর ত্রেতাযুগের লক্ষ্মনের স্ত্রী উর্ম্মিলার ন্যায়, বলরামের সহিত ও রেবতীর সকল স্থানে বিশেষ কোন সংস্রব শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। রেবতী শব্দের অর্থ গবী বা স্ত্রীজাতীয় গোজাতিকেও বুঝায়। বলরাম এবং কৃষ্ণের ভগ্নী সুভদ্রাকেও গাভীশক্তি নির্দ্দেশ করে এবং তাহার গর্ভজাত পুত্র অভিমন্যুও যে, গোমাতার চন্দ্রশক্তিরূপ দুগ্ধরূপকে আবৃত হইয়া আছেন তাহা পরে দেখাইতে চেষ্টা করিব। আর কৃষ্ণকে এঁড়ে বা ষাঁড়শক্তিরূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। তাই একটি মাত্র এঁড়ে বা ষাঁড়, বহুসংখ্যক গাভীর পালে থাকিয়া তাহাদের সকলের সহিত বিহার করিয়া থাকে। ব্যাসদেব ও দ্বাপরযোগে হিন্দুশাস্ত্রের মহাভারতে, কুরুপাণ্ডব বংশকে মানবের কৃষিজাত খাদ্যশক্তিরূপে, শ্রীমদ্ভাগবতে বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণকে, মানবের

প্রধান উপাদেয় খাদ্যবস্তু গোদুগ্ধস্থ খাদ্য ও পানীয়শক্তিরূপে, মথুরাতে কুব্জা ও শ্রীকৃষ্ণকে মানবের সুমিষ্ট খাদ্যবস্তু ও পানীয়শক্তিরূপ গুড় চিনি বা গুড় চিনি হইতে উৎপন্ন মধুরূপে এবং দ্বারকা লীলায় রুক্মিণী ও শ্রীকৃষ্ণকে, পদ্মফুল বা নানাজাতি শস্যকণার পুষ্প হইতে সংগৃহীত সুমিষ্ট রসময় মধুস্থ খাদ্য ও পানীয়রূপে রূপকাবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। আমি প্রথমতঃ বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত খাদ্যবস্তু গোদুগ্ধ সম্বন্ধে আপনাদিগকে কিছু বলিব। কৃষ্ণ শব্দের প্রকৃত অর্থ—জগৎকে আকর্ষণ করেন যিনি বা যে বস্তু। অতএব কৃষ্ণ শব্দের ধাতুগত অর্থ রসঘন স্বরূপ পরমাত্মাকেই বুঝায়। তাই বৈষ্ণবগ্রন্থে কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলে যে,—

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন
কামবীজ, কামগায়ত্রী যার উপাসন্
পুরুষ যোষিত কিম্বা স্থাবর জঙ্গম্
সর্ব্বচিত্ত আকর্ষক, সাক্ষাৎ মন্মথ মদন।”

এই বৃন্দাবন শব্দের ভাবার্থে বৈষ্ণবগণ কোনস্থলে মানবদেহকে, কোনস্থলে জগৎকে, কোনস্থলে তুলসীবৃক্ষের বনকে এবং কোনস্থলে মথুরাজিলাস্থ বৃন্দাবন নামক স্থানকে নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছেন। আমি এস্থলে তুলসীবৃক্ষ সম্বন্ধে সকলের পূর্ব্বে কিছু জানাইতেছি। ভারতের হিন্দুগণ এই তুলসী বৃক্ষকে অতি পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করেন। হিন্দুদের কোন পূজাপার্ব্বণই তুলসীবৃক্ষের পত্র ব্যতীত সিদ্ধ হয় না। বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের ভক্ষ্যবস্তুর উপর তুলসী পত্র দিয়া ভগবানের নামে নিবেদন করিয়া আহার করেন। হিন্দুশাস্ত্রে, রুক্মিণী ও সত্যভমার কলোহপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ সদৃশ গোদুগ্ধ অপেক্ষাও যে তুলসী পত্র শ্রেষ্ঠ, তাহা ঐশ্বর্য্য ও ভক্তির শক্তি পরীক্ষা রূপকচ্ছলে বর্ণিত রহিয়াছে। হিন্দুদের মৃত ব্যক্তির শয্যার পার্শ্বে তুলসী বৃক্ষ রাখার প্রথা চিরকালই চলিয়া আসিতেছে। হিন্দুগণ, মৃত সৎকারের পর চিতায় তুলসীবৃক্ষ রোপণ করিয়া থাকেন। এখন কথা হইতেছে যে, হিন্দুরা কেনই বা এই তুলসী বৃক্ষকে

এত পবিত্র মনে করেন? হিন্দুদের এই সকল ভাব হইতে স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, তুলসী বৃক্ষে বা তাহার পত্রে অনাসক্ত তাড়িৎ বা বিষ নষ্ট করিতে সক্ষম হয়। এইজন্যই হিন্দুশাস্ত্রে বলে, যে বাড়ীতে তুলসী বৃক্ষ না থাকে তাহা শশ্মান সদৃশ এবং এই জন্যই বৈষ্ণবগণ তুলসীর মালা গলায় ধারণ করিয়া থাকেন। বৃন্দাবন অর্থে যে মানব দেহ বা জগৎকেও নির্দ্দেশ করে, তাহার প্রমাণ এই যে,—হিন্দুশাস্ত্রে বলে, বৃন্দাবনধাম চৌরাশি ক্রোশ পরিমিত। আমাদের মানবদেহও উচ্চে প্রত্যেকের নিজ নিজ হাতের সাড়ে তিনহস্ত পরিমিত। যদি চব্বিশ আঙ্গুলিতে এক হস্ত হয় তবে সাড়ে তিনহস্ত পরিমিত মানবদেহও চৌরাশি আঙ্গুলি পরিমত হয়। এই ভাবার্থেই মানবদেহ শ্রীবৃন্দাবন সদৃশ। এস্থলে চৌরাশি অঙ্গুলিই চৌরাশি ক্রোশের সহিত রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। বিশেষতঃ মানবদেহস্থ সহস্রদল পদ্মে, বৃন্দাবনের ন্যায় গুরুরূপী রাধাকৃষ্ণ একাধারে যুগলরূপে বর্ত্তমান আছেন এবং মানবদেহও ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ এই অর্থেই বৃন্দাবন জগৎ সদৃশরূপে রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। সে যাহা হউক, দ্বাপরযুগে, যখন গর্গমুণি যশদার পালিত পুত্র কানাইর জীবন চরিত, অনন্ত পানীয় শক্তিস্বরূপ রসময় পদার্থের বা দুগ্ধের কার্য্য কলাপের সহিত সর্ব্বতোভাবে মিশিয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন, তখনই তিনি ধ্যানেতে অবগত হইলেন যে, এই যশদার পালিত পুত্র কানাইই—সেই পরমাত্মা বা রসঘনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ। বৃন্দাবনে, রাধাকৃষ্ণের লীলা সকল সর্ব্বতোভাবে অনন্ত খাদ্য ও পানীয় শক্তি বা দুগ্ধের ভাব সকলের সহিত সামঞ্জস্য হইয়া রহিয়াছে। ব্যাসদেব, শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতায় বৃন্দাবনে, রাধাকৃষ্ণের লীলাচ্ছলে মানবের অপ্রাকৃত খাদ্য ও পানীয় বস্তুরূপ গোদুগ্ধেরই ক্রিয়াকলাপ সকল আলঙ্কারিকভাবে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং জগতের নিত্য বস্তুরূপ খাদ্য ও পানীয় স্বরূপ প্রকৃতিপুরুষের পিরিতপ্রণয়ের সহিত বৃন্দাবন লীলায় রাধাকৃষ্ণের প্রণয় কাহিনী অতি মধুর ভাবে সামঞ্জস্য

করিয়া নিত্য ও লীলার ভাব একভাবাপন্ন করিয়া দেখাইয়াছেন। এখন আপনারা চিন্তা করিয়া দেখুন যে, গোত্নগ্ধে পিত্তরস বা টকরস মিশ্রিত হইলে, ছানা বা মাখন স্বরূপা চিন্ময়ীহ্লাদিনীশক্তিস্বরূপিণী বা খাদ্যশক্তিস্বরূপিণী শ্রীরাধা এবং নীলবর্ণ ছানার জলস্বরূপ পানীয় শক্তি যশদার .নীলমনিরূপে, বর্ত্তমানই দৃষ্ট হয় কিনা ? শ্রীমদ্ভাগবৎ গীতায়, সচরাচর রাধা বলিয়া কোন শব্দের উল্লেখ দেখা যায় না। তাহাতে রাধার স্থলে প্রায় সর্ব্বত্রই শুধু প্রধানা গোপী বলিয়াই উল্লেখ রহিয়াছে। এখন এই প্রধানা গোপী শব্দের ভাবার্থ বিচার করিয়া দেখিলেই সকল বিষয় আপনাদের অতি সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গো শব্দের অর্থ পৃথিবীকে এবং গোজাতিকেও বুঝাইয়া থাকে। গো শব্দ পা ধাতু ড প্রত্যয় করিলে গোপ শব্দ সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ পৃথিবী বা গোজাতিকে পালন করেন যিনি বা যে বস্তু। গোপ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে গাপী শব্দ হয়। তাহাহইলে বুঝা যায় যে, পৃথিবী বা গোজাতি পালনকারিণীকেই গোপী বলা হয়। খাদ্য ও পানীয়শক্তিরূপ অনন্ত প্রকৃতিপুরুষই পৃথিবীকে প্রকৃত প্রস্তাবে পালন করিতেছে। অতএব খাদ্যবস্তু মাত্রেই গোপী এবং পানীয় বা রসঘন স্বরূপ পুরুষশক্তিই গোপীনাথ বা গোপীজনবল্লভস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ। তুগ্ধের ভিতরস্থ ছানা বা মাখন জগতের উপাদেয় বা প্রধান খাদ্যবস্তু। এইজন্যই রাধারূপিণী ছানা বা মাখনরূপ খাদ্যবস্তুশক্তি প্রধানা-গোপী নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বস্ত্র হরণ করিয়াছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রায় অধিকাংশ মানবের খাদ্যবস্তুরূপ গোপী বা শস্যকণার অর্থাৎ ফলমূলের গায়ের ছাল বা খোঁস না ছাড়াইলে এবং প্রধানা গোপীস্বরূপ তুগ্ধকে মন্থন করিয়া বা টকরস মিশ্রিত করিয়া তাহা হইতে মাখন, ছানা বাহির করিয়া না লইলে বা উপরের আবরণ উন্মোচিত না হইলে মানুষের সেবাতে বিশেষরূপ তৃপ্তি হয় না। অর্থাৎ রসময় শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ মানবের রসনার বা জিভের আনন্দ অনুভব হয় না। ইহাই শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক গোপীদের বস্ত্রহরণ

রূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। দুগ্ধস্থ খাদ্যস্বরূপ ছানাও মাখনে প্রভেদ এই যে, ছানা শুধু খাদ্যশক্তি বিশিষ্ট বস্তু কিন্তু মাখন খাদ্য ও পানীয় বস্তুর মিলিতাবস্থা শক্তি বিশিষ্ট বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সহিত রাসলীলা করিয়াছিলেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দন্তদ্বারা গোপীস্বরূপ সেবার বস্তুকে চর্ব্বন করিয়া রস নির্গত করিয়া রসময় রসনাস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ অনুভব করা কার্য্যকেই প্রকৃত রাস বলিয়া কথিত হয়। অথবা মন্থনদণ্ড বা শরযষ্টি দ্বারা দুগ্ধকে মন্থন অর্থাৎ ক্রুশে বিদ্ধ করা কার্য্যেরভাবই শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বা প্রধানা গোপীর সহিত মৈথুন ক্যর্য্য। এইজন্যই গয়লারা, যে পাত্রে দুগ্ধ মন্থন করে, অনেকস্থলে গ্রাম্য ভাষার ঐ পাত্রকে 'রাস' বলিয়াই কথিত হয়। এইরূপ খাদ্যবস্তুকে দন্তদ্বারা চর্ব্বন ও দুগ্ধকে মন্থন দণ্ডদ্বারা মন্থন করা কার্য্যের সহিত বাইবেলের খাদ্যশক্তিরূপ যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করার ভাব সামঞ্জস্য হইয়া রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, ষোল হাজার গোপী লইয়া রাসলীলা করিয়াছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভারতের আর্য্যমুণিঋষিগণ স্থির করিয়াগিয়াছেন যে, প্রধাণতঃ জগতে মানবের খাদ্যোপযোগী ষোল হাজার খাদ্যবস্তুরূপগোপী বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইস্থলে মানবের রসময় রসনা বা জিভই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ, দন্ত তাহার মন্থন দণ্ড এবং খাদ্যবস্তু মাত্রই গোপীগণ। আবার পবিত্র কোর-আনের "সূরাকওশরে" মানবের জিভ্‌কেই যে, স্বর্গের "কওশর" নদী রূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে ইহা আপনাদিগকে পরে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। শ্রীকৃষ্ণ, রাধা বা প্রধানা গোপীর কলঙ্ক ভঞ্জনের জন্য নিজে মিছামিছি পীড়ার ভান করিয়া অন্যরূপে বৈদ্য সাজিয়া ঔষধ সেবনার্থে ছিদ্রকুম্ভে জল আনিতে বলিলেন। বৃন্দাবনের কোন গোপীই তাহা আনিতে সক্ষম হইলেন না। কিন্তু শ্রীরাধা বা প্রাধানা গোপী তাহা আনিয়া দিলেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, দুগ্ধবতী প্রাণিগণের বাঁটে ছিদ্র থাকা সত্বেও তাহাদের স্তনস্থ বা পালানস্থ দুগ্ধ নিজ ইচ্ছায় ঐ বাঁট দ্বারা পতিত বা ক্ষরিত হয় না। অর্থাৎ গোবৎস দ্বারা বা মানুষের

হস্তদ্বারা আকর্ষিত না হইলে ঐ পালানস্থ দুগ্ধ বিনা কারণে সচরাচর পতিত বা ক্ষরিত হয় না। এই দুগ্ধবতী প্রাণিগণের দুগ্ধকেই ছিদ্রকুম্ভের জলরূপে রূপকাবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। এই ছিদ্রকুম্ভের জল বা দুগ্ধবতী প্রাণিগণের দুগ্ধই গীতার "অক্ষর হইতে জাত ব্রহ্ম।" যেহেতু দুগ্ধরূপ খাদ্যবস্তুই জগতের প্রকৃত ব্রহ্ম। ব্যাসদেব, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধিকা বা প্রধানা গোপীর কলঙ্ক ভঞ্জন উপলক্ষে জগতকে শিক্ষা দিয়া গেলেন যে, কেবল একমাত্র গোদুগ্ধই মানবের সমস্ত জ্বরা ব্যাধি নষ্ট করিতে সক্ষম হয়। বৈষ্ণব গ্রন্থে বলে যে,—

"শতকোটি গোপী করে যদি কাম নির্ব্বাপন
তথাপিও শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধিকায় মন।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, রসময় শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ রসনা, জগতের অন্য যে কোন গোপীস্বরূপ খাদ্যবস্তুই গ্রহণ করিয়া তৃপ্তি অনুভব করুক না কেন? তথাপিও শ্রীরাধারূপ গব্যরস বা দধি, দুগ্ধ, ছানা, মাখন ও ঘৃতে জিভের অত্যন্ত আসক্তি বর্ত্তমান থাকে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ রসনা দধি, দুগ্ধ, ছানা, মাখন ও ঘৃতে যেরূপ তৃপ্তি অনুভব করে জগতের আর কোন খাদ্য বস্তুতেই তদ্রূপ তৃপ্তি অনুভব করে না। শ্রীকৃষ্ণের কালিয় দমনের তাৎপর্য্য এই যে, কৃষিজাত ভক্ষ্য বস্তুর বিষ গোদুগ্ধরূপ হরি বা শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিতে সক্ষম হয়। শ্রীকৃষ্ণের পুতনা রাক্ষসী বধ করার ঘটনা বড়ই জটিল সমস্যার পরিপূর্ণ। শিশুকৃষ্ণকে বধ করিবার মানসে পুতনা স্তনে বিষ মাখিয়া আসিয়াছিল বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, মাতৃগর্ভ হইতে শিশু জন্মিবার পূর্ব্ব হইতেই মাতৃস্তনের উপরিভাগবা কণ্ঠদেশ ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ বা গাড় নীলবর্ণ ধারণ করে। উহাই পুতনার স্তনে বিষ মাখানোরূপকে আবৃত হইয়া, রহিয়াছে। কারণ মানুষের দুগ্ধেও অনাসক্ত তাড়িৎ বা বিষ বর্ত্তমান আছে। শাস্ত্রে মাকেই পূর্ণমায়ারূপিণী বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং মায়াকেই রাক্ষসী বলিয়া বর্ণণা করিয়া রাখা

হইয়াছে। পুতনা বধের বিশেষ ভাবার্থ এই যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ গোদুগ্ধ, মাতৃস্তনস্থদুগ্ধ ভক্ষণ জনিত শিশুর দেহের বিষকে নষ্ট করিতে সক্ষম হয়। আজকাল ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে অধিকাংশ স্থলেই শিশুকে মাতৃস্তন পান না করাইয়া বৈজ্ঞানিক মতে প্রস্তুত বিশুদ্ধ গোদুগ্ধ পান করাইয়া থাকেন। বোধ হয় এই কারণ বশতঃই ভারতের শিশুগণ অপেক্ষা তাহারা অধিক হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া থাকে এবং ভারতের শিশুদের ন্যায় শিশু ব্যধিতেও আক্রান্ত হয় না। যেমন গোদুগ্ধ হরি বা শ্রীকৃষ্ণরূপে রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। মাতৃস্তনই এস্থলে হিন্দুর শিবলিঙ্গরূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। যেহেতু মাতৃস্তনেপঞ্চধারা বা পঞ্চমুখ বর্ত্তমান আছে এবং মাতৃস্তনেরই কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ বলিয়াই শিব নীলকণ্ঠরূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছেন। যেমন গোদুগ্ধে খাদ্য ও পানীয় বর্ত্তমান রহিয়াছে তদ্রূপ মাতৃস্তনেও খাদ্য ও পানীয় শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাই শিশুগণ শুধু মাতৃস্তন পান করিয়াও জীবন ধারণ করিয়া থাকে। যেমন কৃষিজাত শস্যকণা প্রভৃতি বিষাক্ত খাদ্যবস্তু মাত্রই কালিকামূর্ত্তিস্বরূপ তদ্রূপ মাতৃস্তনের দুগ্ধস্থ খাদ্যবস্তুশক্তিও করাল বদনী কালীকামূর্ত্তিস্বরূপা। কিন্তু গোদুগ্ধেও তুলসী পত্রের রসে শিশুর মাতৃদুগ্ধ ভক্ষণ জণিত ব্যাধির বিষকে সম্পূর্ণরূপ নষ্ট করিতে সক্ষম হয়। দুগ্ধে টক্‌রস বা পিত্তরস মিশ্রিত হইলেই উহা জমিয়া ছানায় পরিণত হয়। তখন দুগ্ধস্থ ছানা দুগ্ধস্থ পানীয়শক্তির উপর ভাসিয়া বেড়ায় বা দাঁড়াইয়া থাকে। মাতৃদুগ্ধস্থ ঐ ছানারূপ খাদ্যশক্তি বা কালীকামূর্ত্তি, মাতৃদুগ্ধস্থ পানীয়শক্তিরূপ শিব-শক্তির উপর দণ্ডায়মান থাকে। তাই হিন্দুশাস্ত্রে দেখা যায় কালীমূর্ত্তি শিবের বক্ষঃস্থলে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। এইরূপ গোদুগ্ধস্থ খাদ্যশক্তিও গোদুগ্ধে টক্‌রস বা পিত্তরস মিশ্রিত হইলে গোদুগ্ধস্থ পানীয়শক্তিরূপ শ্রীকৃষ্ণের মাথায় পা দিয়া থাকে। এইজন্যই জয়দেব গোস্বামীর গ্রন্থে, "দেহিপদ পল্লব মুদারম" বাক্যটী লিখিত হইয়াছিল। এইজন্যই বৈষ্ণবগ্রন্থে দেখা যায় যে,

শ্রীকৃষ্ণ রাধার পা মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের মথুরালীলায়, কংসকে বধ করিয়া কুব্জাকে রাণী করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে। এই কংস রাজা ও কুব্জা রাণীও আলঙ্কারীকভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। কংস শব্দের প্রকৃত অর্থ কংস বা কাঁসের ন্যায় শব্দ করে যে, অর্থাৎ শৃগালকেই বুঝায়। মধুবন বা মধুপুরী (মথুরা নগর) অর্থে ইক্ষুক্ষেত্রকে বুঝায়। কংস সদৃশ শৃগাল মধুপুর সদৃশ ইক্ষুক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া মানুষের সুমিষ্ট খাদ্যবস্তু নষ্ট করে। এইরূপে পৃথিবীতে কংসের অত্যাচার অর্থাৎ পৃথিবীতে শৃগালের উপদ্রব অতিরিক্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে, ভগবান বলরাম স্বরূপ বল্‌তা ও শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ ভীমরুল বা মৌমাছি, কংসের বংশ অর্থাৎ শৃগালের বংশকে ইক্ষুক্ষেত্রে হুল ফুটাইয়া বিষে জর্জ্জরিত করিয়া মারিয়া ফেলিতে লাগিলেন। ইহাই মধুপুরস্থ কংসেরবংশ, কৃষ্ণ ও বলরাম কর্ত্তৃক নিধন প্রাপ্তের ভাব আলঙ্কারিক ভাবে রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। ইক্ষুক্ষেত্রে সচরাচর অধিক বোলতার চাক্ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মধুপুরে বা মথুরায় কুব্জা রাণী ছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, মৌচাক্‌কেও মধুপুরীরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। মৌচাকে একটি করিয়া রাণী মাছি বর্ত্তমান থাকে। মৌমাছির পৃষ্ঠদেশে যে, কুঁজ দৃষ্ট হয় উহাই রাণী মাছি বা কুব্জা রাণীর পৃষ্ঠদেশস্থ কুঁজ। এইস্থলে মধুপুররূপ মৌচক্রের রাণী মাছিকে মথুরার কুব্জা রাণী রূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ আয়ানের ভয়ে কালী হইলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ গোদুগ্ধ মহিষদুগ্ধে পরিণত হইলেন। কারণ মহিষদুগ্ধেও অপ্রাকৃত খাদ্য ও পানীয়শক্তি স্বরূপ রাধাকৃষ্ণের যুগলরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে বটে, কিন্তু মহিষদুগ্ধে অনাসক্ত তাড়িং বা বিষ র্ত্তমান থাকাতে উহাকে বিষের পূর্ণমূর্ত্তি কালীরূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। মহিষদুগ্ধস্থ খাদ্যশক্তি কালী বা বিষশক্তিরূপিণী আর গোদুগ্ধস্থ খাদ্যশক্তি দুর্গা বা ভগবতী অর্থাৎ অমৃতশক্তিপ্রদায়িনী। এই গোদুগ্ধে

মহিষদুগ্ধ ভক্ষণজনিত বিষকে নষ্ট করে বলিয়া দুর্গা বা ভগবতীকে মহিষমর্দ্দিনী বলা হয় এবং এই ভাব হইতেই হিন্দুশাস্ত্রে গোদুগ্ধরূপ ভগবতী কর্ত্তৃক মহিষাসুর বধ, আলঙ্কারিকভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। জগতে কৃষিজাত খাদ্যবস্তুর ভিতর, মহিষদুগ্ধস্থ খাদ্যে, মাতৃস্তনস্থ খাদ্যে ও জীব জন্তুর মাংসরূপ খাদ্যে বিশেষতঃ ছাগদুগ্ধস্থ খাদ্যে যে অনাসক্ত তাড়িৎ বা বিষ বর্ত্তমান আছে উহাকেই হিন্দুশাস্ত্রে, করালবদনীকালী বা মৃত্যুস্বরূপিণীরূপে বর্ণনা করিয়া রাখিয়াছে। তাই হিন্দুর কালীমূর্ত্তি, গলদেশে নরমুণ্ডমালা ধারণ করিয়া, মুক্ত অসি হস্তে উলঙ্গ অবস্থায় সাক্ষাৎ মৃত্যুসম রাক্ষসীর ন্যায় বিকটাকারে স্বামীর বক্ষে দণ্ডায়মানা হইয়া রহিয়াছেন। হিন্দুগণের কালীমুর্ত্তি অর্থে কৃষিজাত খাদ্যবস্তু, মহিষদুগ্ধ, মাতৃস্তনস্থদুগ্ধ, ছাগদুগ্ধ ও জীবজন্তুর মাংস প্রভৃতি অনাসক্ত তাড়িৎ বা বিষযুক্ত খাদ্যবস্তু প্রভৃতিকেই বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করে। এই বিষযুক্ত খাদ্যবস্তুতেও কিছু চন্দ্রশক্তি আছে, তাই উহা ভক্ষণ করিলেও মানবগণ জীবিত থাকে, ইহারই ভাবার্থে ঐ কালীমূর্ত্তি, দক্ষিণহস্ত প্রসারণ করিয়া জীবকে অভয় প্রদান করিতেছেন। অন্যদিকে গো মাতার দুগ্ধে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক ও গনেশ অর্থাৎ মানুষের ভাগ্য, জ্ঞানবুদ্ধি, যশ বা সিদ্ধি এবং বল বীর্য্য প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে এবং অসুর বা অনাসক্ত তাড়িৎরূপ শয়তানের অর্থাৎ দশমুখযুক্ত রাবণের দশদিগের আক্রমন হইতে মানবগণকে রক্ষা করিবার জন্য দশহস্তে, গোদুগ্ধস্থ খাদ্যবস্তু সদৃশা দুর্গার বা ভগবতীর, দশ প্রকার প্রহরণ বিদ্যমান আছে। হিন্দুদের চণ্ডীতে বলে যে, চণ্ডী অর্থাৎ দুর্গা বা ভগবতী নিজের সতীত্ব রক্ষার জন্য শম্ভু, নিশম্ভু নামক দুইটি অসুরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহার বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে, গোদুগ্ধস্থ খাদ্যরূপা চণ্ডী বা দুর্গা, অনাসক্ত ও আসক্ত নামক দুইটি তাড়িৎ বা অসুর এবং অন্যার্থে দুইটি কীটকে যে, বিনষ্ট করিতে সক্ষম হয়, এস্থলে তাহাই রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। ইংরাজীতে

মিল্টনের প্যারাডাইস্ লষ্টেও এইরূপ দুইটি কীট বা শয়তানের স্বর্গ হইতে পতনের কথা উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন লীলায় শুধু গোদুগ্ধরূপ পানীয়শক্তি এবং মথুরা লীলায় ইক্ষুরস, গুড়, চিনি, মিশ্রি হইতে জাত মধুস্থ পানীয় শক্তিরূপকে যে, আবৃত হইয়া রহিয়াছেন যথাসাধ্য যৎকিঞ্চিৎ তাহার আভাস দেওয়া হইল। এখন দ্বারকা লীলায় যে, পদ্মফুল বা নানা জাতীয় শস্যকণার পুষ্প হইতে প্রাপ্ত সুমিষ্ট রসময় মানবের খাদ্য ও পানীয় স্বরূপ মধুস্থপানীয়রূপে আবৃত হইয়া রহিয়াছেন, যথাসাধ্য এখন তাহার কিছু আভাস দিতেছি। মৌমাছি সদৃশ শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার মথুরার চিনি, গুড় প্রভৃতি হইতে সংগৃহিত মধুপূর্ণ স্থান বা গোবর্দ্ধন পর্ব্বত সদৃশ মৌচাক, জরাসন্ধ দ্বারা অর্থাৎ ভল্লুক বা খড় কুটা নির্ম্মিত অগ্নির মোশালযোগে আক্রান্ত হইলে, চতুর্দ্দিকে জল দ্বারা বেষ্টিত দ্বারকা নগরে অর্থাৎ পদ্মফুলে যাইয়া স্থান লইলেন। হিন্দুশাস্ত্রে বলে যে, কংশের শ্বশুর জরাসন্ধ কর্ত্তৃক মথুরায় একবিংশতিবার শ্রীকৃষ্ণ পরাজিত হইলে, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতে যাইয়া আশ্রয় লন। তারপর গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের ও চতুর্দ্দিক জরাসন্ধ কর্ত্তৃক অগ্নিদ্বারা পরিবেষ্টিত হইলে, শ্রীকৃষ্ণ অতি কষ্টে দ্বারকা নগরে পলায়ন করেন। এস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে মৌমাছিরূপকে, মৌচক্রকে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতরূপকে এবং চতুর্দ্দিক জল দ্বারা বেষ্টিত'পদ্মফুলকে দ্বারকা নগরে রূপকাবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। এবং এস্থলে ভল্লুককে শৃগাল সদৃশ কংশের শ্বশুর বা জরাসন্ধরূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে এবং অন্যার্থে খড় কুটাকেও জরাসন্ধরূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। যেহেতু ভল্লুক মৌচক্র হইতে মৌমাছি তাড়াইয়া মধু পান করিয়া থাকে এবং খড় কুটা নির্ম্মিত অগ্নির মোশাল দ্বারাও মানুষ মৌমাছি তাড়াইয়া মধু সংগ্রহ করে। ইহার ভাব অর্থে ভল্লুকও খড় কুটাকে জরাসন্ধরূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ যে, বাম করে গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ

করিয়া ব্রজগোপী রক্ষা করিয়াছিলেন, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, স্ত্রী জাতীয় মধুকর দ্বারা গোবর্দ্ধন পর্ব্বতরূপ মৌচক্রে গোপী বা খাদ্যবস্তু স্বরূপ মধু সংগ্রহ করিয়া রাখা নির্দ্দেশ করিতেছে। এস্থলে স্ত্রীজাতীয় মধুকরকেই মৌমাছি সদৃশ শ্রীকৃষ্ণের বামকর বলিয়া রূপকাবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। যেহেতু মৌচাকে বামকর বা স্ত্রীজাতীয় মৌমাছিই অধিক থাকে। ইহার ভাবার্থ হইতেই হিন্দুশাস্ত্রে বলে, শ্রীকৃষ্ণ বামকরে গিরি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার ঠাকুর বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী বলিয়াছেন যে, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরগুলিও সময় মত বালকের ন্যায় নৃত্য করে। গোবর্দ্ধন পর্ব্বত সদৃশ মৌচাকস্থ মৌমাছিই বালকরূপকে এস্থলে রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ চতুর্দ্দিকে জলদ্বারা বেষ্টিত দ্বারকা নগরে গেলেন অর্থাৎ মৌমাছি পদ্মফুলে যাইয়া পদ্মফুল ও নানাজাতীয় শস্যকণার ফুল হইতে সুমিষ্ট রস সংগ্রহ করিয়া মানবের উপাদেয় সুমিষ্ট রসময় খাদ্যবস্তু বা মধু রূপকে আবৃত লইলেন। দ্বারকার রুক্মিণীকে লক্ষ্মী স্বরূপিনী বলা হয়। এবং লক্ষ্মীকে পদ্মালয়া বলিয়াও কথিত হয়। অতএব খাদ্যস্বরূপিনী রুক্মিণীশক্তিকে পদ্মফুলের মধুস্থ বা নানাজাতি শস্যকণারূপখাদ্যে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। ইংরাজীতে যদিও চন্দ্র বাক্যটি স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয় তথাপিও হিন্দুশাস্ত্রে চন্দ্রকে পুরুষ বলিয়াই বর্ণনা করিয়া রাখিয়াছে। অতএব মধু, ইক্ষুরস ও গোদুগ্ধ প্রভৃতি রসময় খাদ্যবস্তুরূপ চন্দ্রশক্তি, একাধারে খাদ্য ও পানীয় বা প্রকৃতি পুরুষের মিলিতাবস্থা সদৃশ। সেই জন্যই হিন্দুশাস্ত্রে চন্দ্রকে পুরুষ বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। রসঘন স্বরূপ চন্দ্রশক্তি বা ভগ-বানার্থে প্রকৃতি পুরুষের মিলিতাবস্থাকেই বুঝায়। অর্থাৎ একাধারে পুরুষ প্রকৃতির মিলন স্বরূপ। বাইবেলের প্রভু যীশু, বাঙ্গলার বৈষ্ণব গ্রন্থের শ্রীগৌরাঙ্গ, ইহারা একাধারে পুরুষ প্রকৃতির মিলন স্বরূপই ছিলেন। মৃত্তিকার অভ্যন্তরস্থিত চন্দ্রশক্তিতে যে,

অনাসক্ত তাড়িৎ বা বিষ বর্ত্তমান আছে, হিন্দুশাস্ত্রে তাহাকে পাতালের বলিরাজা রূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। ভূগর্ভস্থ চন্দ্রশক্তি হইতে জাত খাদ্যবস্তু মাত্রই ঐ বিষ বা বলিরাজা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া আছে। তাই হিন্দুশাস্ত্রে বলে, বলিরাজা খাদ্যস্বরূপিনী বিষ্ণুর লক্ষ্মীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। পাতালের বা ভূগর্ভস্থ রসময় চন্দ্রশক্তি সদৃশ শ্রীকৃষ্ণ তাই সর্ব্বদার তরে বলির দ্বারে দ্বারী হইয়া আছেন। অন্যদিকে দ্বাপর যুগে হিন্দুশাস্ত্রে ব্যাসদেব কুরুপাণ্ডব বংশকে যে, মানবের কৃষিজাত খাদ্যের সহিত রূপকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন, এখন তাহার যৎকিঞ্চিৎ জানাইতেছি। যুধিষ্ঠরাদি পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে অর্জ্জুনকে নরনারায়ণ বলিয়া কথিত হয়। নারায়ণ শব্দের অর্থ, নার অর্থাৎ জলে অয়ণ বা আশ্রয় যাহার। অতএব বান বা জলশক্তিই এস্থলে অর্জ্জুনশক্তি রূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। দ্রৌপদীকে যজ্ঞভূমি হইতে প্রাপ্ত বলিয়া তাঁহাকে যাজ্ঞসেনী বলা হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যজ্ঞভূমি অর্থে যাহাতে মানুষের খাদ্যস্বরূপ শস্যকণা প্রভৃতি জন্মায়। তাহা হইলে দেখা যায়, দ্রৌপদীও পৃথিবীজাত অর্থাৎ কৃবিজাত খাদ্যবস্তু বা লক্ষ্মীস্বরূপিনী রূপকে আবৃত হইয়া আছেন। যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা বা পঞ্চ ভূতের সমবায়েই দ্রৌপদী অর্থাৎ কৃষিজাত শস্যকণারূপ খাদ্যবস্তু উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাই পৃথিবীজাত শস্যকণারূপ খাদ্যবস্তু সদৃশা দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু মহাভারতে, প্রধাণতঃ মানবের অপর প্রধান কৃষিজাত খাদ্যস্বরূপ পঞ্চপ্রকার ডালকে দ্রৌপদী রূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। অর্থাৎ অড়হর যুধিষ্ঠির, ছোলা ভীম বা বৃকোদর, মুগ অর্জ্জুন, মটর নকুল ও খেসারী সহদেব শক্তি সদৃশ এবং মসুর কর্ণ, কলাই দাসীপুত্র বিতুর শক্তি রূপকে রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। কলাইর ডালই "বিতুরেরখুদ" রূপকে আবৃত হইয়া

রহিয়াছে। অড়হর, ছোলা, মুগ, মটর ও খেসারি শক্তি হইতে আমরা যে পঞ্চপ্রকার খাদ্যস্বরূপ ডাল প্রাপ্ত হইয়া থাকি প্রকৃত প্রস্তাবে উহাই দ্রৌপদী রূপকে রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রে যে বলে, দ্রৌপদী উত্তম ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিতে পারিতেন। এস্থলে ইহাদ্বারাই তাহার ভাবার্থ প্রকাশ করিতেছে। অর্থাৎ হিন্দু আর্য্য জাতির ডালই উত্তম ব্যঞ্জন। এই সমস্ত শস্যকণা বা অন্যান্য কৃষিজাত খাদ্যবস্তু লাভ করিতে হইলে সচরাচর কূপ বা ইঁদারা হইতে জল সিঞ্চন করিয়া উহাদের বৃক্ষলতা সকলকে জীবিত রাখিতে পারিলেই ঐ সকল বৃক্ষলতা হইতে আমরা প্রচুর খাদ্যসম দ্রৌপদী বা শস্যকণা লাভ করিতে সক্ষম হই। মহাভারতে যে, দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের কথা উল্লেখ আছে তাহাতে বলে যে, অর্জ্জুন অধোমুখী হইয়া বানদ্বারা মস্তকোপরিস্থিত ঘূর্ণিত চক্রাকার মৎস্যচক্ষু ভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করিয়া ছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ইদারা হইতে শস্যক্ষেত্রে জল সিঞ্চন করিবার সময় মানুষকে অধোমুখী হইয়াই ইদারাস্থিত চক্রাকার ঘূর্ণিত জলকে রজ্জুসংযুক্ত পাত্রদ্বারা ভেদ করিয়া জল উত্তোলন করিয়া শস্যক্ষেত্রে দিতে হয়। তাহা না হইলে ক্ষেত্রে ভালরূপ শস্য উৎপন্ন হয় না। মৎস্য অর্থে জলকেও বুঝায়। মস্তকোপরিস্থিত চক্রাকার ঘুর্ণীত মৎস্যচক্ষু অর্থে এখানে ইদারাস্থিত জলকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। অতএব ইঁদারা হইতে জল সিঞ্চন করিয়া শস্যকণা লাভ করাই জল সদৃশ অর্জ্জুন বা নরনারায়ণ কর্ত্তৃক মৎসচক্ষু ভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করা রূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন এবং তাঁহার দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি শত পুত্র ছিল। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পর্ব্বত এবং কদলি প্রভৃতি বৃক্ষ প্রথমতঃ অন্ধের ন্যায়ই মাটির ভিতর হইতে উর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকে। এইজন্য উহারা এস্থলে ধৃতরাষ্ট্র রূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। তাই পর্ব্বতের

পাথর হইতে নির্ম্মিত যাঁতাকে দুঃশাসনশক্তি রূপকে এবং কলাকে দুর্য্যোধনশক্তি রূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। দুঃশাসন শব্দের অর্থ, দুঃখে বা অতিকষ্টে শাসন করা যায় যাহাকে। অতএব এই অর্থে জন্মান্ধধৃতরাষ্ট্রস্বরূপ পর্ব্বতের পাথর হইতে জাত যাঁতাকেই দুঃশাসন বলা হইয়াছে। যেহেতু যাঁতা ঘুরাইতে মানুষ অতিকষ্ট অনুভব করিয়া থাকে। অর্থাৎ উহাকে অতি দুঃখে শাসন করিতে হয়। দুঃশাসন কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণের ভাবার্থ এইযে, যাঁতা দ্বারা অড়হর, মুগ, ছোলা প্রভৃতি নানা শস্যকণা হইতে উাহাদের খোঁসা স্বরূপ বস্ত্র ছাড়াইয়া খাদ্যবস্তুতে পরিণত করা বা দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করা। ঐ সকল ডাল বা শস্যকণার খোঁসা ছাড়াইলে উহার ভিতরস্থ খাদ্যবস্তু বা ডাল ঈষৎ লালবর্ণ ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাই মহাভারত বলিতেছে যে, বস্ত্র হরণের সময় দ্রৌপদী ঋতুবতী অবস্থায় ছিলেন। কিন্তু ঐ সকল শস্যকণাকে যাঁতা দিয়া উত্তমরূপে পিষিলেও উহার খোঁসা একেবারে উঠিয়া যায়না অর্থাৎ যাঁতা স্বরূপ দুঃশাসন, শস্যকণা স্বরূপা দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেও তাঁহাকে একেবারে উলঙ্গ করিতে সক্ষম হয় না। ইহারই ভাবার্থে মহাভারতে বলে যে, দুঃশাসন দ্রৌপদীকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করিতে সক্ষম হইয়াছিল না। বিশেষতঃ হস্তদ্বারা যাঁতা ঘুরাইতে ঘুরাইতে বায়ুর সংস্পর্শে উহার বক্ষঃস্থল ক্রমান্বয়ে বিদীর্ণ বা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। এবং এইজন্যই যাঁতার বক্ষঃস্থল লৌহ যন্ত্রদ্বারামাঝে মাঝে কাটিয়া লইতে হয়। যাঁতার বক্ষঃস্থল ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া কার্য্যই এস্থলে পবননন্দন ভীম কর্ত্তৃক দুঃশাসনের বক্ষের রক্তপান করা রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। ভীম, দুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ করিয়াছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কদলি বৃক্ষ বা কলা গাছের মধ্যভাগ, সচরাচর পবন নন্দন ভীম সদৃশ প্রবল ঝড়ে ভাঙ্গিয়া ফেলে। কলাগাছে একবারে বহুফল ফলিয়া থাকে। তাই দুর্য্যোধনের হস্তকে অফুরন্ত ভাণ্ডার বলা হইয়াছে। কলাতে কতক পরিমান অমৃতশক্তি বর্ত্তমান আছে বলিয়া তাহারই ভাবার্থে

মহাভারতে বলে যে, দুর্য্যোধন অতি অল্পসময়ের জন্য স্বর্গে বাস করিয়াছিলেন। এইজন্যই হিন্দুদের প্রায় কোন পূজাপার্ব্বনই কলা ব্যতীত সুসম্পন্ন হয় না। কলাতে এবং নারিকেলে অমরত্ব শক্তি বর্ত্তমান আছে জানিয়াই আর্য্যঋষিগণ, মায়ামুগ্ধ বা স্থূল জীবের জন্য প্রতিমা পূজা, হিন্দু সমাজে প্রচলন করিয়া নারিকেল ও কলা সেবনের বিধান প্রত্যেক হিন্দুর ভিতর রাখিয়া গিয়াছেন। মুশুর ডালকে কর্ণশক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। মুশুর ডাল মাংস সদৃশ। বর্ত্তমান যুগের ডাক্তারগণও এই মত সমর্থন করেন। তাই বাঙ্গলার বৈষ্ণব সম্প্রদায় মুশুর ডাল ভক্ষণ করেন না। শ্রীকৃষ্ণ যে, কর্ণের পুত্র বৃষকেতুর মস্তক, তাহার পিতামাতা দ্বারা ছেদন করাইয়া নরমাংস ভক্ষণ করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহা দ্বিখণ্ডিত মুশুর ডালরূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। অন্যদিকে নারিকেল যুধিষ্ঠির, কাঁঠাল বকোদর বা ভীম, রসাল বা আম অর্জ্জুন, সুপারী কর্ণ, তাল ভীষ্ম সদৃশ রূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। কর্ণ যে, ইন্দ্রকে কবজ খুলিয়া দিয়াছিলেন তাহা সুপারী গাছের খোল ছাড়ানো ভাব রূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। মুসুর ডালের ন্যায় সুপারী ও বৃষকেতুর মাংস বা নর মাংস তুল্য। ভীষ্ম সদৃশ তালফলের ফুল হয়না, এই অর্থে ভীষ্ম দারপরিগ্রহ করেন নাই। কচি তালের শাঁসে জল বর্ত্তমান থাকে তাই ভীষ্মকে গঙ্গা পুত্র বলিয়া কথিত হয়। ভীষ্মের ইচ্ছা মৃত্যু অর্থে তালবৃক্ষের ফল আপন ইচ্ছায় পতিত নাহইলে কেহ শুধু হস্তদ্বারা ছিঁড়িতে সক্ষম হয় না। কিন্তু শিখণ্ডিকে সম্মুখে দেখিলে ভীষ্মের ইচ্ছা মৃত্যুর তাৎপর্য্য এই যে, নপুংসক বাঁশকে শিখণ্ডি রূপকাবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। যেহেতু বাঁশ গাছে কোন ফল হয় নাবিশেষতঃ বাঁশের ঝাড়ের গোড়া অগ্নিদ্বারা পোড়াইয়া দিলেই বাঁশ ভালরূপ জন্মে। তাই বাঁশকে অগ্নিময় বাষ্প সদৃশ পরশুরামের শিষ্য বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে। তালবৃক্ষের সম্মুখে বংশদণ্ড দণ্ডায়মান থাকিলে অতি সহজেই তাল পারিতে সক্ষম হওয়া যায়। ইহাই তাল সদৃশ ভীষ্মের,

বাঁশ সদৃশ শিখণ্ডিকে সম্মুখে দেখিয়া অস্ত্র ত্যাগের ভাব রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। ভীষ্মের শরশয্যার ভাবার্থ এই যে, পাঁকা তাল হইতে তালগোলা বাহির করিবার সময় যে, যন্ত্র বা তাল ঘর্ষণী ব্যবহৃত হয়, ঐ তাল ঘর্ষণীই ভীষ্মের শরশয্যা রূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। তালের আঁটি হইতে তাল গোলা বাহির করিবার সময় উহাকে বান অর্থাৎ জল দ্বারা উত্তমরূপে সিক্ত করিয়া লইতে হয়। ইহাই নরনারায়ণ সদৃশ অর্জ্জুনের বান অর্থাৎ জলদ্বারা ভীষ্মের মৃত্যু কালীন পিপাসা নিবারনের ভাব রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। দুগ্ধের দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে গোদুগ্ধ যুধিষ্ঠির মহিষ দুগ্ধ ভীম, ছাগল দুগ্ধ অর্জ্জুন, হরিণ দুগ্ধ নকুল ও মেষদুগ্ধ সহদেব সদৃশ এবং গর্দ্দভ দুগ্ধ দুর্য্যোধন শক্তি সদৃশ। মহাভারতে বলে, দুর্য্যোধন জন্মিবা মাত্র গর্দ্দভের ন্যায় চিৎকার করিয়াছিলেন। অধিকন্তু গর্দ্দভ দুগ্ধেও কিছু অমৃতশক্তি বর্ত্তমান আছে। বর্ত্তমান যুগের কোন কোন ডাক্তার বলেন যে, গর্দ্দভের দুগ্ধ বসন্ত রোগের প্রতিষেধক ঔষধ। হিন্দুর শীতলা দেবী গর্দ্দভের উপরেই আরোহণ করিয়া আছেন। বাইবেলেও দেখা যায়, দুগ্ধশক্তি সদৃশ প্রভু যীশুখৃষ্ট, শাস্ত্রের বচন পূরণার্থে গর্দ্দভের উপর আরোহণ করিয়া নগর প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। কাক দ্রোণ শক্তি সদৃশ। তাই তাহার নিকট সকলে বান শিক্ষা করিয়াছিল। কাক বিষ্ঠা হইতে উৎপন্ন অশ্বত্থবৃক্ষই অশ্বত্থমা সদৃশ। অশ্বত্থবৃক্ষ অমর এইজন্য অশ্বত্থমাকে অমর বলিয়া কথিত হয়। দ্রোণবৃক্ষকেও দ্রোণশক্তি বলা হয়। এই দ্রোণবৃক্ষকে সম্মুখে রাখিয়া ব্যাধ পুত্র একলব্য সদৃশ বেতের গাছ, বহু উচ্চে উঠিতে সক্ষম হয় বা সকলের চেয়ে বান ছুঁড়িতে পারে। কিন্তু বেত লতার বৃদ্ধ অঙ্গুলি সদৃশ উহার ডগা কাটিয়া ফেলিলেউহা আর উর্দ্ধে উঠিতে সক্ষম হয় না। ইহাই মহাভারতে বর্ণিত একলব্যের দ্রোণের মূর্ত্তি সম্মুখে রাখিয়া বান শিক্ষা করাএবং বৃদ্ধাঙ্গুলি কাটিয়া গুরুদক্ষিণা দেওয়া রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। মনুষ্যকৃত নপুংসক ঘোড়া ভীষ্ম

শক্তি সদৃশ এবং উট কর্ণ শক্তি সদৃশ।

পূর্ব্বে দ্বাপর যুগের অবতার বলরামকে বলদশক্তি ও কৃষ্ণকে এঁড়ে বা ষাঁড়শক্তি এবং তাঁহাদের ভগ্নী সুভদ্রাকে গাভীশক্তি বলিয়া বর্ণণা করিয়াছি। আর সুভদ্রার গর্ভজাত পুত্র অভিমন্যুকে চন্দ্রশক্তি বা গোদুগ্ধশক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি। মহাভারতে সুভদ্রার স্বামী অর্জ্জুনকে নরনারায়ণ বা জল অর্থাৎ পানীয় শক্তি রূপকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। হিন্দুর পুরীক্ষেত্রে রথ যাত্রার সময় দেখা যায়, বলরাম, সুভদ্রা ও জগবন্ধু (শ্রীকৃষ্ণ) রথে চড়িয়া যাওয়ার সময় পুরীর পাণ্ডাগণ, বলরাম ও জগবন্ধুর গাভীশক্তি সদৃশা ভগ্নী সুভদ্রার সহিত অবৈধ প্রণয়ের কথা উল্লেখ করিয়া কত প্রকার নিন্দা ভৎর্সনা করিয়া থাকে। অর্থাৎ বলরামও জগবন্ধুকে ভগ্নীর স্বামী বলিয়া গাল দিয়া থাকে। ঐসকল ভাব হইতে বেশ বুঝা যায় যে, নরনারায়ণ বা পানীয় শক্তিরূপ অর্জ্জুনের ঔরসে ও গাভীশক্তি সদৃশা সুভদ্রার চন্দ্রশক্তি হইতে জাত অভিমন্যু তাঁহাদের সন্তান হইলেও অর্জ্জুন এস্থলে গোশক্তি এবং অভিমন্যু গোবৎসশক্তি সদৃশ নহে। আবার বলরাম, সুভদ্রা ও জগবন্ধু বোলতা মৌমাছি রূপকেও আবৃত হইয়া আছেন। সে যাহাই হউক, এস্থলে গোশক্তিরূপ সুভদ্রার খাদ্যবস্তুরূপ চন্দ্রশক্তি ও পানীয় শক্তিরূপ অর্জ্জুন হইতে উৎপন্ন গোদুগ্ধশক্তিই প্রকৃত অভিমন্যু শক্তিরূপকে আবৃত হইয়া আছে। ঐ দুগ্ধশক্তিরূপ অভিমন্যু গোমাতার পালানরূপ বূহে অতি সহজেই প্রবেশ করিতে পারে কিন্তু পালানস্থ চারিটি সছিদ্র বাঁট নিম্নমুখী হইয়া সংলগ্ন থাকা সত্ত্বেও ঐ রসময় গোদুগ্ধ নিজের ইচ্ছায় উহা হইতে পতিত হয় না বা বাহির হইতে পারে না। অর্থাৎ গোদুগ্ধশক্তিরূপ অভিমন্যু গোমাতার পালানরূপ ব্যূহে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় কিন্তু উহা হইতে নিজ ইচ্ছায় বাহির হইতে পারে না বা বাহির হইবার পথ জানে না। তারপর গাভী দোহন করিবার সময় মানুষ সচরাচর দুই হস্তস্থিত প্রত্যেক হস্তের তিন অ

দ্বারা গাভীর দুইটি বাঁট আকর্ষণ করিয়া কিম্বা গোবৎস মুখদ্বারা আকর্ষণ করিয়া গোদুগ্ধরূপ অভিমন্যুকে গোমাতার পালান সদৃশ ব্যূহ হইতে বাহির করিয়া লইতে সক্ষম হয় বা গোমাতার চন্দ্রশক্তিরূপ অভিমন্যুকে নিহত করে। মানুষের দুই হস্তস্থিত হয় আঙ্গুলিও গোবৎই সপ্তরথী একত্র হইয়া গোমাতার পালানরূপ ব্যূহস্থিত চন্দ্রশক্তি সদৃশ গোদুগ্ধরূপ অভিমন্যুকে বাহির করিয়া লওয়া বা গোমাতাকে দোহন করার ভাব, অভিমন্যুর ব্যূহের ভিতর সপ্তরথী কর্ত্তৃক নিহত হওয়ার ভাবের সহিত সামঞ্জস্য হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু যতক্ষণ ঐ চন্দ্রশক্তিরূপ দুগ্ধ গোমাতার পালানরূপ ব্যূহে অবস্থিতি করে ততক্ষণই উহাকে চন্দ্রশক্তিরূপ অভিমন্যু বলিয়া কথিত হয়। তারপর ঐ দুগ্ধ মানুষ বাহির করিয়া লইলেই উহা অভিমন্যুর পুত্র রাজা পরীক্ষিত নামে পরিচিত হন। গোমাতার পালান হইতে দুগ্ধ বাহির করিয়া লইলে গোমাতার পালানস্থ বাঁটগুলি, সাধারণতঃ সর্পের ন্যায় পালানের গলদেশে ঝুলিতে থাকে। গোমাতার পালানকে আবার হিন্দুশাস্ত্রে সৌমিকমুনিরূপে রূপকাবৃত করিয়া রাখিয়াছে। যেহেতু সোমশব্দঞিক প্রত্যয় করিলে সৌমিকপদ সিদ্ধ হয় অর্থাৎ সোম (চন্দ্র) বিদ্যমান থাকে যাহাতে বা যে বস্তুতে। তাহাকেই সৌমিক বলা হয়। গোমাতার পালানে গোদুগ্ধরূপ সোমরস বা চন্দ্রশক্তি বিদ্যমান থাকে। এই অর্থেই গোমাতার পালানকে সৌমিকমুনি রূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। এস্থলে আবার গোবৎসকে সৌমিকমুণির পুত্র বালক শৃঙ্গীমুনি রূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের দন্ত ও গোবৎসই যে, ব্রাহ্মণ ইহা আমি আপনাদিগকে পরে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। সে যাহা হউক, গোবৎস সদৃশ বালক শৃঙ্গীমুনি, গোমাতার পালানে দুগ্ধ না পাইয়া এবং পালান সদৃশ সৌমিকমুনির গলদেশে বাঁটগুলিকে সর্পের ন্যায় ঝুলিতে দেখিয়া ক্রোধে গোদুগ্ধরূপ পরীক্ষিতকে এই বলিয়া অভিশাপ করিলেন

যে, তক্ষকের বিষে যেন সপ্তাহ মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহাই দুগ্ধরূপ পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ। হিন্দুশাস্ত্রে বলে, রাজা পরীক্ষিত ব্রহ্মশাপগ্রস্থ হইলে পর, ভাদ্রমাসে কুলগাছে যে কুলফল ফলে সেই ভাদ্দ'রে টককুল নিজের মস্তকে স্থাপন করাতে তক্ষকের বিষ তাঁহার দেহে প্রবেশ করে এবং এইরূপে পরীক্ষিতের মৃত্যু হয়। তারপর পরীক্ষিতের পুত্র রাজা জন্মেজয়, সর্পযজ্ঞ করিয়া জগতের সর্পগণকে (বিষকে) ধ্বংশ করিতে থাকেন। কিন্তু বাসুকী, জরৎকারুর পুত্র আস্তিক মুনি দ্বারা জন্মেজয়ের নিকট হইতে তক্ষক ও জগতের অবশিষ্ট নাগগণকে রক্ষা করেন। উপরোক্ত ঘটনা সকলের তাৎপর্য্য এই যে, দুগ্ধরূপ রাজা পরীক্ষিত, টকরসযুক্ত ভাদ্দরে কুলের বিষে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে পর বা দুগ্ধ দধিতে পরিণত হইলে, তাহা হইতে উৎপন্ন মাখন শক্তিরূপ রাজা জন্মেজয়ই সর্পযজ্ঞ করে। অর্থাৎ জগতের বিষ সকল ভক্ষণ করিতে সক্ষম হয় বা জগতের মৃত্যুকে যে, নষ্ট করিয়া থাকে, এস্থলে তাহাই প্রকাশ করিতেছে। অতএব রামায়ণে বর্ণিত রামের চরণ স্পর্শে পাষাণ মানব হওয়া এবং মহাভারতে বর্ণিত রাজা পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ ও জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ প্রভৃতি কার্য্য একইরূপে আলঙ্কারিকভাবে মৃতকে জীবিত করার ভাব সকল বৈজ্ঞানিকভাবে হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত রহিয়াছে। মহাভারতে ব্যাসদেব বর্ণিত পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ ও জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ প্রভৃতি উপাখ্যান হইতেও স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, দুগ্ধস্থ মাখনের প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা মৃতকে জীবিত করা যায় এবং মানুষ উহাদ্বারা অতি সহজে অমরত্ব লাভ করিতে সক্ষম হয়। হিন্দুশাস্ত্রে মহাভারতকে পঞ্চবেদ বলিয়া কথিত হয়। ইহারই ভাবার্থে যুধিষ্ঠির গোদুগ্ধশক্তি, ভীম মহিষ দুগ্ধশক্তি, অর্জ্জুন ছাগদুগ্ধশক্তি, নকুল হরিণদুগ্ধশক্তি ও সহদেব মেষদুগ্ধশক্তিরূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে বলে যে, ব্যাসদেব মহাভারত প্রণয়ণ করিয়া হিন্দুদের সমস্ত ধর্ম্ম শাস্ত্রের সহিত

তুলাদণ্ডে পরিমাণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, এক মহাভারতই সকলের সমষ্টির চেয়েও ওজনে ভারী হইয়াছে। ইহার বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে, মহাভারতে ব্যাসদেব, জগতের যত প্রকার খাদ্যবস্তুকে যেরূপ মানুষরূপকে আবৃত করিয়া যাহার যেরূপ ক্ষমতা তাহা ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছেন, হিন্দুদের সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থেও তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না।

মহাভারতে বলে, কুন্তী যখন কুমারী ছিলেন তখন সূর্য্যের ঔরষে কুন্তীর এক পুত্র সন্তান হয়। ঐ সন্তান, কর্ণদ্বারা প্রসব করাতে কর্ণ নামে পরিচিত হন। কুন্তী ঐ সন্তানকে লোকনিন্দা ভয়ে এক তাম্রপাত্রে পুরিয়া ত্যাগ করেন। অধিরথসূতনামা এক ব্যক্তি কর্ণকে লালন পালন করাতে কর্ণ সূত পুত্র বলিয়া কথিত হন। আমি পূর্ব্বে মুসুর ডালকে কর্ণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছি। মুসুর ডালের গায়ের উপরের খোঁসা তাম্রবর্ণই দৃষ্ট হইয়া থাকে। কর্ণ ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়া, পরশুরামের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিতে যান। একদিন পরশুরাম, কর্ণের উরুদেশে কীটের দংশন জনিত রক্তচিহ্ন এবং অস্বাভাবিক সহিষ্ণু দেখিয়া অব্রাহ্মণজ্ঞানে অভিশপ্ত করিয়া তাড়াইয়া দেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, রক্তবর্ণবিশিষ্ট ও নরমাংস সদৃশ মুসুর ডালকে আর্য্যজাতি খাদ্যস্বরূপ ব্রহ্মবস্তু বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বরং দ্রৌপদীর সয়ম্বর সভায়, অড়হর, ছোলা প্রভৃতি পঞ্চ প্রকার ডাল সদৃশ যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা, ব্রহ্মবস্তু বা ব্রাহ্মণরূপেই গৃহীত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে ছোলাকে বৃকোদর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। বৃক অর্থাৎ বেঙ্গের ন্যায় উদর যাহার তাহাকেই বৃকোদর বলা হয়। ছোলাকে দেখিতে ক্ষুদ্র বেঙ্গের ন্যায়ই দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বে নর নারায়ণরূপ অর্জ্জুনকে আম এবং ভীমকে কাঁঠাল সদৃশ বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছি। আবার অন্যদিকে রাজা উত্তানপাদের ঔরসে সুনীতির গর্ভজাত পুত্র ধ্রুব আমশক্তি ও সুরুচীর গর্ভজাত পুত্র উত্তম ও কাঁঠালরূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছেন। সচরাচর আম, বৃক্ষের অতি উচ্চ ডালে এবং কাঁঠাল, বৃক্ষের গোড়ায় বা কোলেতেই ফলিয়া থাকে। এই অর্থেও

ধ্রুব আমশক্তি সদৃশ ও উত্তম কাঁটালশক্তি সদৃশ এবং যেমন ত্রেতায় লক্ষণ বনে গমন করিয়া ইক্ষুদণ্ডে পরিণত হইয়াছিলেন তদ্রূপ রামও বনে গমন করিয়া রসাল বা অমৃত ফলে পরিণত হইয়াছিলেন। আমি পূর্ব্বে রুহি অর্থে গোজাতি এবং রুহিদাস অর্থে গোদুগ্ধকে ব্যাখ্যা করিয়াছি। এবং গোদুগ্ধকেই পীতাম্বর বা পীতবসনধারী বিষ্ণু বা হরি বলিয়া ও ব্যাখ্যা করিয়াছি। এই গোদুগ্ধরূপ বিষ্ণুকে যিনি বিশেষরূপ জানেন শাস্ত্রে তাহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া কথিত হয়। গোদুগ্ধস্থ খাদ্যশক্তিরূপ প্রধানা গোপী বা শ্রীরাধাই গোদুগ্ধস্থ পানীয় শক্তিরূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত প্রাণে প্রাণে মিসিয়া আছে। তাই গোদুগ্ধস্থ খাদ্যশক্তিরূপ প্রধানা গোপীই বিষ্ণুকে বিশেষরূপে জানেন অতএব তিনিই পরম বৈষ্ণব। এইরূপে দুগ্ধস্থ খাদ্যশক্তিরূপ দুর্গা বা ভগবতীকেও পরম বৈষ্ণব বলিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। সাত্ত্বিক খাদ্যবস্তুরূপ দুগ্ধ বা দুগ্ধস্থ খাদ্যবস্তু গ্রহণে এবং উচ্চ নাম কীর্ত্তণে মানব দেহে অতি সহজে প্রাণায়ামের কার্য্য সিদ্ধ হয়। মানব দেহে প্রাণায়ামের কার্য্যের স্তরানুযায়ী, সাধক স্বর্গে দশবিধ শব্দব্রহ্ম শুনিতে পান। ঐ দশবিধ শব্দের ভিতর ঘন্টাধ্বনিও একটি। মোসলমানদের কোরআনশরিফে বলে, হজরত মোহাম্মদ স্বর্গে ঘন্টাধ্বনি শ্রবণ করিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়া যে সকল পবিত্র বাক্য প্রকাশ করিতেন, তাহাই পবিত্র কোর-আন রূপে বর্ণিত রহিয়াছে। এবং সেই জন্যই কোর-আন শরিফ, স্বর্গ হইতে নাজেল বা অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া কথিত হয়। সে যাহা হউক, ঐ দশবিধশব্দব্রহ্ম সম্বন্ধে পরে আপনাদিগকে জানাইব। মহাভারতে বলে, রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন করিয়া স্বর্গে ঘন্টাধ্বনি শুনিতে না পাইয়া শ্রীকৃষ্ণের আদেশে পরম বৈষ্ণব মুচিবংশজাত রুহিদাসকে সেবন করাইয়া স্বর্গে ঘন্টাধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ অর্থে যে কৃষিজাত ভক্ষ্যবস্তুকে সেবন নির্দ্দেশ করে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব উত্তম ব্যঞ্জন সদৃশা দ্রৌপদীরূপ কৃষিজাত

ভক্ষ্যবস্তু সেবন করিলে প্রাণায়ামের কার্য্য সিদ্ধ হয় না এবং স্বর্গে ঘণ্টাধ্বনিও শ্রুত হয় না। কিন্তু পরম বৈষ্ণব রুহিদাসরূপ গোদুগ্ধ সেবন করিলে সাধক, সাধনেরস্তরানুযায়ী স্বর্গে ঘণ্টাধ্বনি প্রভৃতি দশ বিধ শব্দ ব্রহ্ম শুনিতে পান। গোদুগ্ধ, গোমাতার পালানরূপ চর্ম্ম হইতে পাওয়া যায় বলিয়া উহাকে মুচি বংশজাত রুহিদাসরূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। হিন্দুমতে গাভীর পুঁচ্ছ ধারণ করিয়া বৈতরণী নদী পার হওরার ভাবার্থ এই যে, গব্যরস দ্বারা বৈতরণীরূপ নরক যন্ত্রণা বা মৃত্যুকে জয় করা যায়। হিন্দুশাস্ত্র বলে, এই জগতে ব্রহ্মা (প্রজাপতি বা পতঙ্গজাতি) দ্বারাই প্রথম সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। বৈজ্ঞানিকগণও বলেন, পতঙ্গজাতির বৃক্ষের ফুল হইতে ফুলান্তরে গমনাগমন কালে এক ফুলের রেণুর সহিত অন্য ফুলের রেণুর সংযোগ হওয়ায় বৃক্ষের ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। হিন্দুশাস্ত্রে বলে, বিষ্ণু বা ভগবান বামনরূপে বলির দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন। পতঙ্গজাতিকেই অর্থাৎ বোল্‌তা মৌমাছি সদৃশ (বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ) বামন (ক্ষুদ্রকায়) অবতার এবং ভূগর্ভস্থ বিষাক্ত চন্দ্রশক্তিকেই পাতালের বলিরাজরূপে রূপকাবৃত করিয়া রাখিয়াছে। প্রজাপতির পাখাই বামন অবতারের "ছাতা" এবং প্রজাপতি বা ভ্রমরের মধু সংগ্রহকারী হুলই নাভি মূলস্থ তৃতীয় পদরূপে রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। যেহেতু পতঙ্গ জাতির চারিটি পায়ের ভিতর সম্মুখের দুইখানা পদ, হস্ত সদৃশ এবং হুলই নাভিমুলস্থ তৃতীয় পদ এবং অতি উচ্চ, মধ্য ও অতি নিম্ন স্থানইএস্থলে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালরূপে রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। সর্ব্বপ্রথম ভূগর্ভস্থ বিষাক্ত চন্দ্রশক্তিরূপ বলিরাজ, জগতকে নানাজাতি বৃক্ষলতাদি ও পুষ্প প্রভৃতি দান করিয়া মনে মনে অত্যন্ত গর্ব্ব করিতে লাগিল যে, তাহার মত দানবীর আর কেহ নাই। তাই যখন প্রজাপতিরূপ বামন, বলিরাজকে তাঁহার মুখের ভিতরস্থ হুল বা নাভিমূলস্থ তৃতীয় পদ রাখিবার স্থান চাহিলেন, তখন বলি উপায় অন্তর না

দেখিয়া মস্তকে সেই পদের স্থান দিলেন। অর্থাৎ প্রজাপতিরূপ বামনের মধু সংগ্রহকারী হুল বা নাভিমূলস্থ তৃতীয় পদ, পুষ্পের মস্তকে রাখিয়া পুষ্পের ভিতরস্থ মধু বা মৃত্তিকাভ্যন্তরিস্থিত বলিরাজ স্বরূপ অনাসক্ত তাড়িতে আক্রান্ত চন্দ্রশক্তিকে আকর্ষণ করিয়া লইতে সক্ষম হইল।

জগতে শীত ঋতুর পর বসন্তের প্রারম্ভেই সচরাচর প্রায় জীবজন্তু এবং বৃক্ষলতা প্রভৃতি ও কামাসক্ত হইয়া পড়ে। এই সময়ে স্ত্রীজাতীয় জীবজন্তু প্রায় অধিকাংশ স্থলেই ঋতুবতী হইয়া পুরুষের সহিত মিলিত হইবার জন্য আকেঙ্খা করিয়া থাকে। বিশেষতঃ দুগ্ধবতী প্রাণীগণও এই সময়ে অধিকাংশস্থলে ঋতুবতী হইয়া সঙ্গম করিয়া থাকে। এবং জগতের বৃক্ষলতাও এই সময়ে মুঞ্জরিত হইয়া থাকে। তাই প্রায় অধিকাংশ বৃক্ষলতাই এই সময়ে ফুল ধারণ করে। এই জন্য হিন্দুশাস্ত্রে বসন্ত কালকে মধু ঋতু বা মধু মাস বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। যেহেতু এই সময়ে জগতের প্রায় জীবজন্তুই মধুরে বা মধুর রসে মত্ত হয় অর্থাৎ সঙ্গমের জন্য লালায়িত হয়। বসন্তকালে শ্রীকৃষ্ণ সদৃশ মৌমাছি, নানাজাতি বৃক্ষলতার ফুল হইতে ফুলান্তরে গমনাগমন করিয়া গায়ে ফুলের রেণু মাখিয়া থাকে। হিন্দুর ফাল্গুন, চৈত্র মাসে যে, দোল লীলা বর্ত্তমান রহিয়াছে, উহা ঋতুবতী স্ত্রী জীবজন্তুর সহিত পুরুষ জাতীয় জীবজন্তুর সঙ্গম বা মৌমাছি সদৃশ শ্রীকৃষ্ণের প্রস্ফুটিত ফুল হইতে ফুলান্তরে গমনাগমন কালে ফুলের রেণু মাখিয়া দেহ লালবর্ণ ধারণ করাই, ঐ দোল লীলারূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে।

বোল্‌তা, মৌমাছি সদৃশ বলরাম ও জগবন্ধু, বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে নানাজাতি ফুল হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া সচরাচর বর্ষা সমাগমে বৃক্ষের শাখায় মৌচক্র নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে উঠে বা বাস করে। ইহাই পুরী ক্ষেত্রের বোল্‌তা মৌমাছি সদৃশ বলরাম, সুভদ্রাও জগবন্ধুর আষাঢ়, শ্রাবণ মাসে রথে উঠারূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। এবং ইহাই বামনরূপে রথারোহণরূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে।

পুরীক্ষেত্রের বলরাম, সুভদ্রাও জগবন্ধুর মুখের দিক বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই বেশ বুঝা যায় যে, উহা বোল্‌তা, মৌমাছির মুখেরই অনুরূপ। এইজন্য বলরাম, সুভদ্রাও জগবন্ধুর মুখ প্রায়ই মানুষের মুখের ন্যায় দৃষ্ট হয় না। বর্ষাকালে মৌমাছি সদৃশ শ্রীকৃষ্ণ গাছের ডালে মৌচক্র নির্ম্মাণ করিয়া নিম্নদিকে ঝুলিতে থাকে। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন যাত্রারূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে।

হিন্দুশাস্ত্রে বলে, শ্রীকৃষ্ণ মধুপুরে বা মথুরাতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মৌচক্র মধুপুর সদৃশ। সচরাচর কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে মৌচক্রে রসঘনস্বরূপ মধু সঞ্চয় হইতে আরম্ভ হয় বা শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করে। পরে আমাবস্যা তিথিতে ঐ মধু মৌমাছিগণ প্রায় সম্পূর্ণ আহার করিয়া ফেলে। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমীরূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। আবার বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ যে, অক্রূরের রথে উঠিয়া মথুরাতে গিয়াছিলেন, ঐ অক্রূরের রথ, জাতি মাছির চাকের সহিত রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। কারণ জাতি মাছি সচরাচর মানুষকে হুল ফুটায় না তাই তাহাকে অক্রূর বলা হইয়াছে। কিন্তু পুরীক্ষেত্রে মন্দিরের ভিতর যে সময় বলরাম, সুভদ্রা ও জগবন্ধু থাকেন তখন উহা দ্বারকা লীলাস্বরূপ বা লক্ষী-স্বরূপিণী রুক্মিণীর সহিত বাস নির্দ্দেশ করে। তারপর রথে আরোহণ করিয়া যাওয়াই ব্রজ লীলাস্বরূপ। এইজন্যই ফিরে রথে বলরাম ও জগবন্ধু পুরীর মন্দিরে আসিলে, লক্ষী স্বরূপিণী রুক্মিণী তাঁহাদের উপরে রাগান্বিতা হইয়া পুরীক্ষেত্রের নিত্য রন্ধন শালার সমস্ত জিনিব পত্র ভাঙ্গিয়া ফেলেন বলিয়া পুরীর পাণ্ডাগণ প্রকাশ করেন। শীতের শেষে বা বসন্তের প্রথমাবস্থায় গোজাতি সঙ্গম করিয়া গর্ভবতী হইলে সচরাচর নয় দশমাস পরে কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসেই বৎস প্রসব করে। এবং ঐ সময় হইতেই আমরা সচরাচর গোজাতি হইতে দুগ্ধ প্রাপ্ত হইয়া থাকি। ঐ সময়ে দুগ্ধকে মন্থন করিয়া মাখন উৎপন্ন করাই শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ মাসে

অনুষ্ঠিত হওয়া রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে বলে, ব্যাসদেব হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ণ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, মদ্‌পুত্র শুকদেব ভিন্ন জগতের অন্য কেহ আমার এই সকল গ্রন্থের প্রকৃত ভাবার্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে না।

সে যাহা হউক, জগতে খাদ্যবস্তুর ভিতর দুগ্ধবতী প্রাণিগণের দুগ্ধ ও মৌচক্রস্থ মধুই মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্যবস্তু। এবং দুগ্ধ ও মধুই জগতের খাদ্যবস্তুর ভিতর প্রকৃত অহিংস খাদ্যবস্তু। জগতের প্রায় সমস্ত নারীরূপিণী খাদ্যবস্তুরই মূর্ত্তি বিদ্যমান আছে। কিন্তু রসময় খাদ্যবস্তু দুগ্ধ এবং মধু প্রভৃতির কোনও নির্দ্দিষ্ট আকার নাই। কারণ তরলবস্তু মাত্রই যখন যে পাত্রে থাকে তাহার আকার ধারণ করে। অতএব এই হিসাবে দুগ্ধ ও মধু নিরকার খাদ্য বস্তু। দুগ্ধবতী প্রাণিগণের পালানাস্থ সন্তান উপভোগ্য দুগ্ধ ও মৌচক্রস্থ মৌমাছিগণের উপভোগ্য মধুই প্রকৃত মানবের পক্ষে হিন্দুর বৈষ্ণব গ্রন্থে বর্ণিত "পরকিয়ারস"। এইজন্যই বৈষ্ণব গ্রন্থে বলে,

"পরকিয়াভাবে হয় রসের উল্লাস,
ব্রজ বিনা নাহি তার অন্যত্র বাস।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গোদুগ্ধ ও মধু সেবনে মানবের রসনার যত আনন্দ বা উল্লাস হয়, জগতের অন্য কোন খাদ্যবস্তু দ্বারাই তাহা হয় না। এবং রসময় গোদুগ্ধ ও মধুর কার্য্য কলাপ সকল শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলারূপেই রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। মুসলমানের পবিত্র কোর্‌-আনে বর্ণিত সুরা "বক্‌রায়" (গাভীতে) ও সুরা "নহলে" (মধুমক্ষিকায়) গোদুগ্ধ ও মধু সম্বন্ধে যে সকল পবিত্র বাণী অবতীর্ণ হইয়াছে তাহাতেও গোদুগ্ধের ও মধুর উপকারিতা সম্বন্ধে আল্লাহ যে, নানা প্রকার নিদর্শন সকল প্রদান করিয়াছেন, তাহা পরে আপনাদিগকে জানাইব। তবে এস্থলে বলা উচিৎ যে, যেমন আমি পূর্ব্বে জম্‌জম্‌ কূপের পানি বা জল, দুগ্ধবতী প্রাণিগণের

দুগ্ধরূপে রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি, তদ্রূপ মৌচক্র ও যে, হিন্দুর গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের ন্যায় মুসলমানদের মক্কাস্থ পবিত্র কাবাগৃহরূপে রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে তাহা সুনিশ্চিত। আমার এই কথা সত্য কিনা তাহা অনুভব করাইবার জন্য আমার প্রিয় মণীষী মুসলমান ভগ্নী ও ভ্রাতাগণকে নিম্নলিখিত ঘটনা সকলের বিষয়গুলি বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। যথা মুসলমান শাস্ত্রে বলে,—"কা'বা শব্দের অর্থ প্রায় চতুষ্কোন বিশিষ্ট উচ্চস্থান। কা'বা গৃহ মোছলেম জগতে 'বায়তুল্লাহ' (ঈশ্বরালয়) বা 'মাছ্‌জেদুলহারম্‌' (পবিত্র ভজনালয়) নামে মহাসম্মানিত।" মক্কার কা'বা গৃহ ও প্রস্তর নির্ম্মিত এবং প্রায় সমচতুস্পর্শ বিশিষ্ট। অর্থাৎ মৌচক্র সদৃশ। "কা'বার বহির্ভাগ সুবর্ণ খচিত রেশমী উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ পরদা দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই পরদা লক্ষাধিক মুদ্রাব্যয়ে মিসরের রাজস্ব হইতে মিসরে প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং প্রত্যেক বৎসর ১০ই জেলহজ্জ্‌ অতি সমারোহের সহিত পুরাতন পরদা স্থানান্তরিত করিয়া নূতন পরদা সংলগ্ন করা হয়।" আপনারা বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, মৌচক্রের বহির্ভাগও এইরূপ সুবর্ণ খচিত রেশমী উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ পরদা দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়। কা'বার এই পরদা মিসর হইতে আসে বলিয়া উল্লেখ রহিয়াছে। পূর্ব্বে বলিয়াছি শাস্ত্রে মিসর দেশ, কৃষিজাত শস্যকণারূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। মৌমাছিগণ ও কৃষিজাত নানা শস্যের ফুল হইতেই মধু সংগ্রহ করিয়া মৌচক্রে আসিয়া বসিলেই মৌচক্র ঐরূপ সুবর্ণ খচিত রেশমী উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ পরদার ন্যায়ই দৃষ্ট হয়। "পবিত্র কা'বা গৃহের উপর দিয়া কপোত বা অন্য কোন পাখী উড়িয়া যায় না।" মৌচক্রের উপর দিয়াও কোন পাখী উড়িয়া যাইতে সক্ষম হয় না। তাহা হইলে মৌমাছিগণ তাহার মহা বিপদ ঘটাইয়া থাকে। "এই পবিত্র

ভুমিতে হিংসাদ্বেষ, কলহ বিবাদ ও পাপাচারাদিনাই, সর্ব্বত্রই শান্তি ও প্রীতি বিরাজ মান।” সাধারণতঃ মৌচক্রেও এই সকল ভাব মৌমাছিগণের ভিতর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

“হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার ১০।১২ বৎসর বয়ঃক্রম কালে কা’বা গৃহ অগ্নি সংযোগে ভষ্মীভূত হইয়া যায়।” সচরাচর মৌচক্র হইতে মধু সংগ্রহ করিবার সময় মৌচক্রকেও মানুষ অগ্নি সংযোগে মৌমাছি তাড়াইয়া মধু সংগ্রহ করিয়া থাকে। এবং এইরূপ হিন্দুর মৌচক্ররূপ গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ও জরাসন্ধ দ্বারা চতুর্দ্দিকে অগ্নিতে পরিবেষ্টিত হইয়াছিল। মুসলমান শাস্ত্রে বলে, “এক সময় রোম সম্রাটের অধীন য়ামানের শাসনকর্ত্তা আবরাহা-অশ্‌রাম, এক বিরাট সেনাবাহিনীসহ সুসজ্জিত গজপৃষ্ঠে আরোহন করিয়া মক্কার পবিত্র কা’বা গৃহ দখল করিতে আসিয়াছিলেন। সেই সময় নিঃসহায় নিসম্বল মক্কাবাসিগণ এ ঘোর বিপদবার্ত্তা শুনিয়া হতাশ হইয়া পড়িল। তাহারা ঈশ্বর আলয় রক্ষার ভার ঈশ্বরের হস্তে ন্যস্ত করিয়া ভয়-বিহ্বলচিত্তে আপন আপন স্ত্রীপরিজনসহ নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতোপরি আশ্রয় লইল। অতঃপর শত্রুপক্ষের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া ‘সুরাফিলে’ বলা হইয়াছে, —“[হেনবি,] তোমার প্রতিপালক আল্লহু্ হস্তি-যূথের অধিপতি [কা’বা আক্রমনকারী আবরাহা] র প্রতি কি করিয়াছিলেন, তুমি কি জান না? তিনি কি তাহাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করেন নাই ? এবং তাহাদের উপর কি দলে দলে বিহঙ্গ প্রেরণ করেন নাই? [সেই বিহঙ্গদল] তাহাদের প্রতি কর্দ্দম জাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়াছিল। তৎপরে তিনি তাহাদিগকে পশু ভক্ষিত তৃণের ন্যায় [নিস্পিষ্ট ও ভূতলশায়ী] করিয়াছিলেন।” এই কর্দ্দমজাত প্রস্তর সমূহ সৈন্যদের দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করতঃ তাহাদিগকে সমূলে নির্ম্মূল করে। আব্‌রাহা পলায়ণ-পর হইয়া সানা নগরে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং অনতিবিলম্বে

মৃত্যুমুখে পতিত হয়। আব্‌রাহার কা'বা আক্রমন ও তাহার শোচনীয় পরিণাম জগতের ইতিহাসে এক অলৌকিক ব্যাপার এবং অভূতপূর্ব্বদৃশ্য। ফরাসী ঐতিহাসিক এফ্, ডি, পার্সিভাল এই ঘটনা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি বলেন যে, বসন্ত বা অন্য কোন সংক্রামক রোগ দ্বারা এই অলৌকিক পরাজয় সংঘটিত হইয়াছিল।" এখন আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন, ফরাসী ঐতিহাসিক যাহাই বলুক না কেন? মৌচাক সদৃশ কা'বা গৃহ আব্‌রাহাম দখল করিতে আসিলে, আল্লার হুকুমে দলে দলে মৌমাছিগণ, বিষাক্ত হুলদ্বারা ঐরোমীয় সৈন্যগণকে কর্দ্দমজাত প্রস্তর দ্বারা অর্থাৎ উহাদের হুলস্থ বিষে জর্জ্জরিত করিয়া যে নিহত করিয়াছিল, এস্থলে তাহাই প্রমাণ করিতেছে কিনা? যেমন কর্ম্মঠ, মিতব্যয়ী ও প্রীতিপূর্ণ মৌমাছিগণ সর্ব্বজনীন্ একতায় ও সাম্য ভ্রাতৃভাবে জগতের নানা মিষ্টরস হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া মৌচক্রে মধু পূর্ণ করিয়া সকলে মিলিয়া অতি প্রীতির সহিত ভোজন করে তদ্রূপ আল্লার আদেশে কর্ম্মঠ, মিতব্যয়ী, অল্পে প্রীতিপূর্ণ মোছলেমগণও সর্ব্বজনীন একতায় ও সাম্য ভ্রাতৃভাবে বৎসরে একবার মক্কায় যাইয়া পবিত্র কা'বা গৃহে প্রীতিমিলনস্বরূপে ঈশ্বর উপাসনা বা হজ্জ্‌ব্রত পালন করিয়া থাকেন।

বোল্‌তার চাক্ বা মৌচক্রই হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণরূপ বিষ্ণুর সুদর্শন চক্ররূপে রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। আমি পূর্ব্বে দক্ষযজ্ঞ বর্ণনের সময় বলিয়াছি সতীর মৃতদেহরূপ দুগ্ধস্থ ছানা, মাখন, বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রদ্বারা একান্ন খণ্ডরূপে বিভক্ত হওয়াই একান্ন পিঠ্ নামে হিন্দুশাস্ত্রে প্রচারিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার ভাবার্থ এই যে, বিষ্ণুর সুদর্শন চক্ররূপ মৌচাকস্থ মধুর সহিত দুগ্ধস্থ ছানা মাখন যোগে একান্ন প্রকার সুমিষ্ট খাদ্যবস্তু প্রস্তুত হওয়াই নির্দ্দেশ করিতেছে। মুসলমানদের কা'বা গৃহের দেয়ালে স্থাপিত "হাজ্জারে-আছ্‌ওয়াদ" বা কৃষ্ণপাথর, দুগ্ধবতী

প্রাণিগণের স্তন বা পালানরূপে রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে।

এইজন্য হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা, এই পবিত্র প্রস্তরখণ্ডকে, বিভু প্রেমে উন্মত্ত হইয়া চুম্বন করিয়াছেন। হজরত রছুল উল্লার অনুকরণে মোসলেমগণও হজ্জের সময় এই পবিত্র প্রস্তরকে চুম্বন বা স্পর্শণ করিয়া থাকেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে বর্ণিত দুগ্ধবতী প্রাণিগণের পালান বা স্তন স্বরূপ প্রস্তরকে, দেশে, কাল ও পাত্রভেদে জগতের এক এক ধর্ম্মে এক এক প্রকার সম্মান প্রদর্শন করার বিধান দৃষ্ট হইয়া থাকে। হিন্দুগণ এই প্রস্তর খণ্ডকে "বান লিঙ্গ" বা "শিব লিঙ্গ" জ্ঞানে অতি ভক্তি সহকারে পূজা করেন। মুসলমানগণ এই পবিত্র প্রস্তরকে, হজ করিতে যাইয়া অতি প্রীতির সহিত চুম্বন বা স্পর্শণ করিয়া থাকেন। মক্কার এই পবিত্র প্রস্তরকেই লক্ষ্য করিয়া হিন্দুগণ বলিয়া থাকেন যে, মক্কাতে মক্কেশ্বর শিব রহিয়াছেন। কিন্তু খৃষ্টীয়ানগণ এই প্রস্তরখণ্ডকে, প্রভু যীশুখৃষ্টের আগমন বার্ত্তা নির্দ্দেশক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। দুগ্ধবতী প্রাণিগণের পালানস্বরূপ প্রস্তরকে খৃষ্টীয়ানগণ যখন প্রভু যীশুখৃষ্টের আগমন বার্ত্তা নির্দ্দেশক বলিয়া ব্যাখ্যা করেন তখন এই ঘটনা হইতেও স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, প্রভু যীশুখৃষ্ট প্রকৃতই দুগ্ধশক্তি সদৃশ। বাইবেলে বলিতেছে "এই প্রস্তরখণ্ড মানব হস্তদ্বারা কর্ত্তিত বা গঠিত নহে" দুগ্ধবতী প্রাণিগণের পালানরূপ প্রস্তর ও তদ্রূপ। দুগ্ধবতী প্রাণিগণের পালান বা স্তন স্বরূপ প্রস্তরখণ্ডই, বাইবেলের "সিনা পর্ব্বত" বা "সিয়ন" কোর্-আনের "মক্কা" ও হজরত মুসার "তুরগিরি" রূপে রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। এই পবিত্র প্রস্তরখণ্ড সম্বন্ধে পবিত্র কোর্-আন ও পবিত্র বাইবেল হইতে আরও বিস্তৃত বিবরণ আমি আপনাদিগকে পরে বলিব। হজরত মোহাম্মদ ও প্রভু যীশুখৃষ্টের ন্যায় য়ীহুদিদের পয়গম্বর হজরত মূসাও যে, দুগ্ধশক্তিরূপকে আবৃত হইয়া আছেন এবং মুসার হস্তস্থিত যষ্টি যে, দুগ্ধবতী প্রাণিগণের পালানস্থ বাঁটের সহিত রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে এবং এইজন্যই যে, উহা সর্পের

আকার ধারণ করিত ও মুসার করতল শুভ্রবর্ণ ধারণ করিত তাহাও যথাসাধ্য মতে আপনাদিগকে পরে জানাইব।

আর একটি বিশেষ কথা এই যে, সাধন, ভজন, পূজন, জপ্ ও উপসনা (নামাজ) প্রভৃতি শব্দের অর্থ মুখ্যভাবে ঈশ্বরকে ধ্যান করাই বুঝায় বটে কিন্তু তৎসঙ্গে গৌণভাবে ঐ সকল বাক্যের ভাবার্থে সেবা বা ভোজন কার্য্যকেও নির্দ্দেশ করে। এবং এই অর্থেই ভোজনালয়কেও ভজনালয় নির্দ্দেশ করে। এইজন্যই মুসলমানশাস্ত্রে, মৌমাছিগণের ভোজনালয়রূপ মৌচক্রকে ভজনালয় স্বরূপ পবিত্র কা'বা গৃহরূপে রূপকাবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। তাই হিন্দুশাস্ত্রে বলে, "সংসার মায়া ত্যজিয়ে কৃষ্ণনাম জপ মন।" অর্থাৎ কৃষিজাত খাদ্যবস্তু বা অনাসক্ত তাড়িতে আক্রান্ত খাদ্যবস্তুই "বিষয় বিষ" বা মায়া অর্থাৎ মৃত্যু সদৃশ। এইজন্য উহা ত্যাগ করিয়া শুধু গোদুগ্ধরূপ কৃষ্ণ নামকে জপিতে বা ভোজন করিতে বলা হইয়াছে। বৈষ্ণবগ্রন্থে বলে যে, বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করিলে আত্মা মলিন হয়। এস্থলে বসুন্ধরা বা ভূমিকেই বিষয়ীরূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে, প্রত্যেক দেবতা পূজা ব্রাহ্মণগণ দ্বারা সম্পাদন করার বিধান রহিয়াছে। যদি পূজার্থে ভোজন কার্য্যকে ধরিয়া লওয়া হয় তবে জগতের প্রত্যেক নরনারীই জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে, দ্বিজ বা ব্রাহ্মণস্বরূপ দন্তদ্বারাই কৃষিজাত ও জীবজন্তুর মাংস প্রভৃতি খাদ্যবস্তুরূপ মূর্ত্তির পূজা, সম্পাদ করিয়া আসিতেছে। ধর্ম্মশাস্ত্রে কৃষিজাত ও জীবজন্তুর মাংস প্রভৃতি খাদ্যবস্তু গ্রহণ করাকেই মূর্ত্তিপূজা বলিয়া বর্ণনা করিয়া রাখিয়াছে। তাই পবিত্র কোর্-আনে, বাইবেলে ও বেদে মূর্ত্তিপূজাকে কোফর বা মহাপাপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। এই হিসাবে শাস্ত্রমতে জগতের প্রায় কোন নরনারীই এই মূর্ত্তিপূজার হস্ত হইতে মুক্ত নহে। শাস্ত্রমতে শুধু রসময় দুগ্ধ সেবনকেই নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা করা নির্দ্দেশ করে।

অষ্টম অধ্যায়।

হিন্দু শাস্ত্রে, গৌতম বুদ্ধকে কলি যুগের অবতার বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। আবার বাঙ্গলার বৈষ্ণব সম্প্রদায় শ্রীগৌরাঙ্গকেও কলিযুগের শেষের বা পুষ্পবন্তযুগের পূর্ব্বাভাষেরপূর্ণ অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন। আমি প্রথমতঃ গৌতম বুদ্ধের সম্বন্ধে কিছু আপনাদিগকে জানাইতেছি। বুদ্ধদেবের পূর্ব্বের নাম গৌতম ছিল। এই গৌতম শব্দের ভাবার্থ পূর্ব্বেও একবার গৌতম মুনি সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করিয়াছি। তাহা বোধহয় আপনাদের স্মরণ আছে। গৌতম শব্দের ভাবার্থে এস্থলেও দুগ্ধকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। গৌতম বুদ্ধের স্ত্রীর নাম গোপা ছিল। পূর্ব্বে গোপ ও গোপী শব্দের ভাবার্থ ও প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে গোপ শব্দ পানীয় ও গোপী শব্দের অর্থ খাদ্য বস্তুশক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছি। গোপ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে গোপী এবং গোপা দুইই হয়। অতএব গৌতম বুদ্ধ দুগ্ধস্থ পানীয়শক্তি এবং তাঁহার স্ত্রী গোপা দুগ্ধস্থ খাদ্যশক্তি রূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছেন। আর একটী বিশেষ কথা এই যে, তিব্বতের বৌদ্ধগণ বৎসরে একবার শীত ঋতুতে বহু মাখন সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ বুদ্ধদেবের ও নানা ভূতের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া মহাসমারোহে এক বৌদ্ধ পার্ব্বন

অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তখন তিব্বতস্থ বহুদেশের বৌদ্ধ নরনারী তথায় যাইয়া ঐ উৎসবে যোগদান করেন। উৎসবের পর ঐ মাখনমূর্ত্তি জলে বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। বাঙ্গলার বৈষ্ণবগণ, তাঁহাদের গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গকে, বাহিরে রাধাশক্তি বা প্রকৃতিশক্তি ও ভিতরে কৃষ্ণশক্তি বা পুরুষশক্তি অর্থাৎ একাধারে প্রকৃতি পুরুষের মিলনস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করেন। এস্থলে দেখা যায় শ্রীগৌরাঙ্গকে দুগ্ধস্থ মাখনরূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। যেহেতু মাখনের ভিতর যে, রসময় পদার্থ বিদ্যমান থাকে তাহা কূটস্থ চৈতন্য বা শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপ। ঐ কূটস্থ চৈতন্যই ভগবানের তদ্ভাব এবং বহির্ভাগে যে খাদ্যশক্তিরূপ মাখন বা প্রকৃতিশক্তি স্বরূপিণী শ্রীরাধা বা প্রধানা গোপী বর্ত্তমান থাকেন তাহাই ভগবানের সদ্ভাব বা ব্রহ্মভাব বলিয়া কথিত হয়। আর মাখনের ভিতর যে ভগবানেরসূক্ষ্মদেহ জ্যোতির্ম্ময়রূপে, বর্ত্তমান থাকেন তাহাকেই যে, হিন্দুশাস্ত্রে ওঁকার বা বেদের প্রণব বলিয়া কথিত হয়, ইহা পূর্ব্বেও একবার বলিয়াছি। প্রকৃত প্রস্তাবে মাখনেই ওঁ, তদ্, সৎভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে এই ওঁকারকেই ভগবানের অতি সংক্ষেপ নাম স্বরূপ বর্ণনা করিয়া রাখা হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ, প্রথমে সংসার বিষময় জ্ঞান করিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ মানসে কাটোয়ায় বা কাঠোয়ায় গিয়াছিলেন। তথায় মধু নাপিত দ্বারা ক্ষৌরকার্য্য শেষ করিয়া ভারতীর সঙ্গে মিশিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে চৌষট্টি মোহান্ত সৃষ্টি করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গোদুগ্ধ হইতে ছানা বা মাখন প্রস্তুত করিয়া সচরাচর প্রথমতঃ কাটোয়ায় বা কাঠোয়াতেই (কাষ্ঠ নির্ম্মিত পাত্রে) রাখা হয়। তৎপরে মধু নাপিত অর্থাৎ ময়রাজাতি দ্বারা ঐ ছানা বা মাখন উত্তমরূপে পিষ্ট হইলে তখন চিনি গুড় প্রভৃতি সুমিষ্ট বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া মানবের প্রধান উপাদেয় চৌষট্টি প্রকার সুস্বাদু গব্যরসযুক্ত খাদ্যদ্রব্যে পরিণত হয়। ভারতি শব্দের অর্থ—মুখের

বাক্যকেই বুঝায়। জগতে মানুষের মুখের বাক্যকেই অতি সুমিষ্ট বলিয়া কথিত হয়। অতএব ছানা মাখনের সহিত চিনি গুড় প্রভৃতি অতি সুমিষ্ট বস্তুর মিশ্রনের ভাবের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের ভারতীর সহিত মিলিত হইবার ভাব রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। এবং মধু-নাপিত বা ময়রা দ্বারা চৌষট্টি প্রকার গব্যরস মিশ্রিত খাবার বস্তু প্রস্তুত হওয়াই চৌষট্টি মোহান্ত রূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। যেমন পূর্ব্বে বলিয়াছি দক্ষযজ্ঞে, সতীর মৃত্যু হইলে বা দুগ্ধশক্তিতে টকরস বা পিত্ত রস মিশ্রিত হইলে বিষ্ণু কর্ত্তৃক, সতীর মৃতদেহ অর্থাৎ দুগ্ধস্থ ছানা মাখন একান্ন পীঠে বা একান্ন প্রকার ব্রহ্মবস্তু রূপে বাজগতে মানবের উপাদেয় খাদ্যবস্তু রূপে প্রচলিত হইয়াছিল, তদ্রূপ শ্রীগৌরাঙ্গের চৌষট্টি মোহান্তর ভাবার্থ ও একইরূপ। হিন্দুধর্ম্ম শাস্ত্রে সমস্ত শাস্ত্রীয় কার্য্যেই প্রাণায়ামের উল্লেখ দেখা যায়। এই প্রাণায়াম শব্দের অর্থ, প্রাণের বিস্তার করাকেই বুঝায়। প্রাণায়াম দ্বারা ইড়া (বামনাসিকাস্থ বায়ু বা চন্দ্রনাড়ী) পিঙ্গলা (দক্ষিণ নাসিকাস্থ বায়ু বা সূর্য্য নাড়ী), সুষুম্নায় (মেরুদণ্ডস্থ বায়ুতে) গুরু উপদেশ মতে প্রক্রিয়ার দ্বারা নীত হইলে, প্রাণবায়ু স্থিরপ্রাপ্ত হয়। তারপর ঐ সুষুম্নাস্থ বায়ুকে গুরু উপদেশে দ্বিদল চক্র ভেদ করাইয়া সহস্রারে বা সহস্রদল পদ্মে নিয়া পৌঁছাইতে পারিলেই যোগের চরম অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে। কিন্তু এই সকল যোগাদি কার্য্যে পরিণত করা বহু কষ্ট সাধ্য এবং বহুদিন সাপেক্ষ। ইহা দীর্ঘজিবী সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের মানুষের যোগের কার্য্য ছিল। কিন্তু অন্নগত প্রাণও অল্পায়ু বিশিষ্ট কলির জীবের জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ, তন্ত্র শাস্ত্র হইতে ঐ প্রাণায়াম কার্য্যের অতি সহজ উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে উচ্চ হরিণাম সংকীর্ত্তন বা ভগবানের নাম স্বরূপ শব্দ ব্রহ্ম উচ্চারণ ও সাত্ত্বিক সেবা দ্বারাই মানবের দেহের বাহিরে ভিতরে প্রাণায়াম বা যোগের কার্য্য অতি সহজে সিদ্ধ হয়। হিন্দুর গন্ধর্ব্ব বেদে বলে,—"যপ হইতে

কোটীগুণ শ্রেষ্ঠ ধ্যান, ধ্যান হইতে কোটীগুণ শ্রেষ্ঠ গান, গান অপেক্ষা ভগবানকে পাইবার আর সহজ উপায় কিছুই নাই। উচ্চ কীর্ত্তনেও দেহে প্রাণায়ামের কার্য্য হয়। তাই জগতের প্রায় সকল ধর্ম্মেই ভগবানের নামে গান গাহিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। মুসলমান শাস্ত্রে যদিও সরিয়ত মতে (স্থূল বা বদ্ধজীবের পক্ষে) গান বাদ্য একেবারে নিষিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয় তথাপিও মারেফতে বা সিদ্ধ জীবের পক্ষে গান বাদ্য প্রচলিত আছে বলিয়াই জানা যায়। আজমীঢ় শরিফের হজরৎ মাইনদ্দিন চিস্তি পীর সাহেবই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। হিন্দুশাস্ত্র মতে ইড়া পিঙ্গলা বা চন্দ্র ও সূর্য্যশক্তি সম্মিলনে যেরূপ প্রাণায়াম অর্থাৎ হঠযোগ বা কর্ম্মযোগের ক্রিয়া দেখান হইয়াছে, সেইরূপ শ্রীগৌরাঙ্গ শুধু উচ্চ নাম কীর্ত্তন দ্বারা এবং সাত্ত্বিক সেবায়, খাদ্য ও পাণীয় বস্তু গ্রহণ দ্বারাও চন্দ্র ও সূর্য্যশক্তির মিলন বা প্রাণায়ামের কার্য্য অতি সহজে দেখাইয়া গিয়াছেন। বাহিরে যেমন খাদ্য ও পানীয়র দ্বারা চন্দ্র এবং সূর্য্যের মিলন দেখান হইয়াছে, সেইরূপ আবার ইহার অবশিষ্ট ভাগ বা যোগাবশিষ্ট রামায়ণ মানুষের মুখের ভিতর বর্ত্তমান রহিয়াছে। অর্থাৎ আমাদের মুখের ভিতরস্থ দ্বিজন্মা দন্ত পংক্তিই ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন ব্রহ্মকুলোদ্ভব বশিষ্ট। যেমন বশিষ্ট ব্রাহ্মণ বা দ্বিজ ছিলেন, সেইরূপ আমাদের দন্তও দুইবার জন্মিয়া থাকে। ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে যে বা যিনি তাঁহাকেই শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ বলা হয়। খাদ্যশক্তিরূপ ব্রহ্মবস্তু সেবার সময় দন্তই সর্ব্বাগ্রে অনুভব করিয়া থাকে। অতএব দন্তই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। আমাদের জিহ্বাই দন্ত স্বরূপ বশিষ্টের কামধেনু। যেহেতু জিহ্বাকে যখনই দোহন করা যায় তখনই অমৃতসম রসময় বস্তু নির্গত হয়। এখানে বলা উচিৎ যে, এই জিহ্বাকেই কোর-আন শরিফে, স্বর্গের "কাওছার" নদী রূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। মুসলমান শাস্ত্রে এই স্বর্গস্থ "কাওছার" নদী

অর্থে বলা হইয়াছে যে,—"যাহাতে সর্ব্বদা মানবের আবশ্যকীয় (অতিরিক্তও নয় এবং নেহাৎ কমও নয়) জল বর্ত্তমান আছে।" আমাদের দেহের কণ্ঠ হইতে মস্তক প্যর্য্যন্ত স্থানকেই ধর্ম্মশাস্ত্রে স্বর্গ বলিয়া কথিত হয়। কোর্-আন শরিফের সূরা কাওছরে বলা হইয়াছে যে, "নিশ্চয় আমরা তোমাকে 'কাওছার' দান করিয়াছি, "অতএব তুমি স্বীয় প্রতিপালকপ্রভুর নিমিত্ত নামাজ পড় এবং কোরবাণী কর।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বেই আমি আপনাদিগকে একস্থলে বলিয়াছি যে, কোরবাণী শব্দের প্রকৃত অর্থ আত্মবলির নিদর্শন। আমি হজরত এব্রহিমের পুত্র কোরবাণীর ঘটনা হইতে যথাসাধ্য মতে আপনাদিগকে কোরবাণী যে, আত্মবলির নিদর্শন তাহা দেখাইয়াছি। এবং এই কোরবাণী শব্দের অন্য অর্থে বলিয়াছি যে. কোনও বস্তু বা কোনও প্রাণীকে কোনও যন্ত্র বিশেষ দ্বারা বিদ্ধ করা। সূরা কাওছারেও শেষোক্ত ভাবই বিদ্যমান রহিয়াছে। যেহেতু কোর্-আন শরিফে বলিতেছে, "নিশ্চয় আমরা তোমাকে কাওছার দান করিয়াছি, অতএব তুমি স্বীয় প্রতিপালক প্রভুর নিমিত্ত নামাজ পড় এবং কোরবাণী কর।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এস্থলে আমাদের ভক্ষ্য বস্তু দন্তদ্বারা বিদ্ধ বা চর্ব্বন অর্থাৎ ক্রূশে বিদ্ধ করাই প্রকৃত কোরবাণী। অতএব তোমাকে যে, কাওছার বা জিহ্বা দান করিয়াছি সেই জিহ্বা দ্বারা ঐ খাদ্যবস্তুরূপ ব্রহ্মশক্তির রস অনুভব কর এবং ঐ জিহ্বা দ্বারা ঈশ্বরের প্রার্থনা সূচক পবিত্র বাক্য সকল উচ্চারণ কর। বিশেষতঃ মুসলমান শাস্ত্রে যে দিবারাত্রির ভিতর পাঁচবার নামাজ পড়িবার বিধান আছে তাহাও যে, মানবের সেবা-কার্য্যের ভাবের সহিত সামঞ্জস্য হইয়া রহিয়াছে, পরে আমি তাহা আপনাদিগকে বিশেষরূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। সে যাহাই হউক, আমাদের পাপস্থলীস্থ অগ্নি, ব্রহ্মভাবাপন্ন ক্ষত্রকুলোদ্ভব বিশ্বামিত্র স্বরূপ। পাকস্থলীস্থ অগ্নি জগতের প্রাণীগণের ভক্ষ্যবস্তু পরিপাক করায় বলিয়া তাহাকে বিশ্বের মিত্রস্বরূপ বলা হইয়াছে। ভক্ষ্যবস্তু

চর্ব্বণ করিতে করিতে দন্ত সকল নষ্ট হইয়া যাওয়াকে, পাকস্থলীস্থ অগ্নিস্বরূপ বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক দন্তস্বরূপ বশিষ্ঠকে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া রূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। মানুষের বাল্যাবস্থায় প্রথমতঃ একবার দন্ত প'ড়ে যাওয়া কার্য্যই, সর্ব্বপ্রথমে বশিষ্ঠের পুত্রগণকে যজ্ঞে আহুতি দেওয়া রূপে রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। পাকস্থলীস্থ অগ্নি দোষিত হইয়া জিহ্বাকেও রসশূন্য করিয়া শুষ্ক করিয়া ফেলে বলিয়া উহাকে বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক বশিষ্ঠের কামধেনু হরণ করা রূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। যেমন দন্তকে ব্রাহ্মণ ও জিহ্বাকে কামধেনু বা গোমাতাস্বরূপ ব্যাখ্যা করা হইল তদ্রূপ অন্যদিক দিয়াও বহির্জগতে গোব্রাহ্মণ বর্ত্তমান আছে। গীতায় বলিতেছে যে, ব্রহ্ম অক্ষর হইতে জাত বা উৎপন্ন। এই অক্ষর শব্দের অর্থ যাহা ক্ষরে না। গোমাতা বা দুগ্ধবতী প্রাণীগণের স্তন বা পালান হইতে সাধারণতঃ দুগ্ধ আপন ইচ্ছায় ক্ষরিত বা পতিত হয় না! যখন উহাদের বৎস্যগণ দ্বারা কিংবা মানুষের হস্তদ্বারা আকর্ষিত হয় তখনই পতিত হইয়া থাকে। অতএব দুগ্ধবতী প্রাণীগণের দুগ্ধই প্রকৃত অক্ষর হইতে জাত ব্রহ্ম। পূর্ব্বেও অনেকস্থলে আরও অনেকবার ইহা আপনাদিগকে জানাইয়াছি। হিন্দুমতে বুঝা যায় যে, দুগ্ধবতী প্রাণীগণের দুগ্ধই ব্রহ্মবস্তু এবং এই ব্রহ্মবস্তুকে যে বা যিনি প্রথম অনুভব করেন তিনিই যে, প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন ইহাও পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি। এই হিসাবে দেখা যায় দুগ্ধবতী প্রাণীগণের দুগ্ধস্বরূপ ব্রহ্ম উহাদের বৎসগণেই সর্ব্বপ্রথম অনুভব বা আস্বাদন করিয়া থাকে। অতএব উহাদের বৎসগণই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। বিশেষতঃ আর্য্যগণ গোদুগ্ধকেই প্রকৃত ব্রহ্মবস্তু স্বরূপ অবগত হইয়া গোহত্যাকে মহাপাপ বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এবং প্রসাদরূপে সকলের সেবার্থে হিন্দুদের প্রত্যেক দেবতা পূজাতে শুধু গোদুগ্ধেরই প্রচলন করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন এবং তাই

গোবৎসরূপ ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট সকল দেবতারই ভোগে লাগিয়া থাকে। এইজন্যই গোদুগ্ধে কোন জাতি বিচার দৃষ্ট হয় না। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাই বলিয়াছেন যে, "ব্রহ্ম কখনও উচ্ছিষ্ট হয় না।" এই হিসাবে দেখা যায় যে, গোবৎসই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। এই গোবৎসের অনুকরণে ভারতের অন্যান্য হিন্দুগণও ব্রাহ্মণ জাতির উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া থাকে। বশিষ্ট সদৃশ মানুষের দম্ভ ও গোবৎসই যে, প্রকৃত ব্রাহ্মণ, বর্ত্তমান যুগে কাল প্রভাবে ভারতের ব্রাহ্মণগণ এই তথ্য প্রায় অনেকেই হয়তো ভুলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ, যাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে এই তথ্য অবগত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই আদিতে ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান ভারতে ব্রাহ্মণগণের ভিতর যদিও প্রায় অনেকেই এই তথ্য বোধ হয় অবগত নহেন তথাপিও তাঁহারা সেই কুলোদ্ভব বলিয়া এখনও ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন. যাঁহারা আদিতে যজ্ঞবস্তু বা সেবার বস্তুরূপ গোদুগ্ধকে ব্রহ্মস্বরূপ জানিয়া ঐ গোদুগ্ধরূপ ব্রহ্মকে সূত্রধারের ন্যায় গোমাতার পালান হইতে বহিস্কৃত হওয়ার ভাব অনুভব করিরাছিলেন, তাঁহারাই যজ্ঞসূত্র বা যজ্ঞ উপবিত অর্থাৎ সূত্রের ন্যায় দুগ্ধরূপ যজ্ঞবস্তুর পতন অবস্থা অবগত হইয়া গলদেশে ঐ যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া সূত্রধার বা দ্বিজ হইয়াছিলেন। ভারতের সামবেদী, যজুর্ব্বেদী ও ঋগবেদী ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞসূত্রই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যেহেতু সাম বেদ অর্থাৎ গোদুগ্ধের, যজুর্ব্বেদ অর্থাৎ মহিষ দুগ্ধের পালান হইতে পতন কালীন সূত্রধার ঋগবেদ অর্থাৎ ছাগদুগ্ধের সূত্রধার হইতে কিঞ্চিৎ অধিক দীর্ঘাকারই দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইজন্যই সামবেদী ও যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণগণ, ঋগ্‌বেদী ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞসূত্র অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দীর্ঘাকার যজ্ঞসূত্র ধারণ করিয়া থাকেন। এস্থলে "সূত্রধার" সম্বন্ধে বাইবেলে মার্ক লিখিত সুসমাচার হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া ইহার সত্যতা সম্বন্ধে আপনাদের

আকর্ষণ করিতেছি। মার্ক লিখিত সুসমাচারে একস্থানে যীশুকে

বলিতেছে যে, "ইনি কি সূত্রধার নহেন?" আমি পূর্ব্বেই আপনাদিগকে দেখাইয়াছি যে, প্রভু যীশু দুগ্ধশক্তি রূপকে রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছেন। দুগ্ধ সূত্রধাররূপেই পালান হইতে বহির্গত হয়। তাই দুগ্ধশক্তিরূপ যীশুকে সূত্রধার বলা হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আর্য্য মিশনের স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী বেদের মত প্রচার করিতে যাইয়া জগতের অন্যান্য ধর্ম্ম গ্রন্থের যৎপরনাস্তি নিন্দা করিয়াছেন। তিনি নিজে দ্বিজ বা সূত্রধার হইয়াও বাইবেলের মার্ক লিখিত "ইনি কি সূত্রধার নহেন" এই বাক্যটি সম্বন্ধে যে অর্থ করিয়াছেন তাহা বড়ই লজ্জাস্কর বিষয় বলিয়া বোধ হয়। কোর-আন, বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ যে, বেদেরই অর্থ বোধক গ্রন্থ, তাহা তিনি বুঝিয়াই উঠিতে পারেন নাই। কারণ তিনি বলিয়াছেন, "বস্তুতঃ ইউসফ (যীশুর পিতা) সূত্রধার বা সুতার মিস্ত্রী ছিলেন। সুতরাং ঈশাও (যীশুও) সূত্রধার বা সুতার মিস্ত্রী ছিলেন। ঈশা কয়েক বর্ষ পর্য্যন্ত সূত্রধারের কার্য্য করতঃ পরে ভবিষ্যৎ বক্তা হইতে হইতে ঈশ্বরের পুত্রই হইয়া পরিয়াছিলেন এবং আরণ্যক মনুষ্যেরা তাহাই স্বীকার করিয়া লইয়াছিল।" এস্থলে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রভু যীশুকে সূত্রধার অর্থে সূতার মিস্ত্রী বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জগতে যাঁহারা শুধু জ্ঞানমার্গে থাকিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করেন বা কোন ধর্ম্মগ্রন্থ লিখেন তাঁহাদের ভাব সচরাচর এইরূপই দৃষ্ট হয়। যেহেতু তাঁহারা নিজের জ্ঞান বুদ্ধির মাপ কাঠি দ্বারা ভগবদ্ভক্ত ভাববাদীগণের জ্ঞানেরও তুলনা করিতে সর্ব্বদাই প্রয়াসী হইয়া থাকেন। এবং এমন কি তাঁহারা ঈশ্বর প্রেরিত ব্যক্তিগণের দ্বারা প্রকাশিত ঈশ্বর বাক্যের দোষারোপ করিয়াও শেষে নিজেই জগতের নিকট হাস্যাস্পদ হন। সে যাহাই হউক, যেমন দন্ত দুইবার জন্মায় বলিয়া দ্বিজ বলিয়া কথিত হয় সেইরূপ পুং গোবৎসকেও মানুষ কর্ত্তৃক পরে বলদরূপে ভিন্ন অবস্থায় পরিণত হইতে হয়। অতএব সেই হিসাবে পুং গোজাতি

(বলদ্) ও দ্বিজ বলিয়া কথিত হয় এবং স্ত্রী গোবৎসের ঐরূপ কোন সংস্কার নাই বলিয়াই ব্রাহ্মণ জাতীয় স্ত্রীলোকদিগেরও কোনও সংস্কার দৃষ্ট হয় না। হিন্দুশাস্ত্রে সর্ব্ব গ্রন্থেই গো ব্রাহ্মণ রক্ষা অথবা গো ব্রাহ্মণের হিতের জন্য যাহা কিছু করিবার উপদেশ বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার বিশেষ তাৎপর্য্য এই যে, গোজাতি ও গোবৎসকে রক্ষা করিতে পারিলেই, আমরা অমৃত সম গোদুগ্ধ অপর্য্যাপ্তরূপে সুলভে প্রাপ্ত হইতে পারি। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ স্বরূপ দন্ত ও জিহ্বা স্বরূপ গোমাতাকে রক্ষা অর্থাৎ সর্ব্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিতে পারিলে তাহা হইতে আমাদের সেবার কার্য্য দ্বারা আত্মরক্ষা বা ধর্ম্ম রক্ষা হইয়া থাকে। বর্ত্তমান যুগের ডাক্তার ও কবিরাজগণ রোগীর বাড়ী আসিয়া সর্ব্ব প্রথমেই রোগীর জিভ্ এবং দন্ত পরীক্ষা করেন। এই জিভ্ এবং দন্তের সাধারণ ভাবের কোনও ব্যতিক্রম ঘটিলেই রোগীর দেহাভ্যন্তরস্থ ব্যাধির মাত্রা অনুভব করিয়া থাকেন। তাই তাঁহারা সর্ব্বদাই রোগীকে গো ব্রাহ্মণরূপ জিভ্ এবং দন্তকে রক্ষা অর্থাৎ সর্ব্বদা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। কারণ ইহা আত্মরক্ষা বা ধর্ম্মরক্ষার প্রকৃষ্ট উপায়। হিন্দুদের তন্ত্রে বর্ণিত সোমরসকে কোন কোন তান্ত্রিক পণ্ডিত মদ্য বলিয়াও ব্যাখ্যা করেন। কারণ তাঁহারা বলেন যে, কৃষিজাত শস্যকণা, ধান চাউল প্রভৃতি মৃত্তিকা অভ্যন্তরস্থিত চন্দ্রের সুধা সংগ্রহ করিয়াই পরিপুষ্ট হয়। তাঁহারা ধান গাছকে সোমলতা বলিয়া থাকেন। অতএব ধান বা ধান্য হইতে উৎপন্ন ভাতের এবং অন্যান্য কৃষিজাত ফল মূলের শেষ নির্য্যাসই মদ্য বা সোমরস। যদিও তাহা এক হিসাবে সোমরস বলিয়া ধরা যাইতে পারে বটে, তথাপিও ঐ ধান গাছও অন্যান্য জগতের বৃক্ষলতা ভূগর্ভস্থ বিষাক্ত চন্দ্রশক্তি আকর্ষণ করিয়াই শস্য উৎপাদন করিয়া থাকে। অতএব উহা হইতে উৎপন্ন মদ্যে, অনাসক্ত তাড়িৎ বা বিষ অর্থাৎ শয়তানের কার্য্য সকল অতি মাত্রায় পরিপূর্ণ থাকে।

সেইজন্যই মুসলমানদের কোর-আন শরিপেও জগতের অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থে মদ্য পান একেবারে নিষিদ্ধ বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে। তন্ত্রের পঞ্চমকার সম্বন্ধে উহার বাহ্যিক অর্থ লক্ষ্য করিয়াই কোন কোন তান্ত্রিক পণ্ডিত বলেন যে, "তন্ত্রেই একস্থানে বলিতেছে, সংসারে যাহা মন্দ, মানবমন তাহাতেই অধিক আকৃষ্ট হয়। এইটিই স্বভাব সিদ্ধ নিয়ম। সুতরাং এই দুর্দ্দমনীয় মনকে প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্তি করিতে না পারিলে, কি প্রকারে সে শক্তিতে মনোনিবেশ করিবে ?" তদজন্যই এই পঞ্চমকার (অর্থাৎ মদ্য, মাংস, মৈথুন প্রভৃতি) লইয়া সাধন করিলে, ক্রমে এই সকলে হীনস্পৃহ হইলে আর কোন প্রবৃত্তি থাকিবে না। তখন মন শক্তিতে বিলীন হইবে; ইহাই মুক্তি। তাঁহারা বলেন; "বিষস্য বিষমৌষধম" অর্থাৎ সাদৃশ চিকিৎসার ন্যায় উৎকৃষ্টতর চিকিৎসা আর কিছুই হইতে পারে না।" এইজন্যই বোধ হয় এদেশের প্রাচীন ব্যক্তিরা অহিফেন সেবন করিয়া থাকেন। যেহেতু কৃষিজাত ভক্ষ্য বস্তু ভক্ষণ জনিত বিষকে, মাত্রা বিশেষ অহিফেন সেবনে নষ্ট করে। এইজন্য বোধহয় বিজ্ঞানেও বলে যে, দুইটী নিগেটিভ বা অনাসক্ত শক্তি মিলিত হইয়া একটি এফারমেটিভ্ (Affirmative) বা আসক্ত শক্তি উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ দুইটী 'না'তে একটি 'হাঁ' হয়। উপরোক্ত তান্ত্রিকগণ "অতিশয় বিষয়াসক্ত ব্যক্তিকে অতিমাত্র ভোগসুখে নিয়োজিত করিয়া, ক্রমে ক্রমে যদ্দ্বারা বিষয়ে বিরক্তি জন্মে, তদুপায়ই করিতেন। বৈদিক গ্রন্থে মহারাজ যযাতি, উপরোক্ত সাদৃশ চিকিৎসার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত"। হিন্দুশাস্ত্রে বলে রাজা যযাতি, নরমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সর্ব্বসাধারণে হয়তো মনে করে যে, নরমেধ যজ্ঞার্থে মানুষকে বলি দেওয়া। কিন্তু এই নরমেধ যজ্ঞের অর্থ মানুষকে হত্যা করা নহে। যেমন রামের অশ্বমেধ যজ্ঞ অর্থে কৃষিজাত ভক্ষবস্তু জগতে প্রচলনরূপে রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে তদ্রূপ যযাতির নরমেধ

যজ্ঞও জগতে মদ্য বা সুরা পান প্রচলনের ভাব নরমেধ যজ্ঞে রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। যেহেতু নার অর্থাৎ জলই নরের জীবন স্বরূপ, এই জল হইতে উৎপন্ন কৃষিজাত শস্যকণার শেষ নির্য্যাস বা বিষময় মদ্যই 'নার' বা 'নর' সদৃশ এবং মেধ অর্থে যজ্ঞ বা পান ভোজনকেই নির্দ্দেশ করে। এইজন্য মদকে ইংরাজিতে স্পিরিট্ বা আত্মা বলিয়াও কথিত হয়। অতএব রাজা যযাতির নরমেধ যজ্ঞার্থে, জগতে যযাতির সময় হইতেই মানুষের ভিতর মদ্য সেবন প্রথা প্রচলিত হওয়া বুঝায়। হিন্দুশাস্ত্রে বলে, যযাতি তাঁহার পিতা নহুষের প্রেতাত্মা উদ্ধার মানসে নরমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এই প্রেতাত্মা উদ্ধাররূপ নরমেধ যজ্ঞের ভাবার্থ এই যে, জগতে কৃষিজাত ভক্ষ্যবস্তু প্রচলনের পর হইতেই মানব দেহের বীর্য্যে ও রজে উহার বিষ প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। অতএব সেই বিষাক্ত বীর্য্য ও রজঃ হইতে উৎপন্ন মানবদেহ মাত্রেই পিতৃ কুলের উর্দ্ধতন চারি পুরুষের ও মাতৃ কুলের উর্দ্ধতন তিন পুরুষের বিষাক্ত বীর্য্য ও রজঃরূপ প্রেতাত্মা বর্ত্তমান থাকে। যযাতির নরমেধযজ্ঞ বা সুরা পানের ভাবার্থ হইতে বুঝা যায় যে, মাত্রা বিশেষে সুরাপান রূপ বিষ দ্বারা উপরোক্ত মানবদেহস্থ উর্দ্ধতন সপ্ত পুরুষের প্রেতাত্মারূপ বিষকে নষ্ট করিয়া থাকে বা ঐ প্রেতাত্মা উদ্ধার প্রাপ্ত হয়।

কিন্তু পবিত্র কোর্-আনের সুরা "বকবায়" বলা হইয়াছে,—"তাহারা সুরাপান ও দ্যুত ক্রীড়া বিষয়ে তোমাকে (হে মোহাম্মদ) প্রশ্ন করিতেছে, এই দুই বিষয়ে গুরুতর অপরাধ, এবং লোকের লাভও আছে; কিন্তু এই দুইয়ে লাভ অপেক্ষা অপরাধ গুরুতর।

আবার পবিত্র কোর্-আনের সুরা "মায়দায়" বলা হইয়াছে,—"হে বিশ্বাসিগণ, সুরা, দ্যুত ক্রীড়া শয়তানের অপবিত্র ক্রিয়া ইহা ভিন্ন নহে, অতএব এ সকল হইতে নিবৃত্ত হও, ভরসা যে তোমরা মুক্ত হইবে। সুরা ও দ্যুত ক্রীড়াতে তোমাদিগের মধ্যে ঈর্ষ্যা ও শত্রুতা স্থাপন এবং তোমাদিগকে ঈশ্বর স্মরণ হইতেও উপাসনা হইতে

নিবৃত্তরাখা শয়তান ইহা ভিন্ন ইচ্ছা করে না, অনন্তর তোমরা কি নিবৃত্ত হইবে?

এস্থলে পারশ্যের দার্শনিক পণ্ডিত ওমর খৈয়ামের দুই একটি কথা বিশেষ উল্লেখ যোগ্য বলিয়া মনে করি। কারণ তিনি বলিয়াছেন যে, মদ অল্প মাত্রায় দেহে অমৃতের এবং অধিক মাত্রায় বিষের কার্য্য করিয়া থাকে। ইয়ুরোপ আমেরিকা প্রভৃতি জগতের বর্ত্তমান সুসভ্য দেশেও অতি অল্প মাত্রায় মদ্য পান করাকে "স্বাস্থ্যপান" বলিয়া কথিত হয় এবং এইরূপ স্বাস্থ্য পান বা মদ্য পান ঐ সকল দেশে রাজকীয় সভা সমিতিতেও প্রচলিত আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, আমাদের বর্ত্তমান ভক্ষ্যবস্তু প্রায় সমস্তই বিষে পরিপূর্ণ, সেই বিষের সহিত মদ্যের মাত্রা বিশেষের বিষ মিলিত হইলে দেহে অমৃতের কার্য্য হওয়াই সম্ভব পর কথা কিন্তু মানুষ লোভের বশবর্ত্তী হইয়া এস্থলে অতি মাত্রায় সুরা পান করাতেই দেহে বিষের কার্য্য সংঘটিত হয়। এবং ঐরূপ অতিরিক্ত পান দোষে মানুষের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না বলিয়াই সর্ব্ব ধর্ম্ম শাস্ত্রে ঐ বিষ পান করা একেবারেই নিষিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইয়া রহিয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রে মদ্যপানের বিরুদ্ধবাদীরা বলেন যে,

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভি বর্দ্ধতে॥"

অর্থাৎ ঘৃতাহুতি দ্বারা যে প্রকার প্রজ্জ্বলিত অগ্নির নির্ব্বান পরিবর্ত্তে আরও বৃদ্ধি পায়, তদ্রূপ কামোপভোগ দ্বারা কাম নিবৃত্তি না হইয়া বরং বৃদ্ধি পায়। বৈদান্তিক পণ্ডিতগণ পঞ্চমকারের আধ্যাত্মিক এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে,—"ব্রহ্মরন্ধ্র কমল হইতে ক্ষরিত যে সোমামৃতধারা তাহাই সোমরস।" রসনার নাম 'মা' তদংশ বাক্য এইহেতু বাক্য সংযমকারী মৌনাবলম্বী যোগী ব্যক্তিকে মাংস সাধক কহে। গঙ্গা অর্থে ইড়া নাড়ী, যমুনার্থে পিঙ্গলা, এই দুই নদীর মধ্যে সতত বিচরণশীল যে, দুই মৎস্য অর্থাৎ নিশ্বাস ও

প্রশ্বাসকে যিনি আয়ত্ব করিয়াছেন, অর্থাৎ প্রাণায়াম সাধক ব্যক্তিকে মৎস্যাশী কহে। ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সহস্রার পদ্মে যে কালিকামূর্ত্তি আছে তাহার নাম মুদ্রা। তৎসাধককে মুদ্রা সাধক কহে। আত্মাকে সচ্চিদানন্দরূপ জানিয়া, যে সাধক তাহাতে রতি করেন, অর্থাৎ জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় মিলন করিতে সক্ষম হন, তিনিই প্রকৃত মৈথুন সাধক।" বেদের মতে সহস্রদল পদ্মস্থ যে ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে ক্ষরিত ধারাকে সোমরস বলিয়া কথিত হয়, সেই ব্রহ্মরন্ধ্র শব্দের অর্থ অধোমূখী বিষতন্তুসম অর্থাৎ পদ্মের মৃণাল সূত্রের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম ছিদ্রযুক্ত স্থানকেই বুঝায়। গোমাতার বাঁটে ঐরূপ অধোমূখী বিষতন্তুসম অর্থাৎ পদ্মের মৃণাল সূত্রের ন্যায় সূক্ষ্মছিদ্র বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং তদ্দারাই দুগ্ধ নির্গত হইয়া থাকে। অতএব গোদুগ্ধই প্রকৃত সোমরস। তাই হিশাস্ত্রে বলে, দেবতারা সোমরস পান করিতেন অর্থাৎ শুধু গোদুগ্ধই দেবতাদের সেব্য বস্তু ছিল। ঐ দুগ্ধই ব্রহ্ম, কারণ উহা অক্ষর হইতে জাত। ঐ গোদুগ্ধই গোমাতার পালান হইতে শুভ্রবর্ণ রেখারূপে বহির্গত হয় এবং ঐ রেখা রসময় গোদুগ্ধের বিন্দু বা বিন্দসমষ্টি। অতএব ঐ গোদুগ্ধই অনাদির আদি গো-বিন্দ রূপে জগতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। বিশেষতঃ মানবের মস্তকস্থ সহস্রদল পদ্মেও গোমাতার বাঁটেব ন্যায় ব্রহ্মরন্ধ্র বর্ত্তমান আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গোদুগ্ধ গোমাতার চন্দ্রশক্তি বা প্রকৃতি শক্তি হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব এই গোদুগ্ধই গোমাতারূপ গোমুখী পর্ব্বত হইতে নিসৃত শুদ্ধ গঙ্গাজল বা স্বর্গীয় সুধা সদৃশ। যেহেতু গঙ্গা অর্থে ইড়া বা চন্দ্রশক্তিকেই বুঝায়। হিন্দুশাস্ত্রে যে, ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গা আনয়নের উপাখ্যান বর্ত্তমান আছে, তাহাও এই গোদুগ্ধ রূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। যেহেতু হিন্দুশাস্ত্রে বলে যে, ভগীরথের, ভগে ভগে জন্ম হইয়াছিল। অর্থাৎ দুইটী প্রকৃতিশক্তি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। গোমাতা প্রকৃতিশক্তি এবং তাহার দেহস্থ চন্দ্র শক্তি ও প্রকৃতিশক্তি, এই দুই প্রকৃতিশক্তি হইতেই গোদুগ্ধ

উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব গোদুগ্ধই ভগীরথ কর্ত্তৃক আনীত শুদ্ধ গঙ্গাজল। হিন্দুশাস্ত্রে বলে যে, তিথি বিশেষে গঙ্গাস্নান করিলে মহা পূণ্য সঞ্চয় হয়। অতএব ঐরূপ তিথি বিশেষে শুধু গোদুগ্ধে স্নান করিলেই সেই সকল ফল ফলিয়া থাকে। নচেৎ কোন নদীর জলে স্নান করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ভারতবর্ষে যে গঙ্গানদী, হিমালয় পর্ব্বতস্থ গোমুখী পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছে তাহার জল ও ভারতের অন্যান্য নদীর জল অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর বটে। তাহাতেও স্নান করিলে দেহের কতক পরিমাণ উপকার সাধিত হয় বটে কিন্তু গোদুগ্ধরূপ গঙ্গাজলে স্নান করিলে যে ফল ফলে, সাধারণ গঙ্গার জলে তাহা ফলে না। অতএব তিথি বিশেষে শুধু গোদুগ্ধে স্নান করিলেই হিন্দুশাস্ত্র লিখিত ফল সকল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষতঃ গোদুগ্ধে স্নান করিতে হইলে দুধের পুকুর বা দুধের নদীর আবশ্যক হয় না। মানুষের যার যা অবস্থা বিশেষে একপোয়া হইতে একসের দুধ হইলেই তাহাতেও স্নান করা চলে। যেহেতু অল্প পরিমাণ দুগ্ধদ্বারা সর্ব্বশরীর লেপন করিয়া মাথায় কিছুমাত্র দিলেই এক প্রকার দুগ্ধেতেই স্নান করা হয়। প্রকৃতপক্ষে গোদুগ্ধই শুদ্ধ গঙ্গাজল। সেইজন্য বৈষ্ণব গ্রন্থে বলে যে, "কৃষ্ণ প্রেম সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল।"

ইহার ভাবার্থ এই যে, ব্যাসদেব বৃন্দাবন লীলায় যে, রাধাকৃষ্ণকে যুগলমূর্ত্তিরূপে শুদ্ধ গঙ্গাজল সদৃশ গোদুগ্ধরূপকেই আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বেই আপনাদিগকে বলিয়াছি। ভারতের ব্রাহ্মণগণ, তাহাদের নারায়ণশিলা কোন প্রকার অশুচি প্রাপ্ত হইলে গোদুগ্ধে বা পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইয়া শুঁচি করিয়া লইয়া থাকেন। কাহারও হস্তস্থিত মাদুঁলি অশুঁচি প্রাপ্ত হইলেও ঐরূপ শুধু গোদুগ্ধের দ্বারাই শুঁচি করিয়া লওয়া হয়। ইহা হইতেও স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, গোদুগ্ধই প্রকৃত প্রস্তাবে শুদ্ধ গঙ্গাজল। এইজন্যই

হিন্দুশাস্ত্রে বলে, গঙ্গা প্রথমতঃ ব্রহ্মার কমণ্ডলুর ভিতর লুক্কায়িত ছিল। আমি পূর্ব্বে আপনাদিগকে দেখাইয়াছি যে, গোমাতার পালান বা স্তনই ব্রহ্মার কমণ্ডলুরূপে রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। অতএব গোমাতার পালান হইতে নিস্থত গোদুগ্ধই জগতে শুদ্ধ গঙ্গাজল। এবং এই গোদুগ্ধই গীতায় বর্ণিত "অক্ষর হইতে জাত ব্রহ্ম।" তাই গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের ১ম, ২য় ও ৩য় শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে, "হে অর্জ্জুন! আমি সূর্য্যকে এই অক্ষর যোগ বলিয়াছিলাম। সূর্য্য স্বপুত্র মনুকে কহিয়াছিলেন। মনু স্বপুত্র ইক্ষাকুকে কহিয়াছিলেন। নিমি প্রভৃতি রাজর্ষীগণ এইরূপে পরম্পরা প্রাপ্ত এই যোগ জানিয়াছিলেন। হে পরন্তপ! ইহ লোকে সেই যোগ কাল বলে বা (যুগ প্রভাবে) নষ্ট হইয়াছে। তুমি আমার ভক্ত এবং সখা, এইজন্য এই সেই পুরাতন যোগ অদ্য আমি তোমাকে কহিলাম, যেহেতু এই গূঢ় তত্ত্ব উত্তম"। এখন আপনারা ভাবিয়া দেখুন হিন্দুশাস্ত্রের গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই গোদুগ্ধকেই লক্ষ্য করিয়া অক্ষর যোগের কথা বলিতেছেন কিনা? এবং এই তথ্য যে কাল প্রভাবে বর্ত্তমানে সকলে অজ্ঞাত রহিয়াছে তাহাও সত্য কিনা? যেহেতু যদিও গোদুগ্ধের উপকারিতা আজকাল অনেকেই অনুভব করিয়া থাকেন বটে তথাপিও এই গোদুগ্ধই যে, "অক্ষর হইতে জাত ব্রহ্ম" এবং এই গোদুগ্ধের ভিতরই যে, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বা জগতের নিগূঢ় ধর্ম্ম তত্ত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা বর্ত্তমান লোক সমাজে একপ্রকার অপরিজ্ঞাতই রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখা যায়, রাধা কৃষ্ণ বিরহে সখিগণকে বলিতেছেন,

"মরিলে বাঁধিয়া রেখো তমালেরই ডালে।"

ইহার ভাবার্থে এই বুঝায় যে, গোদুগ্ধে টকরস বা পিত্তরস মিশ্রিত হইলে, খাদ্যশক্তিরূপ শ্রীরাধা মরিয়া ছানায় পরিণত হয়। তখন ময়রা বা মধু নাপিত ঐ ছানা সদৃশ শ্রীরাধাকে কোনও উচ্চস্থানে

ঝুলাইয়া রাখিয়াই উহা হইতে জল নিঙ্‌রাইয়া লইয়া থাকে। মুসলমান শাস্ত্রে হজরত মোহাম্মদের কন্যা ফতেমা বিবি হিন্দুর ভগবতী বা অন্নপূর্ণা অর্থাৎ দুগ্ধবতী প্রাণীগণ শক্তিরূপে রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহার স্বামী ঋষিশ্রেষ্ঠ যোগীবর হজরত আলী, হিন্দুর মহাদেবশক্তি রূপকে আবৃত এবং তদ্‌পুত্র ইমাম্ হাচেন ও ইমাম্ হুচেন হিন্দুর গণেশ ও কার্ত্তিকশক্তিরূপে বা একাধারে দুগ্ধবতী প্রাণীগণের দুগ্ধশক্তিরূপকে আবৃত হইয়া আছেন। তাই বিষ সংযোগে দুগ্ধ স্বরূপ ইমাম্ হাচেনের মৃত্যু হইলে পর ইমাম্ হুচেন কারবালার মাঠে, হায়! রছুল!! হায়! রছুল!! অর্থাৎ জল জল বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন। কারণ হজরত মোহাম্মদ বা আল্লার রছুল শব্দের ভাবার্থে মুসলমান শাস্ত্রে জল বা রসময় পদার্থ শক্তিকেই নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়াছে। মুসলমানদের মহরম পর্ব্ব উপলক্ষে বাঙ্গলা দেশের কোনও কোনও সম্প্রদায় বিশেষের মুসলমানগণ খেদসুচকবাণী দ্বারা গানে বলেন যে, "লা এলাহা ইল আল্লা মোহাম্মদ রছুল, আল্লা তোমায় ডাকি গো কারবালায়, হায়! রছুল!! হায়! রছুল!!"। ইহার ভাবার্থ এই যে, কারবালার সমর ক্ষেত্রে ইমাম্ হুচেন ও তাঁহার সঙ্গীগণের জল অভাবেই মৃত্যুর প্রধান কারণ হইয়াছিল। তাই তাঁহারা কারবালার মাঠে হায়! রছুল!! হায়! রছুল!! বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন। অতএব আল্লার রছুল বা হজরত মোহাম্মদকে জল বা রসময় শক্তিই স্পষ্টতঃ ভাবে বুঝাইতেছে। পূর্ব্ববঙ্গের সাধক মনোমোহন একটি গানে বলিয়াছেন যে, "খোদা খোদ আল্লা রাধা; দুস্ত (বন্ধু) মোহাম্মদ।" সাধক মনোমোহন একজন উদার চেতা হিন্দু সাধক ছিলেন। তাই তিনি হিন্দুর রাধাকে আল্লা ও কৃষ্ণকে মোহাম্মদ বা রছুলের সঙ্গে তুলনা করিয়া বঙ্গে হিন্দু মুসলমান ধর্ম্ম সংক্রান্ত বিবাদ নিবারণ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন বটে কিন্তু তাহাতে পবিত্র কোর্-আনের ভাবের সামঞ্জস্য থাকে না।

যেহেতু হিন্দুগণ রাধাকৃষ্ণকে মানুষরূপে সাঁজাইয়া রাখিয়াছেন। কোর্-আন বলে, আল্লাহু কখনও মানুষরূপ ধারণ করেন না। এবং তাঁহার কোন মূর্ত্তি নাই এবং জগতের কোনও বস্তু বা ব্যক্তির সহিত তাঁহার মেছাল বা তুলনা করা ভুল। যদি হিন্দুশাস্ত্রে রাধাকে মানুষরূপে না সাজাইয়া রাখিত এবং কোন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ না করিত তবে মোসলমানদের আল্লাহু এবং হিন্দুর রাধা আর মোসলমানদের আল্লার রছুল বা মোহাম্মদ ও হিন্দুর শ্রীকৃষ্ণ একই ভাবাপন্ন বলিয়াই বোধ হইত। মোসলমানদের আল্লাহুও খোদা বাক্যটি একভাবাপন্ন নহে। যেহেতু আল্লার কোন প্রতিশব্দ মোসলমান শাস্ত্রে নাই। ইহা আরবী শব্দ আর খোদা বাক্যটি পার্শী শব্দ এবং খোদা বাক্যটি মানুষের নামের ভিতরও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু আল্লা শব্দ কখনও মানুষের নামের মধ্যে ব্যবহৃত হয় না। সাধক মনোমোহনের গানের ভাবে বুঝাযায় যে, হিন্দুর আদি ও অনন্তদেব বিষ্ণুর অবতার স্বরূপ যেমন যুগোলরূপে রাধাকৃষ্ণ, সেইরূপ মোসলমানদেরও খোদ মালিক খোদা হইতেই আল্লা এবং রছুলের রূপান্তর হইয়াছে। কিন্তু মোসলমান শাস্ত্রে এইরূপ কোনও ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয় না। অধিকন্তু হিন্দুর রাধাশক্তি ও মোসলমানের আল্লাহু এবং হিন্দুর শ্রীকৃষ্ণ ও মোসলমানের রছুল যদি একই অর্থ বোধক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে অনেকস্থলেই ইহার ভাবের সামঞ্জস্যও দেখা যায়। যেমন মুসলমান শাস্ত্রে বলে যে, আল্লার কোন পুত্র সন্তান নাই। তিনি জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বশক্তিমান। তাঁহার উপরে কেহ নাই তিনি কখনও মানুষরূপ ধারণ করেন না এবং জগতে কোন বস্তুর সহিত তাঁহার উপমা চলে না। সেইরূপ হিন্দুদের রাধাকেও প্রধানা বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠা গোপী বলা হইয়া থাকে। রাধার সহিত জগতের আর কাহারও তুলনা চলে না। রাধারও কোন পুত্র সন্তান নাই। এবং

তাঁহাকেও ‘হ্লা’ বা হ্লাদিনী শক্তি বলিয়া বর্ণণা করিয়া থাকে। আল্লার দোস্ত বা বন্ধু যেরূপ হজরত মোহাম্মদ, রাধারও সেইরূপ বন্ধু শ্রীকৃষ্ণ। অধিকন্তু হিন্দুগণ কেবল এই রাধা শক্তিকে মানুষরূপে সাজাইয়াছে এই মাত্র প্রভেদ দেখা যায়। কিন্তু ব্যাসদেব এই অপরাধের জন্য শেষে ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনাও করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে রাধা ও কৃষ্ণের কোন মূর্ত্তি হইতে পারে না এবং কোনও বস্তুর সহিত তাহার তুলনা চলে না। বাঙ্গলার সাধক গোবিন্দ চৌধুরী মহাশয় তাই একটি গানে বলিয়াছেন যে, অল্প ভাগ্যে অবৈরাজ্ঞে চিনিবে কিসে শ্রীরাধায়? অতএব দুগ্ধস্থ মাখনের সহিত পরমাপ্রকৃতি রাধার তুলনা করাও ভূল। কিন্তু আল্লা বা রাধার সহিত মাখনস্থ সূক্ষ্ম জোতির্ম্ময় ব্রহ্মবস্তুর সামঞ্জস্য ভাব বর্ত্তমান আছে অর্থাৎ আল্লার স্বরূপ সূক্ষ্মভাবে পুষ্পের সুবাসের ন্যায় এক মাখনেই পরিদৃষ্ট হয় এইরূপ বলা যাইতে পারে। বিশেষতঃ মাখনও এক হিসাবে রসময় নিরাকার ব্রহ্মবস্তু বটে। মুসলমানদের কলেমা, “লা এলাহা ইল্ আল্লা মোহাম্মদ রছুলউল্লা” এই বাক্যের জাৎও ছিপাত অর্থাৎ সামঞ্জস্য ভাব ও স্বভাব এক দুগ্ধেই পরিদৃষ্ট হয়। মোসলমানদের কোর্-আনে সাধারনতঃ চারিটি কলেমা আছে। যথা—আউয়েল কলেমা তৈয়ব, দৈয়ম কলেমা সাহাদত, ছিয়ম কলেমা তহিদ্ ও চাহারম কলেমা তম্‌জিদ। এই প্রধান চারিটি কলেমার ভিতর আউয়েল কলেমা—“লা এলাহা ইল্ আল্লা মোহাম্মদ রছুল উল্লা” ইহাকে তৈয়ব বা পাক্ (পবিত্র) অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়। শুধু এই কলেমার পোষকতার জন্যই অবশিষ্ট তিনটি কলেমার আবশ্যক হয়। ‘লা’ অর্থে নাই। “এলাহা ইহা এলাহুন্ শব্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে অর্থাৎ বহু সংখ্যক বা অনেক ঈশ্বর। “ইল্ আল্লা” অর্থাৎ আল্লা ব্যতীত। মোহাম্মদ রছুল উল্লা” অর্থে মোহাম্মদ আল্লার রছুল বা “বন্ধু। এই কলেমার প্রকৃত অর্থ এই যে, জগতে আল্লা ব্যতীত অন্য কোনও

ঈশ্বর নাই, আর মোহাম্মদ আল্লার রছুল বা বন্ধু। এই কলেমার ভাবার্থ বা জাৎ ও ছিপাত এক দুগ্ধেই যে, পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে তাহার প্রমান এই যে, দুগ্ধকে মন্থন করিলে বা তাহাতে টক্‌রস বা পিত্তরস মিশ্রিত হইলে, যে ঘোল বা ছানার জল দৃষ্ট হইয়া থাকে এক অর্থে উহা কিছুই নহে অর্থাৎ উহা 'ফানা' বা নশ্বর। কিন্তু তাহা হইতে যে, মাখন বা ছানা প্রাপ্ত হওয়া যায় উহাই ঐ দুগ্ধের ভিতরের সমস্ত সত্ব। আর যে, পূর্ব্ব কথিত ঘোল বা ছানার জল পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে উহা এক হিসাবে কিছু না হইলেও পূর্ব্বে কিন্তু দুগ্ধের ভিতর ঐ মাখনের বা ছানার রছুল বা বন্ধু-রূপেই বর্ত্তমান ছিল। অর্থাৎ মাখনের বা ছানার সহিত প্রানে প্রানে মিশিয়া ছিল। এইরূপ আমরা বহির্জগতেও যাহা কিছু দেখিতে পাই এক হিসাবে সকলই তাহা নশ্বর। কিন্তু ইহার ভিতর এক সর্ব্ব-শক্তিমান ব্রহ্ম বা আল্লাহুই হক্‌বর বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আবার অন্য দিকে জগতে অমাদের যতপ্রকার খাদ্যবস্তু আছে তাহা সকলই বিষাক্ত বা নশ্বর কিন্তু ইহার ভিতর দুগ্ধস্থ মাখন বা ছানাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খাদ্যবস্তু। হিন্দুদের 'ওঁ' শব্দটি যে, ঈশ্বর পদবাচ্য ইহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। ইহাতে 'অ'কার, 'উ'কার এবং 'ম'কার এই তিনটি অক্ষর বর্ত্তমান আছে। ইহা ভগবানের একটি সাঙ্কেতিক নাম, ইহাকে বেদের প্রণব ও বলিয়া থাকে। মুসলমানদের আল্লাহু বাক্যটিরও সাঙ্কেতিক চিহ্নস্বরূপ তিনটি অক্ষর আছে। যথা 'আলেপ্' 'লাম্' 'মিম্'। হিন্দুর 'ওঁ' কারের 'অ' 'উ' 'ম' এবং মুসলমানদের আল্লাহুর 'আলেপ্ ''লাম' 'মিম্', একই অর্থবোধক। যেমন হিন্দুর 'ওঁ' কারএর, 'অ' এবং 'উ' সাধন বলে যোগ করিতে পারিলে, 'ম'কার অর্থাৎ মায়া ত্যাগ হয়; সেইরূপ মুসল-মানদের ও আল্লাহুর 'জিকির' দ্বারা 'আলেপ' এবং লামে অর্থাৎ আহাদে এবং উহাদে যোগ হইলে মিমের তালা আপনিই খুলিয়া যায় অর্থাৎ মায়া ত্যাগ হয়। যেমন হিন্দুর 'ওঁ' কাবের 'অ' কার অর্থ পরমাত্মা বা পরমব্রহ্ম 'উ' কার অর্থ জীবাত্মা এবং 'ম' কার অর্থ মায়া; তদ্রূপ

মুসলমানদের ও আল্লাহুর 'আলেপ' অর্থ সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহু বা আহাদ্ অর্থাৎ পরমাত্মা, 'লাম' অর্থ জীবাত্মা বা উহাদ্ এবং 'মিম্' অর্থে মায়া বা মৃত্যুকেই বুঝায়। যেমন হিন্দু শাস্ত্রে বলে মায়া মানবের কণ্ঠদেশের নীচে বর্ত্তমান আছে; তদ্রূপ মুসলমানদের মিম্ অরক্ষরটির আকৃতি ও মানবের কণ্ঠদেশের নীচেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অর্থাৎ মানুষের কণ্ঠের নীচে যেন দুইদিক হইতে দুইটি মিম্ অক্ষর আঁসিয়া যুক্ত হইয়া আছে। উহাকেই মুসলমান শাস্ত্রে মারেফতে মিমের তালা বা মায়া বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। মুসলমানদের আলেপে যে, আল্লা বা আহাদ্, লামে যে জীবাত্মা বা উহাদ্ অর্থ বুঝাইয়া থাকে; মাতৃগর্ভে মানবতনুর সৃষ্টি প্রকরণের প্রারম্ভেই ঐ আহাদে এবং উহাদে অর্থাৎ আহাদের ,আ' বা 'হা' ও উহাদের 'উ' বা 'হু' একত্রে 'আ' 'উ' বা 'হা' 'হু' যোগ হওয়াকেই কর্দ্দমে নির্ম্মিত আদমতনুর ভিতর খোদার নূর বা জ্যোতি ফুৎকারের ভাব সামঞ্জস্য হইয়া রহিয়াছে। এইরূপে জগতের প্রত্যেক প্রাণীরই মাতৃগর্ভে দেহে প্রাণ সঞ্চার হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ আরম্ভের সহিত সর্ব্বপ্রথমে সর্ব্বশক্তিমান আলাহুর জ্যোতিবানুর প্রবিষ্ট হয় বলিয়া অর্থাৎ "আহাদের" 'আ' বা 'হা' এবং উহাদের 'উ' বা 'হু' যোগ হইয়া থাকে বলিয়াই, মুসলমান শাস্ত্রে, জগতের প্রত্যেক কার্য্যই আরম্ভ করিবার সময় সর্ব্বাগ্রে 'বিচমিল্লাহু' বলিয়া সকল কার্য্য আরম্ভ করিবার বিধান রহিয়াছে।

'ওঁ' কার শব্দ ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কাহারও উচ্চারন করিবার অধিকার নাই বলিয়া হিন্দু শাস্ত্রে বিধান রহিয়াছে। এইহেতু ব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবত গীতায় ঐ 'ওঁ" কারের 'ম' কার বাদ দিয়া সর্ব্বসাধারণের জন্য 'অ' কার এবং 'উ' কার শব্দ মিলিত করিয়া বৃন্দাবনের বংশী ধ্বনী রূপে বর্ননা করিয়া রাখিয়াছেন। হিন্দুর এই 'অ' কার বা 'আ' কার এবং 'উ' কার হইতেই বংশীধ্বনী স্বরূপ 'হা', 'হু' শব্দ বাহির হইয়াছে। তাই হিন্দু শাস্ত্রে বলে যে, স্বর্গে 'হা' 'হা', 'হু' 'হু',

নামক গায়কগণ বর্ত্তমান আছেন। গোমাতাকে দোহন কালে যে এই 'হা' 'হা', 'হু' 'হু', শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে ইহাকেই বৃন্দাবনের বংশীধ্বনি রূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। এবং সমুদ্রের অনন্ত জলরাশি হইতেও সদা সর্ব্বদা এই 'হা' 'হা', 'হু' 'হু', শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে। মুসলমানদের মারেফতে অর্থাৎ সিদ্ধির দেশে আল্লাহু বাক্যের সাঙ্কেতিক চিহ্ন স্বরূপ 'আলেপ' 'লাম' ও 'মিম্'এর 'মিম্' বাদ দিয়া শুধু 'আলেপ' ও 'লামের' অর্থাৎ আহাদের 'আ' বা 'হা' এবং উহাদের 'উ' বা 'হু' বা অন্যার্থে হাচেন এবং হুচেন শব্দ বাহির হইয়াছে। অর্থাৎ 'হা' এবং 'হু' শব্দই হাচেন এবং হুচেন শব্দরূপে রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। মুসলমানগণ মহরম পার্ব্বন উপলক্ষে যে হাচেন, হুচেন শব্দ করিয়া থাকেন সরিয়ত মতে (সংসারী লোকের মতে) তাহাকে, ইমাম্ হাচেন, ও ইমাম্ হুচেনের জন্য খেদ প্রকাশ করা হয় বলিয়াই উক্ত হয়। কিন্তু মারেফতে কামেল পীরগণ, 'হা', 'হু' শব্দ বা হাচেন, হুচেন শব্দ দ্বারা আল্লাহুর জিকির অর্থাৎ জীবাত্মায়, পরমাত্মায় যোগ হয় বা অতি সহজে প্রাণায়ামের কার্য্য সিদ্ধ হয় বলিয়াই ব্যাখ্যা করেন। বাঙ্গলার চট্টগ্রাম জিলাস্থ "মাইজভণ্ডারী" গ্রামে যে মাননীয় কামেল পীরসাহেব বর্ত্তমান আছেন, তাঁহার শিষ্যগণ শুধু 'হা', 'হু' শব্দ দ্বারাই আল্লাহুর জিকির বা প্রাণায়ামের কার্য করিয়া থাকেন। পূর্ব্ব বঙ্গের মুসলমান ফকির সম্প্রদায়ের ভিতর একটি গানে বলে, "এই খাঁচার ভিতর 'হুচেন পাখী' কেমনে আসে যায়"। এই গানের ভাবার্থেও বুঝা যায় যে, 'হুচেন' বা হু শব্দ জীবাত্মাকেই নির্দ্দেশ করে। হিন্দু শাস্ত্রে বলে শব্দই ব্রহ্মস্বরূপ। কবির প্রভৃতি সাধকগণ এই শব্দ ব্রহ্মকে ধরিয়াই ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন।

খৃষ্টীয়ানদের বাইবেলেও বলে,—"আদিকালে বচন (শব্দ) ছিল এবং বচন ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল ও বচনই ঈশ্বর ছিল। উহাই আদিতে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিল। উহারই দ্বারা সকল বস্তু সৃষ্ট

হইয়াছে এবং যাহা সৃষ্ট হইয়াছে তাহা কিছু মাত্রই বচন ব্যতিরেকে সৃষ্ট হয় নাই। উহাতে জীবন ছিল এবং সেই জীবন মনুষ্যদিগের আলোক ছিল।”

বাঙ্গলার শ্রীগৌরাঙ্গ ও সর্ব্বসাধারণের জন্য শব্দব্রহ্মরূপ উচ্চ হরিণাম কীর্ত্তন, সাধনের প্রধান অঙ্গ বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে গোমাতাকে সাম বেদ স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি। হিন্দুশাস্ত্রে বলে যে, সামবেদ গীত বা শব্দময়। গোমতাকে দোহন কালে যে, শব্দ শ্রুত হইয়া থাকে উহাকেই ব্যাসদেব বৃন্দাবনের বংশীধ্বনি স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অতএব শব্দময় গোদুগ্ধেই মনুষের জীবন (Life) এবং প্রেম (Love) বর্ত্তমান রহিয়াছে। গোদুগ্ধস্থ খাদ্যস্বরূপ প্রকৃতি ও পানীয় স্বরূপ পুরুষের মিলন ও বিচ্ছেদরূপ অনন্ত পিরীত প্রণয়ের ভাব লইয়াই মানব জগতে প্রকৃতি পুরূষের মিলন এবং বিচ্ছেদরূপ পিরীত প্রণয়ের ভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মুসলমান শাস্ত্রে, হজরতমোহাম্মদের কন্যা ফতেমা বিবিকে, জগতের গোমাতা বা দুগ্ধবতী প্রাণিশক্তিরূপকে এবং তদ্‌পুত্র ইমাম্ হাচেন ও ইমাম্ হুচেন একত্রে দুগ্ধশক্তিরূপকে আবৃত হইয়া আছেন। এবং বিষ সংযোগে ইমাম্ হাচেনের মৃত্যু হইলে অর্থাৎ দুগ্ধে পিত্তরস মিশ্রিত হইলে, ছানাশক্তি সদৃশ ইমাম্ হুচেন; কারবালা মাঠে, হায়! রছুল!! হায়! রছুল!! অর্থাৎ জল জল বলিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অতএব ইমাম্ হুচেনকে দুগ্ধস্থ ছানাশক্তি স্বরূপ ধরিয়া লইলেই, দামস্কের চৌরাস্তার মোড়ে মোড়ে যে, তাঁহার মুণ্ড, কাফের এজিদ্ কর্ত্তৃক ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল তাহা বাস্তবিকই প্রতিপন্ন হয়। কারণ ছানা নির্ম্মিত খাদ্যবস্তু প্রত্যেক সহরের চৌরাস্তার মোড়েই সাধারণতঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে। মুসলমান শাস্ত্রে বলে যে, ঐ সময় হিন্দুদের কৃষিজাত খাদ্য স্বরূপা দ্রৌপদীর

বস্ত্র হরণের প্রায় অনুরূপ হজরত মোহাম্মদের এক স্ত্রী সতী উম্মাছলেমাকে, কারবালা হইতে দামস্ক যাইবার পথে কাফের এজিদের লোক কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা হইতে হইয়াছিল। এবং ঐ সময়ে দ্রৌপদীর অনুরূপ তাঁহারাও পরিহিত বস্ত্র, কেহ কেহ বলেন, চল্লিস গজ; কেহ কেহ বলেন, সত্তর গজরূপে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। এবং মুসলমান শাস্ত্রেও বলে, হিন্দুদের মহাভারতে বর্ণিত প্রায় দুঃশাসনের ন্যায় ঐ সমস্ত অত্যাচারী কাফেরদের ও তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হইয়াছিল। ইহা হইতে স্পষ্টতঃই বুঝা যায় দ্রৌপদীর ন্যায় সতী উম্মাছলেমাও জগতে কৃষিজাত শস্যকণারূপ খাদ্যশক্তিরূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছেন।

বাঙ্গালার নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার "হাটপত্তন" নামক বৈষ্ণব গ্রন্থে বলিয়াছেন,—"গৌরাঙ্গের দুটিপদ, যারধন সম্পদ, সেই জানে ভক্তিরস সার।" এই বাক্যের স্থুলার্থে এই বুঝায়, যে ব্যক্তি শ্রীগৌরাঙ্গের যুগল চরণ সর্ব্বদা ধ্যান ধারণা করেন তিনিই প্রকৃত রসিক ভক্ত। কিন্তু এই বাক্যের সুক্ষ্মার্থ এই যে, যিনি শ্রীগৌরাঙ্গের ভিতর পুরুষপদ ও স্ত্রীপদ একাধারে বর্ত্তমান আছে জানিয়া ঐ অনন্ত পুরুষ ও প্রকৃতিরূপ শ্রীগৌরাঙ্গকে ধ্যান ধারনা করেন, তিনিই প্রকৃত রসিক ভক্ত বলিয়া বিবেচিত হন।

আর একটি আবশ্যকীয় কথা এই যে, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার "হাটপত্তন" নামক গ্রন্থে হাটপত্তনের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন যে,—"চারিদিকে চারিরস কোঠরা পুরিয়া, হরিনাম দিল তার চৌদিকে বেড়িয়া"। এই বাক্যের ভাবার্থে—বৈষ্ণবদের ভিতর নানাজনে নানাপ্রকার অর্থ করিয়া থাকেন বটে কিন্তু ইহার প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, এস্থলে হাট পত্তনার্থে জগতে মানব সৃষ্টির প্রথম সময়কেই নির্দ্দেশ করিতেছে। চারিরস অর্থে-- গো, মেষ, মহিষ ও ছাগল দুগ্ধকে বুঝাইতেছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই চারিপ্রকার রস বা দুগ্ধই ব্রহ্মার চারিদিকস্থ চারি মুখরূপে

শাস্ত্রে বর্ণিত রহিয়াছে। তাই এই চারিপ্রকার রস বা দুগ্ধ জগতের মানবের জন্য ভগবান উপরোক্ত চারিপ্রকার প্রাণিগণের স্তন বা পালানরূপ কোঠরায় পুরিয়া, হরিনামরূপ দুগ্ধ ঐ পালানের চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছেন। নাম ও নামী যে অভেদ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব 'হরিণাম দিল তার চৌদিকে বেড়িয়া'' অর্থে দুগ্ধ তাহার চতুর্দ্দিকে যে বেষ্টন করিয়া রাখা হইয়াছে এস্থলে ইহাই স্পষ্টতঃ ভাবে নির্দ্দেশ করিতেছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তগণকে যড়ভুজ দেখাইয়া ছিলেন বলিয়া বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লেখ রহিয়াছে। তাঁহার ভক্তগণ তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব ভক্তগণ একথা বিশ্বাস করিলেও আপামর সর্ব্বসাধরণে একথা বিশ্বাস করিতে চাহিবেনা। এরূপ স্থলে এঘটনা সম্বন্ধে এরূপ বলা যাইতে পারে যে, মানব দেহে পরব্যোম বা সহস্রারে ত্রকাধারে যে গুরুমূর্ত্তি বর্ত্তমান রহিয়াছেন, অনন্ত পুরুষ ও প্রকৃতি হিসাবে তাঁহার চারিহস্ত এবং তৎসঙ্গে প্রত্যেক জীবাত্মার বা জীবের দুইহস্ত বর্ত্তমান আছে। এইরূপ অধ্যাত্মিকতত্ত্ব হিসাবে জগতের প্রত্যেক মানুষের দেহে ছয়হস্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। শ্রীরাঙ্গ এই অধ্যাত্মিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া ভক্তগণকে দেখাইয়া ছিলেন বলিয়াই মনে হয়।

খৃষ্টিয়ানদের বাইবেলে বর্ণিত যীশুর আগমনের পথ যেমন যোহন কর্ত্তৃক পরিস্কৃত হইয়াছিল, তদ্রূপ বর্ত্তমানে বাঙ্গালা দেশের ফরিদপুরে প্রভুজগবন্ধুর দ্বারাও বিষ্ণু ও কল্কির আগমন পথ পরিস্কার হইয়াছে। কারণ তাঁহার মহানাম কীর্ত্তনে যে বাক্য রহিয়াছে তদ্বারাই উহা প্রকাশ করিতেছে। যেহেতু প্রভুজগদ্বন্ধুর মহানাম কীর্ত্তনে বলে, "হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু মহা উদ্ধারণ, চারিহস্ত চন্দ্রপুত্র হাকীট পতন। আমি পূর্ব্বেই আপনাদিগকে জানাইয়াছি যে, গোদুগ্ধই বিষ্ণু বা হরি অর্থাৎ হরিপুরুষ সদৃশ এবং জগতের বন্ধুস্বরূপ। এই গোদুগ্ধই বর্ত্তমান যুগের জীবগণকে মৃত্যুর হাত হইতে উদ্ধার করিবে।

তাই পবিত্র কোর্-আনেও বলে যে, রসময়শক্তি বা দুগ্ধশক্তি সদৃশ হজরতমোহাম্মদ ভিন্ন কিয়ামতের সময় অন্য কেহ জীবের পাপ ক্ষমাকরিতে সক্ষম হইবেনা। এবং বাইবেলেও তদ্রূপ বলিতেছে যে, দুগ্ধশক্তিরূপ প্রভু যীশু ভিন্ন অন্য কেহ পুরুত্থানের সময় জীবগণকে ত্রাণ করিতে সক্ষম হইবেনা। এইজন্য বাইবেলে যীশু বলিয়াছেন, "আমিই পুনরুত্থান এবং আমিই অনন্ত জীবন।" গোদুগ্ধই গোমাতার চন্দ্রশক্তি হইতে উৎপন্ন হয়। এইজন্য জগদ্বন্ধুর মহানামে গোদুগ্ধকেই চন্দ্রপুত্র বলা হইয়াছে। গোদুগ্ধে খাদ্য ও পানীয় বস্তু একধারে বর্ত্তমান আছে বলিয়া খাদ্য ও পানীয় শক্তিরূপ অনন্ত প্রকৃতি পুরুষের চারিহস্তও উহাতেই বর্ত্তমান আছে। এই গোদুগ্ধেই কৃবিজাত ও অন্যান্য অনাসক্ত তাড়িৎযুক্ত খাদ্যবস্তুর বিষকে বা কীটকে নষ্ট করে বা ঐ কীটের পতন হয়। ইংরাজিতে মিল্টনের প্যারাডাইস্ লষ্টেও যে, এই কীট বা শয়তানের পতনের কথা উল্লেখ আছে, তাহা পূর্ব্বেও একবার বলিয়াছি। হিন্দুর "মধুসূদন" শব্দের অর্থ মধু কৈটভ নামে দৈত্য বা কীটকে নিসূদন করেন যিনি। অর্থাৎ তাহা শুধু গোদুগ্ধ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকেই নির্দ্দেশ করে। বাঙ্গালার বৈষ্ণবগণ বলেন, জয়দেব গোস্বামীর গ্রন্থে বর্ণিত, বিশেষ একটি স্থান হিন্দুর দ্বাপর যুগের অবতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণস্বয়ং কলিযুগে অবির্ভূত হইয়া ভক্তের মন রক্ষার্থে নিজ হস্তে লিখিয়াছিলেন। একথা ভক্তগণের বিশ্বাস যোগ্য হইলেও জগতের সকলে তাহা সহসা স্বীকার করিতে চাহিবেনা। এরূপ স্থলেও এই বলা যাইতে পারে যে, যখন কোন গ্রন্থ লেখক বা কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া কোন বিষয়ে চিন্তায় নিমগ্ন হন তখন তাঁহার মন বহির্জ্জগতের ভাবের সহিত বিছিন্ন হইয়া পড়া খুবই সম্ভব পর কথা। অনেক সময় অনেক স্থলে দেখা যায়, ঐরূপ ভাবেনিমগ্ন ব্যক্তিগণ অন্যমনস্কভাবে অনেক কথায় "হা' কিম্বা 'না' বলিয়াও শেষে বাস্তব জগতে মন ফিরিয়া আসিলে তখন ঐ 'হা' কিম্বা "না"

কথার জন্য প্রতিবাদ করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা ঐরূপ 'হাঁ' কিম্বা 'না' বলেন নাই। এবং অনেক সময় দেখা যায় ঐরূপ ভাবে নিমগ্ন ব্যক্তিগণ সময় মত পান ভোজন করিয়াও বিস্মৃতি হেতু পুনর্ব্বার পান ভোজন করিতে চাহেন। যখন কোন মানুষ ভগবৎ প্রেমে মত্ত হইয়া ঐ অবস্থা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ যখন তাঁহাদের জীবাত্মা দ্বিদল চক্র ভেদ করিয়া পরব্যোমে বা সহস্রদল পদ্মে শ্রীগুরুর ধামে পৌছায়, তখন ঐরূপ ভাবাপন্ন ব্যক্তিকে হিন্দুমতে শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। অতএব জয়দেব গোস্বামীর গ্রন্থ ঐরূপ তন্ময় অবস্থায় তাঁহা দ্বারাই লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। পরে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান উপস্থিত হইলে বিস্মৃতি হেতু স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের হস্তে লিখিত বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ ঐরূপ তন্ময় অবস্থায় হাতের লেখা সাধারণ অবস্থার হাতের লেখার অক্ষর হইতে ভিন্ন আকারের হওয়াই সম্ভব পর কথা।

বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালার এবং জগতের অন্যান্য দেশের বহু মণীষী ব্যক্তিগণ, বাঙ্গালার ভগবান রামকৃষ্ণ পরহংসদেবকে যুগাবতার বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যে, প্রকৃতই যুগাবতাররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার আর কোন ভুলনাই।* বিশেষতঃ তাঁহার নামের ভিতর 'রাম' এবং 'কৃষ্ণ' এই দুইটি শব্দ যোগ হওয়াই উহার বিশেষ প্রমান বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাঁহার প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীগুরুর ঐশীশক্তি প্রভাবেই এক সময় আমেরিকার সিকাগু সহরে জগতের ধর্ম্মমহাসভায় বিনা নিমন্ত্রণে উপস্থিত হইয়াও জগতে হিন্দুধর্ম্মের বেদ, বেদান্তের গুঢ়-মর্ম্মসকল প্রচার করিয়া জগৎবাসীকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ নানাভাবে নানা পুস্তিকা দ্বারা বর্ত্তমান বাঙ্গলা বা তথা কথিত বর্ত্তমান ভারতকে এক নূতন ভাব ধারায় অনুপ্রাণিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এবং তিনি বলিয়া গিয়াছেন, "একদিন এই পরাধীন ভারতবর্ষই জগতের ধর্ম্মগুরু হইবে।" ভগবান রামকৃষ্ণের

জীবনচরিত হইতে স্পষ্ট বুঝাযায় যে, তিনি ভারতের স্বামী শঙ্করা-
চার্য্যের ন্যায় শিব বা হরশক্তিরূপেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং
তিনি মাতৃদুগ্ধের পাণীয় শক্তিরূপকে আবৃত হইয়া আছেন। যেহেতু
আমি পূর্ব্বে মাতৃস্থনকে শিবলিঙ্গ বা শিবশক্তি সদৃশ বলিয়া বর্ণণা
করিয়াছি। এবং তখনবলিয়াছি, মাতৃস্তনের কণ্ঠদেশে যে বিষরূপ
নীলবর্ণ স্থান দৃষ্ট হয়, উহাই মহাদেবের নীলকণ্ঠ নামের পরিচয় স্থল।
ভগবান রামকৃষ্ণের জীবন বৃত্তান্তেও জানাযায় যে, তাঁহার কণ্ঠে ক্যান-
সার বা বিষ সংযুক্ত ঘা হওয়াতেই তিনি অন্তর্ধ্যান হন। অতএব
তিনি মাতৃস্তনরূপে বা শিবলিঙ্গরূপে রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছেন
বলিয়াই মনে হয়। এবং তিনি তাই কালীভক্তই ছিলেন। তিনি,
কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। এই কামিনী-
কাঞ্চনের ভাবার্থে কৃষিজাত খাদ্যবস্তুকেই বিশেষ রূপে নির্দ্দেশ করে।
যেহেতু গোদুগ্ধই নিষ্কামকাঞ্চন সদৃশ। অতএব তিনি কামিনী-
কাঞ্চণরূপ কৃষিজাত ভক্ষ্যবস্তু ত্যাগ করিয়া শুধু গোদুগ্ধ সেবন বিধিই
ইঙ্গিতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

এস্থলে ভারতের শিখধর্ম্ম প্রবর্ত্তক বাবা নানক সাহেবের বিষয়
কিছু উল্লেখ করা সঙ্গত। বাবা নামক, ধর্ম্ম জগতে যে সকল
উপদেশবানী প্রচার করিয়াছেন, তাহা যে গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে
তাহাই "গ্রন্থ সাহেব" নামে সুপরিচিত। শিখগণ, এই পবিত্র "গ্রন্থ
সাহেবকে" অতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিয়া ও থাকেন। বাবা নামক,
"অকাল নিরঞ্জন" কে উপসনা করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।
এই 'অকাল' শব্দের অর্থ, নাই কাল বা মৃত্যু যাহাতে। এই 'অকাল'
শব্দ হইতেই শিখগণ 'অকালী' বা 'আকালী' অর্থাৎ অমৃতের সন্তান
বলিয়া সুপরিচিত। নির নাই অঞ্জন অর্থাৎ কালিমা বা মৃত্যু
যাহাতে। তাহাকেই "নিরঞ্জন" বলা হয়। এই সকল বাক্যের
ভাবার্থে শুধু গোদুগ্ধকেই নির্দ্দেশ করে। অতএব সর্ব্বশক্তিমান "অকাল
নিরঞ্জন" চিন্ময়রূপে শুধু গোদুগ্ধেই বিশেষরূপে বর্ত্তমান আছেন।

আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এইযে,— প্রভু যীশুর ক্রুশারোপনের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান জগতে নানাদেশের নানাস্থানে, বহুযুগাবতার, বহুভবিষ্যৎবক্তা, বহুসমাজতন্ত্রী, বহুসাম্রাজ্যবাদী ও বহুজড়বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হইতে দেখা যাইতেছে। এইজন্যই বোধহয় বাইবেলে প্রভুযীশুখৃষ্ট, তাঁহার পুনরাগ মনের পূর্ব্বের ঘটনা সকল বর্ণনাস্থলে বলিয়াছেন,—"তখন যদি কেহ তোমদিগকে বলে, দেখ, সেই খৃষ্ট এখানে, কিম্বা ওখানে, তোমরা বিশ্বাস করিওনা। কেননা ভাক্ত খৃষ্টেরা ও ভাক্ত ভাববাদিরা উঠিবে, এবং এমন মহৎ মহৎ চিহ্ন ও অদ্ভূত অদ্ভুত লক্ষণ দেখাইবে যে, যদি হইতে পারে, তবে মনোনীতদিগকেও ভুলাবে। দেখ, আমি পূর্ব্বেই তোমাদিগকে বলিলাম। অতএব লোকে যদি তোমাদিগকে বলে, দেশ, তিনি প্রান্তরে, তোমরা বাহিরে যাইওনা; দেখ, তিনি অন্তরাগারে, তোমরা বিশ্বাস করিওনা।

কারণ বিদ্যুৎ যেমন পূর্ব্বদিক হইতে নির্গত হইয়া পশ্চিমদিক পর্য্যন্ত প্রকাশ পায়, তেমনি মনুষ্য পুত্রের আগমন হইবে।"

আবার যোহন লিখিত সুসমাচারে বর্ণিত যিরূশালেমে প্রদত্ত যীশুর উপদেশ স্থলে বলে, যীশু কহিলেন, "তোমাদের পিতৃপুরুষ অব্রাহাম আমার দিন দেখিবার আশায় উল্লাসিত হইয়াছিলেন এবং তিনি তাহা দেখিলেন ও আনন্দ করিলেন। তখন যীহুদীরা তাঁহাকে কহিল তোমার বয়শ এখনও পঞ্চাশবৎসর হয়নাই, তুমি কি অব্রাহামকে দেখিরাছ? যীশু তাঁহাদিগকে কহিলেন, সত্য, সত্য' আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, অব্রাহামের জন্মের পূর্ব্বাবধি আমি আছি।" ঐ যোহন লিখিত সুসমাচারে, যীশুর নিস্তারপর্ব্বে যিরূশালামে উপদেশ দিবার সময় বর্ণিত আছে, "তখন লোকসমূহ তাঁহাকে উত্তর করিল, আমরা ব্যবস্থা হইতে শুনিয়াছি যে, খৃষ্ট চিরকাল থাকেন"।

আবার মথিলিখিত সুসমাচারে যীশুর কবর হইতে উত্থান ও শিষ্যদের প্রতি তাঁহার শেষ আজ্ঞায় বর্ণিত আছে যে, যীশু কহিলেন, "আর দেখ, আমি যুগান্তর পর্য্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে আছি।" উপরোক্ত এই সকল ঘটনা হইতে স্পষ্টতঃই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, প্রভু যীশুখৃষ্ট প্রকৃতই দুগ্ধশক্তিরূপে, জগতে প্রত্যহ আমাদের কাছে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। যীশুর পুনরাগমন অর্থে এই বুঝায়, যখন জগতের লোকসকল জানিতে পারিবে যে, দুগ্ধশক্তিই প্রকৃত প্রভুযীশুখৃষ্ট, তখনই তাঁহার পুনরাগমন নির্দ্দেশ করিতেছে। অতএব কেহ যদি বলে, 'দেখ প্রভু যীশু এখানে, দেখ, প্রভু যীশু ওখানে, কিম্বা কোন প্রান্তরে দাঁড়াইয়া আছেন অথবা তিনি মানবের অন্তরে নিহিত আছেন', তবে তাহা কাহারাও বিশ্বাস করা সঙ্গত নয়। বিদ্যুৎ যেমন মূহুর্ত্ত কালের মধ্যে জগতে প্রকাশ পাইয়া একসঙ্গে সকলেরই কাছে প্রতিফলিত হয়, তদ্রূপ জগতে দুগ্ধশক্তিই যে, প্রভু যীশুখৃষ্ট সদৃশ, এই সুসমাচার যখন জগতে পরিব্যপ্ত হইয়া পড়িবে তখন ক্ষণ প্রকাশিত বিদ্যুতের ন্যায় জগতের সকলেই একসঙ্গে তাঁহাকে দর্শন করিবে বা জগতে তাহার পুনরাগমন অনুভব করিতে সক্ষম হইবে। যেহেতু প্রভুযীশুখৃষ্ট যে দুগ্ধশক্তি সদৃশ, বর্ত্তমান জগতের মনুষ্য সমাজ, তাহা একরূপ অপরিজ্ঞাতই রহিয়াছে। এবং এই অর্থেই তাঁহার পুনরাগমের কথা বলা হইয়াছে। প্রভু যীশু যে দুগ্ধশক্তি সদৃশ এই ভাবার্থেই বাইবেলে লূক লিখিত সুসমাচারে প্রভু যীশুখৃষ্টের পুনরাগমন সম্বন্ধে বলিতেছে—"আর তৎকালে তাহারা মনুষ্যপুত্রকে পরাক্রম ও মহা প্রতাবসহকারে মেঘযোগে আসিতে দেখিবে।" অতএব "মেঘযোগে আসিতে দেখিবে" অর্থে মেঘ বা জলবৎ রসময় দুগ্ধশক্তিরূপে জগতের নিকট তিনি যে প্রতিভাত হইবেন, এস্থলে ইহাই প্রকাশ করিতেছে। বাঙ্গলায়, রাজা রামমোহন রায়, প্রেরিত পুরুষ বা অবতাররূপেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যেহেতু তাঁহার প্রচারিত নিরাকার এক ব্রহ্মের উপসনার্থে শুধু দুগ্ধ সেবনকেই নির্দ্দেশ করিতেছে।

নবম অধ্যায়।

পবিত্র কোর্-আনে, পশুদিগের দুগ্ধ ও মধুর উপকারিতা সম্বন্ধে যে সকল উপদেশ বাণী বর্ণিত রহিয়াছে, সূরা 'নহল' হইতে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আপনাদিগকে জানাইতেছি। যথা—"এবং নিশ্চয় তোমাদিগের নিমিত্ত পশুদিগের মধ্যে উপদেশ আছে, তাহাদের উদরে যাহা আছে তাহা হইতে আমি তোমাদিগকে পান করাইয়া থাকি, মল ও শোনিতের ভিতর হইতে পানকারীদিগের জন্য বিশুদ্ধ সুস্বাদু দুগ্ধ হয়।" "এবং তোমার প্রতিপালক (হে মোহাম্মদ) মধুমক্ষিকার প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছেন যে, তুমি পর্ব্বত সকলের ও বৃক্ষ সকলের মধ্যে এবং (মানুষ) যে ('গৃহ') উন্নমিত করে তাহাতে গৃহ সকল প্রস্তুত কর। তৎপর তুমি প্রত্যেক ফল ভক্ষণ কর। অনন্তর বিনীত ভাবে তোমার প্রতিপালকের পথে চলিতে থাক।" তাহার উদর হইতে বিবিধ বর্ণের পেয় দ্রব্য, যাহাতে লোকের আরোগ্য হয়, বাহির হইয়া থাকে, নিশ্চয় তাহাতে চিন্তাশীল দলের জন্য নিদর্শন আছে।"

উপরোক্ত আয়াতে যে বলা হইয়াছে, "নিশ্চয় তাহাতে চিন্তাশীল দলের জন্য নিদর্শন আছে।" এই নিদর্শন শব্দের ভাবার্থে মুসলমান শাস্ত্রে বলে, "এ বিষয়ে (মধু ও মধুমক্ষিকা সম্বন্ধে) যাহারা

চিন্তা করে তাহাদের জন্য নিদর্শন সকল আছে। মধু মক্ষিকার প্রকৃতি ঈশ্বরের একটি আশ্চর্য্য ক্রিয়া। তাহারা প্রত্যাদেশ ভিন্ন জীবন ধারণ করে না। জ্ঞানময় শক্তিময় ঈশ্বর দ্বারা পরিচালিত হইয়া সেই ক্ষুদ্র দুর্ব্বল জীব কেমন জ্ঞান কৌশলের কার্য্য সকল করে। কখনও মধু মধুমক্ষিকা তাঁহার আজ্ঞার বিরুদ্ধ পথে চলে না, তাহারা আশ্চর্য্য মধু প্রদান করে, বিশুদ্ধ বস্তু আহার করিয়া থাকে, স্বীয় দল পতির অবাধ্য হয় না, বহু ক্রোশের পথ চলিয়া গিয়াও পুনর্ব্বার গৃহে ফিরিয়া আইসে। তাহারা ষট্ কোন গৃহ সকলে যে শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়া থাকে পৃথিবীর সমুদয় সুনিপুণ শিল্পী একত্র হইয়া যত্ন করিলেও সেরূপ করিতে পারে কিনা সন্দেহ। যেমন মধুদ্বারা বাহ্যিক রোগের উপশম হয়, সেইরূপ মধু-মক্ষিকার প্রকৃতি আলোচনার দ্বারা আন্তরিক রোগ যে অজ্ঞনতা তাহা দুরীভূত হয়।" আমি পূর্ব্বে আপনাদিগকে যে বলিয়াছি, মক্কার পবিত্র কা'বা গৃহ মৌচাক্ররূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। উপরোক্ত ঘটনা সকলের ভাবার্থেও কা'বাগৃহকে মৌচক্র সদৃশ বলিয়াই প্রতিপন্ন হয় কিনা তাহা আপনারা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। প্রকৃতই পবিত্র কোর্-আনে, জগতের মুসলমান-সমাজকে মধুমক্ষিকা রূপকে এবং মক্কায় পবিত্র কাবাগৃহকে মৌচাক্র রূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। এইজন্যই মধুমক্ষিকা সদৃশ মুসলমানগণ, জগতের যেস্থানেই থাকুক না কেন? ঈশ্বর উপাসনার সময় মৌচক্র সদৃশ পবিত্র কাবাগৃহের দিকে তাহাদের মুখ ফিরাইতে বলা হইয়াছে। তাই মৌচক্রের ন্যায় কা'বাগৃহকেও 'প্রত্যাবর্ত্তনভূমি' বলা হয়।

হিন্দুশাস্ত্রে ব্যাসদেব বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকা লীলায় শ্রীমদ্ভাগবতে যেরূপ দুগ্ধ ও মধু সম্বন্ধে রূপকচ্ছলে ভগবানের লীলা বর্ণণা করিয়া রাখিয়াছেন, তদ্রূপ কোর্-আনের সূরা 'নহলেও' দুগ্ধ এবং মধুর উপকারিতা বর্ণিত রহিয়াছে। কোর্-আন হইতে জানা যায় যে, হজরত মোহাম্মদ প্রায় প্রত্যেক দিন সন্ধ্যার সময় মধুর

সরবৎ পান করিতেন এবং কোন ব্যক্তি ব্যধিগ্রস্থ হইয়া হজরতের নিকট উপস্থিত হইলে অনেকস্থলে তিনি তাহাদিগকে শুধু মধু পান করিবার ব্যবস্থা করিতেন।

পশুদিগের উদরে কি প্রকারে দুগ্ধ প্রস্তুত হয় সে সম্বন্ধে মুসলমান শাস্ত্রে বলিতেছে যে, "পশুগণ তৃণাদি ভক্ষণ করিলে তাহা পাকস্থলীতে যখন পরিপাক হইতে থাকে তখন তিনটি থাক হয়, নিম্ন থাকে মল, মধ্যস্থলে দুগ্ধ, উপরে থাকে শোনিত উৎপন্ন হইয়া থাকে। রক্ত শিরা সকলেও দুগ্ধস্তনে সঞ্চারিত হয়, এবং মলস্বীয় নির্দ্দিষ্ট পথে বাহির হইয়া যায়, দুগ্ধ ও শোনিত মলেতে স্থিতি করে না। ভক্ষিত জীর্ণ দ্রব্য সকলের সারভাগ হৃৎপিণ্ড আকর্ষণ করিয়া থাকে, স্থূল অসার অংশ যে, মল তাহা পরিত্যাগ করে। প্রথম পরিপাকের পর ভক্ষিত দ্রব্য হইতে যে রস নির্গত হয় তাহা পাকস্থলীতে জীর্ণ হইয়া কফ, রক্ত, পিত্ত ও [পীতরস] উৎপাদন করে, এবং সেই সকল যথোপযুক্তরূপে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে সঞ্চারিত হয়। যখন কোন জন্তু গর্ভ ধারণ করে স্ত্রী প্রকৃতির সরসতায় বৃদ্ধি প্রযুক্ত তাহার ভক্ষ্য দ্রব্যের অনুরূপ উপরিউক্ত চতুর্ব্বিধ রস বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, এবং সেই বর্দ্ধিত রস গর্ভকোষে ভ্রূণের জন্য সঞ্চারিত হয়। সন্তান প্রসূত হইলে তাহা পয়োধরে প্রবেশ করে, পয়োধরে মাংসপেশী সকলের সংস্পর্শে সেই রস শুভ্র হইয়া যায়, উহাকেই দুগ্ধ বলে।"

"পশুগণ হরিদ্বর্ণ তৃণ ও পত্রাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহাদের মাংস পেশীর ভিতর দিয়া এইরূপ শুভ্র ও সুস্বাদুরস নির্গত হওয়া ও রক্তের সঞ্চার হওয়া স্পষ্ট অলৌকিকতা ও উজ্জ্বল নিদর্শন"।

মুসলমানদের পবিত্র কোর্-আনের সূরা 'বকরা'তে ঈশ্বর দুগ্ধ সম্বন্ধে মোতাশাবেহাতুন বা আলঙ্কারিক ভাবে হজরত মোহাম্মদের নিকট অনেক আয়াৎ 'নাজেল' অর্থাৎ অবতরণ করিয়াছেন এবং কিপ্রকারে মৃত জীবিত হইতে পারে, তদসম্বন্ধেও অনেক আয়াৎ আলঙ্কারিক ভাবে

প্রকাশ করিয়াছেন। মুসলমানদের পবিত্র কোর্-আনে মৃতকে জীবিত করিবার প্রণালী সকল যেরূপ স্পষ্টভাবে সহজভাষায় "সুরাবকরায়" বর্ণিত রহিয়াছে, জগতের অন্য কোন ধর্ম্ম গ্র তদ্রূপ স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ঐসকল আয়াতের প্রকৃত মর্ম্ম এক হজরত রসুলউল্লা ও তাঁহার একান্ত প্রিয় শিষ্যগণ ভিন্ন তখন জগতের আর কেহ তাহা জানিত না। আমি নিম্নে উহার দুই একটি আয়াৎ আপনাদের বোধার্থে প্রকাশ করিতেছি। আরবী ভাষায় বক্‌রা অর্থে গাভীকেই যে বুঝায় তাহা পূর্ব্বেও বলিয়াছি।

"যাহারা বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকার্য্য করিয়াছে তাহাদিগকে (হে মহাম্মদ,) তুমি এই সুসংবাদ দান করযে, তহাদের জন্য স্বর্গের উদ্যান সকল আছে যাহার নিম্ন দিয়া পরঃ প্রণালী সকল প্রবাহিত হইতেছে; তখন তাহা হইতে ফলপুঞ্জ উপজীবিকারূপে তাহদিগকে দেওয়া যাইবে তখন তাহারা বলিবে আমাদিগকে পূর্ব্বে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে উহা সেই ফল; আকারে পরস্পর সাদৃশ্য গৃহিত হইবে"। এস্থলে স্বর্গ উদ্যানের অর্থে আলঙ্কারিকভাবে দুগ্ধবতী প্রাণীগণকে এবং স্বর্গফল অর্থে উহাদের দুগ্ধকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। যেহেতু দুগ্ধবতী প্রাণীগণের দেহের নীচে পয়ঃপ্রণালী অর্থাৎ দুগ্ধ নির্গত হইবার বাঁট সকল বর্ত্তমান আছে। "আমাদিগকে পূর্ব্বে যাহা প্রদত্ত হইয়াছে ইহা সেই ফল আকারে পরস্পর সাদৃশ্য গৃহীত হইবে"। এই কথার ভাবার্থ এইযে, বর্ত্তমানমরজগতেও এখন মানুষের পান ভুজনের জন্য দুগ্ধ ব্যবহৃত হইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে, কিন্তু যখন এই জগৎ স্বর্গে পরিণত হইবে তখনও শুধু এই দুগ্ধই তথায় বিশ্বাসী দিগকে ঈশ্বর পান ভুজনের জন্য দান করিবেন এবং তখন ঐ স্বর্গস্থ বিশ্বাসী লোক সকল বলিবে যে ইহা আমরা মরজগতেও পাইয়া ছিলাম বটে। এই হেতুই বলা হইতেছে যে, পৃথিবীর খাদ্য ও স্বর্গের খাদ্যের সহিত আকারে

পরস্পর সাদৃশ্য গৃহীত হইবে। "স্বর্গের খাদ্য বা স্বর্গফল," ঈশ্বর প্রদত্ত জীবিকা, "দ্বাদশ প্রস্রবণের জল" এবং আদি মানব আদম ও ইভের জন্য ঈশ্বর স্বর্গে বা ইডেন উদ্যানে যে খাদ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা সকলই শুধু দুগ্ধকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। এই কথা সত্য কিনা তাহা বিষধরূপে বুঝাইবার জন্য আমি কোর-আনের স্থরা বকরা হইতে মুসার দ্বাদশ প্রস্রবনে আঘাত ইত্যাদি বাক্য, নিম্নে পুনরুক্তি করিয়া আপনাদিগকে জানাইতেছি। "এবং যখন মূসা স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য জল প্রার্থনা করিয়াছিল, আমি তখন বলিয়াছিলাম, "তুমি স্বীয় যষ্টিদ্বারা প্রস্তরে আঘাত কর" অনন্তর তাহা হইতে দ্বাদশ প্রস্রবন নির্গত হইল, নিশ্চয় প্রত্যেক ব্যক্তি আপনার আপনার ঘাট জানিতে পারিল, (আমি বলিলাম) ঈশ্বর প্রদত্ত জীবিকা হইতে ভক্ষণ ও পান কর আর তোমরা পৃথিবীতে অত্যাচারীরূপে অত্যাচার করিয়া ফিরিও না। এবং যখন তোমরা বলিলে, "হে মুসা, আমরা একবিধ খাদ্যে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিবনা, অতএব আমাদের জন্য তোমার ঈশ্বরকে আহ্বান কর, ক্ষেত্রে শাক' কাঁকড়ি ,গোধুম মসুর, পলাণ্ড জন্মে তিনি যেন আমাদিগের নিমিত্ত এই সকল দ্রব্য বাহির করেন।" সে বলিল, 'তোমরা কি নিকৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে উৎকৃষ্ট বস্তুর বিনিময় কর্ত্তে চাহ? কোন নগরে অবতির্ণ হও, পরে তোমরা যাহা চাহিতেছ তাহা নিশ্চয় তোমাদের জন্য হইবে," পরে তাহাদের উপর দুর্দ্দশা ও দারিদ্রতা নিপতিত এবং তাহারা ঈশ্বরের আক্রোসের সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হইল; যেহেতু তাহারা ঐশ্বরিক নিদর্শন সকলের প্রতি বিশ্বাস করিতেছিল না ও তত্ত্ব বাহদদিগকে অযথা বধ করিতেছিল, অপরাধ করিয়াছিল বলিয়া এইরূপ ঘটিল, এবং তাহারা সীমা লঙ্ঘন করিতেছিল।" উপরোক্ত বাক্যের দ্বাদশ প্রস্রবন অর্থে গাভীর চারিটি বাঁট, মহিষের চারিটি বাঁট, ছাগলের দুইটি বাঁট ও ভেড়ার দুইটি বাঁট মিলিত হইয়া দ্বাদশ

প্রস্রবণ রূপকে যে, আবৃত্ত হইয়া রহিয়াছে, ইহা আমি পূর্ব্বে আদম ও ইভের ইতিবৃত্তেও বলিয়াছি। কিন্তু এখন কথা হইতেছে যে, আরব দেশ মরুভূমিময়, তথায় মহিব থাকা একরূপ অসম্ভব। তথায় মহিষের স্থলে উট ও গর্দ্দভের দুগ্ধই ব্যবহৃত হইয়া থাকে এবং গো, মেষ, ছাগল, উট ও গর্দ্দভ ইহাদেরও একত্রে ঐরূপ বারটি বাঁটই বর্ত্তমান আছে অতএব এস্থলে দ্বাদশ প্রস্রবণ অর্থে এই পাঁচটি দুগ্ধবতী প্রাণীর বাঁটকেও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ কোরআন এবং বাইবেলে মহিষের উল্লেখ বড় দেখা যায় না। তদস্থলে উষ্ট্র এবং গর্দ্দভের কথাই বর্ণিত রহিয়াছে। অথবা দ্বাদশজাতীয় দুগ্ধবতী প্রাণীর স্তনকেও দ্বাদশ প্রস্রবণ ধরা যাইতে পারে। এই দ্বাদশ প্রস্রবণের ভাবার্থ হইতে দুগ্ধশক্তিরূপ প্রভু যীশুখৃষ্টের, দ্বাদশজন শিষ্য ছিল বলিয়া পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত রহিয়াছে। মুসা তাঁহার স্বজাতীর জন্য দ্বাদশ প্রস্রবণের জলরূপে ঐ সকল প্রাণীগণের দুগ্ধকেই "ঈশ্বর প্রদত্ত জীবিকারূপে" প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইজন্যই বলা হইয়াছে যে, "ঈশ্বর প্রদত্ত জীবিকা হইতে ভক্ষণ ও পান কর।" জল কখনও পানভুজন করা যায় না। কিন্তু দুগ্ধতেই মানবের পানভুজন রূপ পানীয় ও খাদ্যবস্তু বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু মুসার স্বজাতিগণ বলিল, "আমরা একবিধ খাদ্যে ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিব না," অর্থাৎ শুধু দুগ্ধ খাইয়া জীবিত থাকিতে পারিব না। তাই তাহারা কৃষিজাত খাদ্যবস্তু—শাক, কাঁকড়ি, গোধুম, মসুর ওপলাণ্ড প্রভৃতি খাদ্যরূপে পাইতে প্রার্থনা করিয়াছিল। তাহাতেই মুসা বলিয়াছিলেন যে, এই সমস্ত শস্য-কণারূপ নিকৃষ্ট খাদ্যের সহিত ঐ সকল দুগ্ধবতী প্রাণীগণের দুগ্ধরূপ উৎকৃষ্ট খাদ্যকে, তোমরা কেন বিনিময় করিতে চাহ? যদি একান্ত পক্ষেই তোমরা এই সমস্ত কৃষিজাত খাদ্য গ্রহণ কর তবে কোন নগরে অবতীর্ণ হও। অর্থাৎ স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া পৃথিবীতে গমন করা এবং তথায় নানা দুঃখ দারিদ্রের সহিত (খোদার গজবের সহিত)

মিলিত হইয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা ইত্যাদি বুঝাইতেছে। এবং এস্রাইলবংশীয় লোকদিগকে পূর্ব্বে যে 'মান্না' ও 'সলওয়া' তাহাদের আহারার্থ ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইত তাহাও যথাক্রমে মেষ দুগ্ধ ও ছাগ দুগ্ধকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। এখন নিম্নে সুরা বকরা হইতে গোহত্যা বা গোকোরবাণীর আলঙ্কারিকভাব জানাইতেছি, "এবং (স্মরণ কর) যখন মুসা স্বজাতিকে বলিয়াছিল, "নিশ্চয় ঈশ্বর একটি গোহত্যা করিতে তোমাদিগকে আজ্ঞা করিয়াছেন" তাহারা বলিল, "তুমি কি আমাদিগকে উপহাস করিতেছ"? মুসা বলিয়াছিল, ঈশ্বরের স্মরণাপন্ন হই যে, আমি অজ্ঞান লোকদিগের অন্তর্গত হইব"। তাহারা বলিল, "তুমি আমাদের জন্য স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে প্রার্থনা কর যেন তিনি আমাদের নিমিত্ত ব্যক্ত করেন, তাহা (উক্ত গো) কীদৃশী সে বলিল, "সত্যই ঈশ্বর বলিতেছেন, নিশ্চয়ই সেই গো প্রাচীনা নয় নবীনা নয়, এতন্মধ্যে মধ্য বয়স্কা, অতএব যে বিষয়ে আদিষ্ট হইয়াছ তাহা সম্পাদন কর" তাহারা বলিল, "তুমি আমাদের জন্য স্বীয় প্রতিপালকের নিকটে প্রার্থনা কর যেন, তিনি আমাদের নিমিত্ত ব্যক্ত করেন যে, তাহার বর্ণ কিরূপ? "সে বলিল, "সত্যই ঈশ্বর বলিতেছেন, নিশ্চয় সেই গো পীতবর্ণ তাহার বর্ণ অতীব পীত, উহা দর্শকগণকে সন্তোষ প্রদান করে।" তাহারা বলিল "তুমি আমাদের জন্য স্বীয় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর যেন তিনি আমাদের নিমিত্ত ব্যক্ত করেন যে, তাহা কিরূপ? [আমাদের প্রতি সেই গো সন্দেহ স্থল,] এবং ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে নিশ্চয় আমরা সৎপথ প্রাপ্ত হইব" সে বলিল "সত্যই তিনি বলিয়াছেন নিশ্চয় সে গো ভূমি কর্ষণে ও ক্ষেত্রে জল সিঞ্চনে ব্যবহৃত হয় নাই, সে নির্দ্দোশ তাহাতে তিলাঙ্ক নাই"। তাহারা বলিল, "এখন তুমি সত্য উপস্থিত করিয়াছ"। অনন্তর তাহারা তাহাকে (গো পশুকে) হত্যা করিতে অপ্রস্তুত সত্ত্বেও তাহা করিল।" এস্থলে এখন আপনারা বিচার করিয়া দেখুন যে, জীব হিংসা বা জীব হত্যা যদি পাপ

বলিয়া কথিত হয় তবে ঈশ্বর বাক্য কখনও হিংসা মূলক হইতে পারে না। ঈশ্বর গোহত্যা বা গো কোরবানী করিতে বলিলেন, নিশ্চই এই গোহত্যা বা গো কোরবানী অর্থাৎ পশুবধের ভাব জগতের প্রত্যেক ধর্ম্মপুস্তকে মোতাশাবেহাতুন্ অর্থাৎ আলঙ্কারিক ভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। পূর্ব্বে একবার বলিয়াছি যে, কোরবানী শব্দের প্রকৃত অর্থ "আত্মবলির নিদর্শন" বা কোন বস্তু বা কোন প্রাণীকে কোন যন্ত্র দ্বারা বিদীর্ণ করা বা ক্রুশে বিদ্ধ করা। অর্থাৎ আমাদের ভক্ষ্যবস্তুকে দন্তরূপ যন্ত্রদ্বারা চর্ব্বণ করা বা দুগ্ধে টকরস বা পিত্তরস মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধকে হত্যা করিয়া বা দধিতে পরিণত করিয়া মন্থনদণ্ডরূপ যন্ত্রদ্বারা মন্থন করা বা ক্রুশে বিদ্ধ করা নির্দ্দেশ করে। অতএব এস্থলেও গোদুগ্ধে টকরস বা পিত্তরস মিশ্রিত করার ভাবই "গোহত্যা" করা আলঙ্কারিকভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। যেহেতু এস্থলে মুসা বলিলেন, "ঈশ্বর বলিয়াছেন সেই গো পীতবর্ণ, তাহার বর্ণ অতীব পীত, উহা দর্শকগণকে সন্তোষ প্রদান করে।" আপনারা অনেকেই হয়তো অবগত আছেন এবং আমি ও পূর্ব্বে দুই একবার বলিয়াছি যে, গোদুগ্ধের বর্ণই প্রকৃত পীতবর্ণ। আবার মুসা বলিলেন, "ঐ গো প্রাচীনা নয় ও নবীনাও নয়, এতন্মধ্যে মধ্য বয়স্কা"। এই কথা হইতেও বেশ বুঝা যায় যে, ইহাতেও শুধু গো দুগ্ধকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। কারণ ইহা বোধ হয় আপনাদের ভিতর অনেকেরই জানা আছে যে, গাভী প্রসূত হওয়া মাত্র তাহার দুগ্ধ পানকরা সকল দেশেই নিষিদ্ধ। যেহেতু পল্লীগ্রামে এখনও দেখাযায়, গাভী প্রসূত হইলে কোন স্থলে পনের দিন কোন স্থলে একুশদিন পরে মানুষ উহার দুগ্ধ খাদ্যরূপে ব্যবহার করে। এইরূপে গাভী কিছুদিন দুগ্ধ দিবার পর যখন তাহার বৎস ক্রমান্বয়ে বড় হইয়া উঠে এবং দুগ্ধও প্রায় শেষ হইয়া পড়ে, তখন যে যৎসামান্য দুগ্ধ হয় উহা অনেক স্থলেই ঈষৎ লালবর্ণ তরল পুঁজের ন্যায় তখন দৃষ্ট হয় এবং অনেকস্থলেই লবণাক্ত বলিয়াও বিবেচিত

হয়। অতএব সেইসময়ের দুগ্ধ প্রায় অনেকেই পানকরে না। এই অর্থেই ঐ গোদুগ্ধরূপ গোকে, "নবীনা ও নয় প্রাচীনা ও নয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ ঐ প্রথম অবস্থার দুগ্ধ এবং সর্ব্বশেষ অবস্থার দুগ্ধ অস্বাস্থ্যকর বলিয়াই বিবেচিত হয়। এবং আবার বলা হইয়াছে যে, "সে নির্দ্দোষ তাহাতে তিলাঙ্ক নাই, এবং ভূমিকর্ষণে ও ক্ষেত্রে জল সিঞ্চনে ব্যবহৃত হয় নাই" এই সকল কথার ভাবার্থ হইতেও বুঝা যায় যে, উহা গোজাতিকে না বুঝাইয়া বরং এইস্থলে শুধু গোদুগ্ধকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। অতএব এস্থলে গোহত্যা বা গোকোরবানীর ভাবার্থ এই যে, গোদুগ্ধে পিত্তরস বা টক্‌রস মিশ্রিত করিয়া শরযষ্টিদ্বারা মন্থন করা বা ক্রুশে বিদ্ধ করা। এবং ঐরূপ প্রকরণেই সচরাচর গোদুগ্ধকে হত্যা বা নষ্ট করা হয়। আর একটি কথা এই যে, মুসা ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া তাঁহার স্বজাতিদিগকে একটি গোহত্যা করিতে বলিলেন। অথচ তাঁহার স্বজাতিরা সেই গো এক কথায় হত্যা না করিয়া বরং ঐ গো সম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিল। এবং তাহারা বলিল, "ঐ গো আমাদের সন্দেহস্থল" ইহার ভাবার্থ হইতেও স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে যে, মুসা শুধু একটি গো পশুকে হত্যা বা জভ করিবার জন্য প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলেন না বরং গোদুগ্ধকে টকরস বা পিত্তরস সংযোগে নষ্ট করাই এস্থলে মোতাশাবেহাতুনরূপে প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ কোর্-আনে ইহার পরের আয়াতে এই গোহত্যার যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছে তাহা হইতে আপনারা বোধ হয় অতি সুস্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারিবেন যে, শুধু গোদুগ্ধকেই টকরস বা পিত্তরস মিশ্রিত করিয়া মন্থনদণ্ড দ্বারা মন্থন বা ক্রুশে বিদ্ধ করার ভাবই উহাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। যেহেতু পরের আয়াতে বলা হইয়াছে,—"এবং (স্মরণ কর) যখন তোমরা এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়া তদ্বিষয়ে পরস্পর বিবাদ করিতেছিলে এবং তোমরা যাহা গোপন করিতেছিলে ঈশ্বর তাহার প্রকাশক

হইলেন। অনন্তর আমি বলিলাম,—"তাহার (হত গোর) অঙ্গ বিশেষ দ্বারা তাহাকে (হত ব্যক্তিকে) আঘাত কর"। এইরূপে ঈশ্বর মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদিগকে নিজের নিদর্শন সকল প্রদর্শন করিয়া থাকেন, যেন তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। অতঃপর তোমাদের অন্তঃকরণ কঠিন হইল, অনন্তর তাহা পাষাণসদৃশ বরং কাঠিন্যে তদপেক্ষা কঠিন হইল, নিশ্চয় কোন প্রস্তর আছে যে, তাহা হইতে প্রস্রবণ সকল নিঃসৃত হয়, নিশ্চয় তাহাদের কোনটি বিদীর্ণ হইয়া যায়; অনন্তর তাহা হইতে জল নির্গত হয় এবং নিশ্চয় তাহাদের কোনটি ঈশ্বরের ভয়ে অধঃপতিত হইয়া থাকে এবং তোমরা যাহা করিতেছ তাহা ঈশ্বরের অগোচর নহে। অনন্তর (হে বিশ্বাসী লোক সকল), তোমরা কি আশা কর যে, ইহারা তোমাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিবে নিশ্চয় ইহাদের এক মণ্ডলী ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করিতেছে, তৎপর তাহারা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার পরিবর্ত্তন করিতেছে ও তাহারা তাহা জ্ঞাত আছে"। উপরোক্ত আয়াত সম্বন্ধে মুসলমানশাস্ত্রে বলে, "কথিত আছে যে, এস্রায়িল জাতির একজন নিহত হইয়াছিল। অনুসন্ধানে হত্যাকারীকে না পাওয়াতে ঈশ্বর বলিলেন, "একটি গোহত্যা কর ও সেই হত পশুর অঙ্গ বিশেষ দ্বারা নিহত ব্যক্তির শরীরে আঘাত করে, তাহাতে সে জীবিত হইয়া কে তাহাকে হত্যা করিয়াছে ব্যক্ত করিবে। পরে সেইরূপ আচরণ করিলে হতব্যক্তি জীবিত হইয়া হত্যাপরাধী স্বীয় পৃতৃব্য পুত্রদিগের নাম উল্লেখ করিল। অনন্তর হত্যাকারীগণ হত্যাপরাধের শাস্তি প্রাপ্ত হইল।" এখন আপনারা চিন্তা করিয়া দেখুন কোর্-আনে বলিতেছে যে, "হত গোর অঙ্গ বিশেষ দ্বারা হতব্যক্তিকে আঘাত করিয়া ঈশ্বর মৃতব্যক্তিকে জীবিত করিয়া থাকেন।" 'হতগো' অর্থে যদি পিত্তরস মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধকে মন্থন দণ্ড দ্বারা মন্থন করা অর্থ হয়, তবে তাহার অঙ্গ বিশেষ অর্থে মাখন ও ঘৃত প্রভৃতিকেই বুঝায়। অতএব ঐ সকল বস্তুদ্বারা

যে কোন প্রকরণেই হউক মৃতব্যক্তিকে যে, জীবিত করা যাইতে পারে এস্থলে ইহাই কোর্-আনের এই আয়াতে আলঙ্কারিকভাবে প্রকাশ করিতেছে। আর বিশেষতঃ কোর্-আনের এই বাণীর সহিত, বাইবেলে বর্ণিত প্রভু যীশু কর্তৃক মৃতকে জীবন দান এবং হিন্দুর রামায়ণে বর্ণিত রামের চরণ স্পর্শে পাষাণ মানব হওয়া, মহাভারতে বর্ণিত পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ ও তদ্‌পুত্র রাজা জন্মেজয়ের সর্পযজ্ঞ করা প্রভৃতি কার্য্য সকলের ভাবার্থেরও সামঞ্জস্য রহিয়াছে। আমার প্রিয় মণীষী মোসলেম ভগিনী ও ভ্রাতাগণকে বিনীতভাবে আমি জানাইতেছি যে, কোর্‌আনে বর্ণিত এই গো কোরবাণী সম্বন্ধে কোন প্রকার ভূল অর্থ করিয়া মুসলমান ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উপর কোন প্রকার বিদ্বেষ ভাব প্রচার করা বা তাঁহাদের বর্ত্তমান প্রথানুযায়ী গো কোরবানীর উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা আমার উদ্দেশ্য নয়। কোর্-আনের এই আয়াতের প্রকৃত মর্ম্ম বিচার করিয়া উহার প্রকৃত অর্থ প্রকাশ করাই আমার উদ্দেশ্য। বিশেষতঃ আমি যে অর্থ করিতেছি তাহা মুসলমানশাস্ত্র, হিন্দুশাস্ত্র এবং খৃষ্টান শাস্ত্রের সহিত সকলেরই পরস্পর মৃতকে জীবিত করিবার ভাব নানা আলঙ্কারিকভাবে যে, একই বস্তুশক্তির ভিতর নিহত রহিয়াছে তাহাও এস্থলে দৃষ্ট হয়। এবং এই সকল শাস্ত্র যখন ঈশ্বর 'বাক্য বলিয়া জগতে বিদিত তখন তাহার অর্থও যে, এক ভাবাপন্ন হওয়াই সম্ভবপর কথা ইহাতেও আর কোন প্রকার সন্দেহ থাকিতে পারে না। এবং হিন্দুদের দেবতা বিশেষের নিকট পশু বলি বা পশু হত্যাও এইরূপ আলঙ্কারিক ভাবেই বর্ণিত রহিয়াছে। আজকাল ভারতের বহু হিন্দুসম্প্রদায় এই পশু বলির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেও কোন কোন স্বার্থপর লৌকিক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ শাস্ত্রের বচন নানাস্থান হইতে উদ্ধৃত করিয়া পশুবধ শাস্ত্র-সম্মত বলিয়া প্রচার করিতেছেন। ভগবৎকৃপায় আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, ঐ সকল পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত নিতান্তই ভূল প্রমাদে

পরিপূর্ণ। তাঁহারা পশু বধার্থে যে ব্যাখ্যা করেন প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য তাহা নহে। এই সকল প্রাণিগণের দুগ্ধে টকরস বা পিত্তরস মিশ্রিত করা কার্য্যই ঐ সমস্ত পশু বধ করা আলঙ্কারিকভাবে যে ধর্ম্মশাস্ত্রে বর্ণিত রহিয়াছে ইহাই ধ্রুব সত্য। বিশেষতঃ পবিত্র কোর্-আনে বর্ণিত উপরোক্ত আয়াতে বলা হইয়াছে, "অনন্তর আমি বলিলাম,—"তাহার (হতগোর) অঙ্গ বিশেষ দ্বারা তাহাকে (হতব্যক্তিকে) আঘাত কর।" এইরূপে ঈশ্বর মৃতকে জীবিত করেন এবং তোমাদিগকে নিজের নিদর্শন সকল প্রদর্শন করিয়া থাকেন, যেন তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয়। অতঃপর তোমাদের অন্তঃকরণ কঠিন হইল, অনন্তর তাহা পাষাণ সদৃশ বরং কাঠিন্যে তদপেক্ষা কঠিন হইল।" এই সকল বাক্য হইতে বুঝা যাইতেছে যে, মানুষ দুগ্ধ হত্যাস্থলে পশুহত্যা করাতেই তাহাদের অন্তঃকরণকে পাষাণ সদৃশ কঠিন বলা হইয়াছে। এবং এই আয়াতের পরে বলা হইয়াছে "নিশ্চয় কোন প্রস্তর আছে যে, তাহা হইতে প্রস্রবণ সকল নিঃসৃত হয়, নিশ্চয় তাহাদের কোনটি বিদীর্ণ হইয়া যায়; অনন্তর তাহা হইতে জল নির্গত হয়।" এই বাক্যের ভাবার্থেও দুগ্ধবতী প্রানিগণের দুগ্ধকেই নির্দ্দেশ করিতেছে কিনা তাহা আপনারা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন। যেহেতু মুসার হস্তস্থিত যষ্ঠি দ্বারা প্রস্তরে আঘাত করাতে তাহা হইতে ঈশ্বর প্রদত্ত জীবিকা স্বরূপ যে দ্বাদশ প্রস্রবণের জল নির্গত হইয়াছিল তাহাও যে দুগ্ধবতী প্রানিগণের দুগ্ধের সহিত রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত আপনাদের নিকট আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর একটি কথা এই যে, হতগোর অঙ্গ বিশেষ যদি গোদুগ্ধস্থ ছানা, মাখন ও ঘৃতকে বুঝায় তবে পবিত্র কোর্-আনে বর্ণিত হালাল খাদ্যরূপ গোমাংস অর্থেও ঐ দুগ্ধস্থ ছানা, মাখন ও ঘৃতকে নির্দ্দেশ করে কিনা তাহাও আপনারা বিবেচনা করিয়া দেখুন। বিশেষতঃ গোদুগ্ধস্থ ছানা, মাখন ও ঘৃত যে হালাল খাদ্য তাহা সর্ব্ব-

ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত বাক্য এবং পবিত্র কোর্‌-আনেও বোধ হয় তাই মোতাশাবেহাতুন বা আলঙ্কারিকভাবে গোদুগ্ধস্থ ছানা, মাখন ও ঘৃতকে গোমংসরূপে বর্ণণা করিয়া রাখিয়াছে। এবং সেইজন্যই উহাকে হালাল বা বিশুদ্ধ খাদ্য বস্তু বলা হইয়াছে।

মৃতব্যক্তিকে যে, কি উপায়ে জীবিত করাযায়, সুরা বকরা হইতে আরও একটি আয়াতের আলঙ্কারিকভাব আপনাদিগকে জানাইতেছি।ঃ—

"এবং যখন এব্‌রহিম বলিল, "হে আমার প্রতিপালক, তুমি কি প্রকারে মৃতকে জীবিত কর আমাকে দেখাও"; তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি বিশ্বাস করনা?" এব্‌রাহিম বলিল, "হাঁ (বিশ্বাস করি,) কিন্তু তাহাতে আমার মনের প্রবোধ হইবে" তিনি বলিলেন, চারিটি পক্ষী গ্রহণ কর তৎপর নিজের নিকটে তাহা-দিগকে চিনিয়া লও, তৎপর তাহাদের মাংসখণ্ডসকল, প্রত্যেক পর্ব্বতে নিক্ষেপ কর, তৎপর তাহাদিগকে আহবান কর, তাহারা দ্রুতগতি তোমার নিকট চলিয়া আসিবে, এবং জানিও ঈশ্বর পরাক্রান্ত ও নিপূণ" এসম্বন্ধে মুসলমানশাস্ত্রে বলে যে, "ময়ূর, কুক্কুট, কাক ও পরাবত এই চারিটি পক্ষী আনিত হইয়াছিল এবং তাহাদিগকে হত্যা করা হইয়াছিল।" এই সকল কথা হইতে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, ময়ূর অর্থে গোদুগ্ধ, কুক্কুট অর্থে ছাগদুগ্ধ, কাক অর্থে মহিষদুগ্ধ বা উটদুগ্ধ ও পরাবত অর্থে মেষদুগ্ধ শক্তিরূপে আলঙ্কারিকভাবেই এস্থলে বর্ণিত রহিয়াছে। অর্থাৎ চারিটি পাখী অর্থে ঐ চারি জাতি দুগ্ধবতী প্রাণিগণের দুগ্ধকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। পূর্ব্বে আমি ও বলিয়াছি, আপনারা ও জানেন যে, আমরা জগতে সচরাচর প্রায় ঐ চারি জাতি প্রাণী হইতেই দুগ্ধ পাইয়া থাকি। অতএব উহাদের দুগ্ধে পিত্তরস বা টকরস মিশ্রিত করাই চারিটি পাখীকে মারিয়া ফেলা রূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। ঐ মৃত পাখীগুলির মাংস

অর্থে উহাদের দুগ্ধ হইতে জাত মাখন বা ঘৃতকেই নির্দ্দেশ করিতেছে এবং তদ্বারাই যে, মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করা যায় এস্থলেও তাহাই প্রমাণ করিতেছে। এবং এস্থলে প্রত্যেক পর্ব্বত অর্থে প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে। অতএব ঐ সমস্ত প্রাণীগণের দুগ্ধ হইতে জাত মাখনের বিশেষ কোন প্রক্রিয়া দ্বারা প্রত্যেক মৃতব্যক্তির দেহে নিক্ষেপ বা যে কোনভাবে আঘাত করিলে, এইরূপে মৃতব্যক্তি যে জীবিত হইতে পারে, এস্থলেও তাহাই প্রমাণ করিতেছে। বিশেষতঃ ময়ূর যে গোদুগ্ধ স্বরূপ তাহার ভাবার্থ এই যে, ময়ূর সর্প (বিষ) ভক্ষণ করে এবং হিন্দুদের গোদুগ্ধরূপ শ্রীকৃষ্ণের মাথার চূড়ায় ও ময়ূরের পাখা দৃষ্ট হয়। কুক্কুট অত্যাধিক কামাশক্ত, ইহারই ভাবার্থে পাঠা বা ছাগলকে নির্দ্দেশ করিতেছে। কাককে হিন্দুসাস্ত্রে যমের বার্ত্তাবহ বলিয়া ব্যাখা করা হইয়া থাকে এবং মহিষকে ও যমের বাহন বলা হইয়া থাকে। ইহারই ভাবার্থে কাককে মহিষ দুগ্ধ নির্দ্দেশ করিতেছে। অথবা মুসলমান শাস্ত্রে বলে যে, উঠের পৃষ্টদেশে যে কুঁজ দৃষ্ট হইয়া থাকে উহাকে মৃত ব্যক্তির কবরকে নির্দ্দেশ করে। ইহার ভাবার্থে ও উঠের দুগ্ধকে কাক পাখী নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কপোত আসঙ্গ লিপ্সুক ইহারই ভাবার্থে মেষদুগ্ধকে বুঝাইতেছে। অতএব চারিটি পাখী উপরোক্ত চারিটি প্রানীর দুগ্ধকেই আলঙ্কারিকভাবে বর্ণণা করিয়া রাখা হইয়াছে। বাইবেলে বর্ণিত ঈশা বা যীশুখৃষ্টরূপ দুগ্ধশক্তি যে, মৃতব্যক্তিকে জীবিত করিতে সক্ষম হয় তাহা কোর্-আনের সূরা "আলোএম্‌রাণে," সূরা "সফ্‌ফে" সূরা "মায়দায়" ও সূরা "ইয়াসে" সমর্থন করিয়াছে। এবং ঈশা যে মৃত্যুর শরবত পান করিয়াছিলেন তাহাও সূরা আলোএম্‌রাণে সমর্থন করিয়াছে। সূরা আলোএম্‌রাণে বলা হইতেছে যে—"এবং এস্রায়িলবংশীয় লোকদিগের সম্বন্ধে প্রেরিত পুরুষ করিবেন, সে বলিবে, "নিশ্চয় আমি (ঈশা) তোমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন সহ তোমাদের

নিকট উপস্থিত, নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্য মৃত্তিকা দ্বারা পতঙ্গবত মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ফুৎকার করি পরে ঈশ্বরের আজ্ঞায় পক্ষী হয়, এবং আমি ঈশ্বরের আজ্ঞায় জন্মান্ধকে ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান করি ও মৃতকে জীবিত করিয়া থাকি, এবং তোমরা যাহা আহার কর, আপন গৃহে যাহা সঞ্চয় কর তাহা তোমাদিগকে বলিয়া থাকি, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে ইহাতে নিশ্চয় তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে।" সূরা "সফ্‌ফে" বলাহইতেছে যে, "এবং (স্মরণ কর) যখন মরয়মের পুত্র ঈশা বলিলেন, "হে বনিএস্রায়িল, নিশ্চয় আমি আমার পূর্ব্ববর্ত্তী তওরাত (ইহুদীদের ধর্ম্মপুস্তক) গ্রন্থে যাহা ছিল তাহার প্রমাণ কারকরূপে ও আমার পরে যে, প্রেরিত পুরুষ যাঁহার মাম আহাম্মদ আগমণ করিবেন তাঁহার সুসংবাদ দাতারূপে ঈশ্বর কর্ত্তৃক তোমাদের প্রতি প্রেরিত—অনন্তর যখন তাহাদের নিকটে সে বহু অলৌকিকতাসহ আগমন করিল, তখন তাহারা বলিল, ইহা স্পষ্ট ইন্দ্রজাল"। অর্থাৎ মহাত্মা ঈশা যে, মৃতকে জীবনদান, জন্মান্ধকে চক্ষুদান ও কুষ্ঠ রোগী প্রভৃতিকে আরোগ্যদান করিয়াছিলেন .তাহা দেখিয়া বনিএস্রায়িল উহাকে ইন্দ্রজাল বলিয়া বর্ণণা করিয়াছিলেন।

সূরা "ময়দায়" বলিতেছে যে, "যখন পরমেশ্বর বলিলেন যে, হে মরয়মের পুত্র ঈশা, তোমার প্রতি ও তোমার মাতার প্রতি আমার দান তুমি স্মরণ কর, যখন আমি তোমাকে পবিত্রআত্মাযোগে সাহায্য করিয়াছিলাম, তুমি দোলায় থাকিয়া (শৈশবকালে) ও মধ্যম বয়সে লোকের সঙ্গে কথা বলিতেছিলে, এবং যখন তোমাকে গ্রন্থ, বিজ্ঞান ও তওরাত এবং ইঞ্জিল শিক্ষা দিয়াছিলাম ও যখন আমার আজ্ঞানুক্রমে তুমি মৃত্তিকা হইতে পক্ষিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলে, অবশেষে তাহাতে ফুৎকার করিয়াছিলে, পরে আমার আজ্ঞানুসারে পক্ষী হইয়াছিল ও আমার আজ্ঞানুক্রমে তুমি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করিয়াছিলে, এবং যখন তুমি আমার আজ্ঞা-

-নুসারে মৃতদিগকে বাহির করিয়াছিলে, এবং যখন আমি এস্রায়িল বংশীয়দিগকে তোমা হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছিলাম, যখন তুমি তাহাদিগের নিকটে অলৌকিক নিদর্শন সকল উপস্থিত করিয়াছিলে তাহাদের মধ্যে যাহারা কাফের ছিল তাহারা বলিয়াছিল, "ইহা স্পষ্ট ইন্দ্রজাল ভিন্ন নহে"। এবং (স্মরণ কর) যখন আমি (তোমার) প্রচারবন্ধুদিগের প্রতি প্রত্যাদেশ করিয়াছিলাম যে, তোমরা আমার প্রতি বিশ্বাসী হও, ও আমার প্রেরিতের প্রতি বিশ্বাসী হও, তাহারা বলিয়াছিল যে, "আমরা বিশ্বাস স্থাপন করিলাম এবং এ বিষয়ে তুমি (হে ঈশা,) সাক্ষী থাক যে, আমরা বিশ্বাসী"। যখন প্রচারবন্ধুগণ বলিল, "হে মরয়মের পুত্র ঈশা, তোমার প্রতিপালক আমাদের নিকটে স্বর্গ হইতে ভোজ্যপাত্র উপস্থিত করিতে পারেন কি"? সে বলিল, "যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তবে ঈশ্বরকে ভয় করিতে থাক"। তাহারা বলিল যে, "আমরা তাহা হইতে ভোজন করিতে ইচ্ছা করি, তাহাতে আমাদের অন্তর শান্তিলাভ করিবে, এবং আমরা জানিব যে, তুমি আমাদিগকে নিশ্চয় সত্য বলিয়াছ, এবং তদ্বিষয়ে আমরা সাক্ষী হইব।" মরয়মের পুত্র ঈশা বলিল, "হে ঈশ্বর, হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের নিকটে ভোজ্যপাত্র স্বর্গ হইতে অবতারণ কর, [তাহাতে আমাদের জন্য ও আমাদের পূর্ব্বও আমাদের অন্ত্য (মণ্ডলীর) জন্য ঈদ্ (উৎসব) এবং তোমার সম্বন্ধে নিদর্শন হইবে, এবং আমাদিগকে উপজীবিকা দান কর, তুমি শ্রেষ্ঠ জীবিকা দাতা।] পরমেশ্বর বলিলেন, নিশ্চয় আমি তাহা তোমাদের প্রতি অবতারণকারী, [অনন্তর তোমাদের যে ব্যক্তি ধর্ম্মদ্রোহী হইবে পরিশেষে নিশ্চয় আমি তাহাকে এমন শাস্তিদান করিব যে, কোন এক জগদ্বাসীকে সেরূপ শাস্তি প্রদান করিব না।] এবং যখন পরমেশ্বর বলিলেন, "হে মরয়মের পুত্র ঈশা, তুমি কি লোক সকলকে বলিয়াছ যে, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আমাকেও আমার জননীকে দুই ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ কর?"

সে বলিবে, "পবিত্রতা তোমারই, যাহা আমার পক্ষে সত্য নহে তাহা আমি বলিব আমার পক্ষে ইহা নহে, যদি আমি তাহা বলিতাম তবে নিশ্চয় "তুমি তাহা জ্ঞাত হইতে; আমার অন্তরে যাহা আছে তুমি জানিতেছ, এবং তোমার অন্তরে যাহা আছে তাহা আমি জ্ঞাত নহি; নিশ্চয় তুমি অন্তর্য্যামী।" "তুমি আমাকে যে আজ্ঞা করিয়াছ, "আমার প্রতিপালক ও তোমাদের প্রতিপালক পরমেশ্বরকে অর্চ্চনা কর" ইহা ব্যতীত আমি তাহাদিগকে বলি নাই; আমি তাহাদের মধ্যে যে পর্য্যন্ত ছিলাম তাহাদের সম্বন্ধে সাক্ষী ছিলাম; পরে যখন তুমি আমাকে দেহচ্যুত করিলে তখন তুমি তাহাদিগের সম্বন্ধে রক্ষকছিলে, এবং তুমি সর্ব্ব বিষয়ে সাক্ষী।" "যদি তুমি তাহাদিগকে শাস্তি দানকর তবে নিশ্চয় তাহারা তোমারই ভৃত্য যদি তুমি তাহাদিগকে ক্ষমা কর তবে নিশ্চয় তুমি পরাক্রান্ত ও নিপুণ।" ঈশ্বর বলিলেন, "এই সেই দিন যে সত্যবাদীদিগকে তাহাদের সত্য লাভমান করিবে, [তাহাদের জন্যই স্বর্গোদ্যান যাহার ভিতর দিয়া পয়ঃ প্রনালী সকল প্রবাহিত, তাহাতে তাহারা সর্ব্বদা থাকিবে, ঈশ্বর তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহারাও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে।" ইহাই মহা সফলতা।] স্বর্গ ও পৃথিবীর রাজত্ব ও উভয়ের মধ্যে যাহা আছে তাহা ঈশ্বরের, এবং তিনি সর্ব্বোপরি ক্ষমতা শালী।"

প্রভু যীশুখৃষ্টের ধর্ম্ম প্রচার বন্ধুগণ, যীশুখৃষ্টকে তাঁহাদের জন্য যে, স্বর্গ হইতে ভোজ্যপাত্র উপস্থিত করিতে বলিয়াছিলেন; সে সম্বন্ধে মুসলমানশাস্ত্রে বলে ঃ—"কথিত আছে যে, সেই ভোজ্যপাত্র রবিবারে অবতীর্ণ হইয়াছিল। তাহাতেই মুসলমানদের শুক্রবারের ন্যায় ঈশায়ীদিগের (খৃষ্টীয়ানদের) রবিবার দিবস উৎসবদিন হইয়াছে।" উপরোক্ত ভোজ্য পাত্র সম্বন্ধে মুসলমানশাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে,—"অনন্তর ঈশ্বর দুইখণ্ড মেঘ প্রেরণ করিলেন। তাহার মধ্যে ভোজ্য জাত পূর্ণ লোহিত বর্ণের ভোজ্যপাত্র

ছিল। [সেই ভোজ্যপাত্র মেঘের ভিতর হইতে মহর্ষি ঈশারধর্ম্মবন্ধুদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইল।] প্রেরিত পুরুষ ঈশা তাহা দেখিয়া সাশ্রুনয়নে বলিলেন, "হে আমার পরমেশ্বর, তুমি আমাকে কৃতজ্ঞ কর।" পরন্তু বলিলেন, "হে ঈশ্বর, এই ভাজ্যপাত্রকে দয়াতে পরিণত কর, শাস্তিতে পরিণত করিওনা।" অনন্তর হস্তপদাদি প্রক্ষালন পূর্ব্বক উপাসনা করিয়া গলদাশ্রুনয়নে বলিলেন. "সর্ব্বোত্তম জীবিকা দাতার নামে প্রবৃত্ত হইতেছি" ইহা বলিয়াই ভোজ্য প্রাপ্ত হইতে আবরণ উদ্ঘাটন করিলেন, দেখিলেন যে, [সুন্দর ভোজ্যপাত্রে ভাজা মৎস রহিয়াছে, তাহাতে চর্ম্ম ও অস্থি নাই, তাহা হইতে তৈল নিঃসৃত হইতেছে। তাহার মস্তকের নিকটে লবণ ও পুচ্ছের নিকটে অম্লরস এবং চতুর্দ্দিকে নানা প্রকার শাক তরকারি ছিল। পাঁচ খণ্ড রুটি ভোজ্যপাত্রে স্থাপিত ছিল, তাহার একটিতে তৈল, একটিতে ঘৃত, একটির উপর পনির, একটিতে মধু ও একটির উপর শুস্ক মাংস দৃষ্ট হইয়াছিল।] এক শিষ্য মহাপুরুষ ঈশাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্য, ইহা সাংসারিক খাদ্য, না পারলৌকিক খাদ্য?" প্রেরিত পুরুষ বলিলেন, "তাহার কিছুই নয়, বরং ইহা এরূপ খাদ্য যে, ঈশ্বর নিজ শক্তিতে সৃষ্টি করিয়াছেন। যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলে তাহা উপস্থিত, ভক্ষণ কর, কৃতজ্ঞ হও, তাহা হইলে সম্পদের বৃদ্ধি হইবে।" শিষ্যগণ বলিলেন, "হে ঈশ্বর প্রাণ ঈশা, যদি তুমি এই অলৌকিক নিদর্শনের সঙ্গে আর একটি অলৌকিকতা প্রদর্শন কর তাহা হইলে আমাদের বিশ্বাস প্রবল হয়।" তখন মহাত্মা ঈশা সেই মৎস্যকে বলিলেন, "জীবিত হও" ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে মৎস্য তৎক্ষণাৎ জীবিত হইল। পুনর্ব্বার তিনি বলিলেন, "পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হও" তাহাতে পুনরায় সেই ভাজা-মৎস্যরূপে প্রকাশ পাইল। অনন্তর শিষ্যগণ ঈশ্বরের বিভীষিকায় ভীত হইয়া ভোজ্যপাত্র হইতে কিছুই ভক্ষণ করিলেন না। মহাত্মা ঈশা ব্যাধিগ্রস্থ দীন

দুঃখী লোকদিগকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, "ইহা তোমরা ভক্ষণ কর, ইহা তোমাদের জন্য সম্পদ্ অন্য লোকের জন্য বিপদ্।" তদনুসারে এক সহস্র তিনজন লোক ভোজন করিল। তাহাতে ভোজ্যপাত্রে যাহা ছিল তাহার কিছুই ন্যূন হয় নাই। এমন দরিদ্র ছিল না যে, তাহা ভক্ষণ করিয়া ধনী হয় নাই, এমন রোগী ছিল না যে আরোগ্য লাভ করে নাই।

মুসলমানশাস্ত্রে বর্ণিত উপরোক্ত কয়েকটী বিশেষ বাক্যের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, যথা—মরয়মের পুত্র ঈশা বলিলেন "হে ঈশ্বর, হে আমদের প্রতিপালক, আমাদের নিকট ভোজ্যপাত্র স্বর্গ হইতে অবতরণ কর, তাহাতে আমাদের জন্য ও আমাদের পূর্ব্ব ও আমাদের অন্ত্য (মণ্ডলীর) জন্য ঈদ্ (উৎসব) এবং তোমার সম্বন্ধে নিদর্শন হইবে এবং আমাদিগকে উপজীবিকা দান কর, তুমি শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।" এস্থলে স্বর্গ হইতে ভোজ্যপ্রাপ্ত অবতরণ করার ভাবার্থ, এই যে, ইহা দুগ্ধবতী প্রানিগণের পালান বা স্তনস্থ দুগ্ধের সহিত রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। যেহেতু প্রভু ঈশা ঐ ভোজ্যপাত্র হইতে আবরণ উদ্ঘাটন করিয়া দেখিলেন যে, "সুন্দর ভোজ্যপাত্রে ভাজা মৎস্য রহিয়াছে, তাহাতে চর্ম্ম ও অস্থি নাই, তাহা হইতে তৈল নিঃসৃত হইতেছে।" এই সকল বাক্যের ভাবার্থে দুগ্ধস্থ ছানা, মাখনকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। এইজন্যই ঈশা বলিয়াছেন "হে ঈশ্বর আমাদিগকে উপজীবিকা দান কর, তুমি শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা" এবং এই সুরায় বলা হইয়াছে যে, "তাহাতে আমাদের পূর্ব্ব ও অন্ত্য (মণ্ডলীর) জন্য ঈদ্ (উৎসব) এবং তোমার সম্বন্ধে নিদর্শন হইবে।" এস্থলে "পূর্ব্ব ও অন্ত্যমণ্ডলী" অর্থে জগতের মোসলেম সম্প্রদায়কে নির্দ্দেশ করিতেছে, যেহেতু তাঁহারা বক্‌রা (গাভী) ঈদ্ (উৎসব) প্রতিপালন করিয়া থাকেন। কিন্তু এই পার্ব্বন উপলক্ষে বর্ত্তমান মুসলমান সম্প্রদায় ঈশ্বরের নামে গোজভ (গো বধ) করিয়া থাকেন। আমি পূর্ব্বেও আপনাদিগকে

কোর্-আনের সূরা বকরা (গাভী) হইতে স্পষ্ট দেখাইয়াছি যে, গোহত্যা অর্থে গোদুগ্ধে টকরস মিশ্রিত বা মন্থন করার কার্য্যই "গোহত্যা" রূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। এবং এস্থলে ও 'বক্‌রা ঈদ' বাক্যের ভাব অর্থে তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। কারণ ঈশা দুগ্ধবতী প্রানিগণের দুগ্ধস্থ মাখনরূপ ভাজা মৎস্যকে একবার জীবিত করিয়াছিলেন এবং একবার মরিয়াছিলেন। এবং এই অলোকিক ঘটনা দর্শন করিয়া যখন তাঁহার প্রচার বন্ধুগণ ঐ ভোজ্যপাত্র হইতে কিছুই গ্রহণ করিলেন না তখন মহাত্মা ঈশা ব্যধিগ্রস্ত দীন দুঃখী লোকদিগকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন "ইহা তোমরা ভক্ষণ কর ইহা তোমাদের জন্য সম্পদ।" এই সকল বাক্য হইতেই বুঝা যায় যে, ঐ ভোজ্যপাত্রস্থ ভাজা মৎস্য দুগ্ধবতী প্রানিগণের দুগ্ধস্থ মাখনের সহিতই রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। আবার বলা হইয়াছে যে, "ভোজ্যপাত্রে যাহা ছিল তাহা কিছুই ন্যুন হয় নাই।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দুগ্ধবতী প্রানিগণকে দোহন করার কিছু সময় পর উহার স্তনে বা পালানে পুনর্ব্বার পূর্ব্বের ন্যায় দুগ্ধ আসিয়া পরিপূর্ণ হয়। আর একটি কথা এই যে "সেই ভোজ্যপাত্র মেঘের ভিতর হইতে মহর্ষি ঈশার ধর্ম্ম বন্ধুদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইল।" এই বাক্যের ও ভাবার্থে দুগ্ধবতী প্রাণীগণের দুগ্ধকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। যেহেতু পর্জ্জন্য (মেঘ) হইতেই অন্ন বা দুগ্ধের উৎপত্তি হয়। অথবা ঐ দুগ্ধ মেঘ বা জলবৎ তরল পদার্থই বটে। পাঁচখানা রুটি অর্থে গো, মেষ, ছাগ, গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের দুগ্ধকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। এস্থলে আর একটি কথা এই যে, যখন পরমেশ্বর বলিলেন, "হে মরয়মের পুত্র ঈসা তুমি কি লোক সকলকে বলিয়াছ যে, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া আমাকে ও আমার জননীকে দুই ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ কর"? সে বলিবে "পবিত্রতা তোমারই, যাহা আমার পক্ষে সত্য নহে, তাহা আমি বলিব আমার পক্ষে ইহা নহে"। এই কথার ভাবার্থ এই যে,

ঈশা স্বরূপ দুগ্ধ ও তাঁহার জননী মরিয়ম স্বরূপ দুগ্ধবতী প্রাণী গোজাতি প্রভৃতিকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করা সঙ্গত নহে। কিন্তু এইসকল প্রাণীগণ জগতের মনুষ্য সমাজের এক হিসাবে মাতৃস্বরূপা, যেহেতু উহারা জগতের মনুষ্য সমাজকে অমৃতসম দুগ্ধ দান করিয়া থাকে। অতএব ঐ পশুগণকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা না করিলেও উহাদিগকে জভ বা বধ করিয়া উহাদের মাংস ভক্ষন না করিয়া উহাদিগকে দয়ার সহিত অতিযত্নে পালন করাই জগতের মনুষ্য সমাজের সকলের পক্ষেই বিধেয়। এইজন্যই প্রভুযীশু বলিয়াছেন, "হে ঈশ্বর এই ভোজ্যপাত্রকে দয়াতে পরিণত কর"। যীশুখৃষ্ট শক্তিস্বরূপ দুগ্ধকে যে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর জ্ঞানে পূজাকরা সঙ্গত নয় এসম্বন্ধে মুসলমানশাস্ত্রে বর্ণিত "মুন্‌সুর্‌ হিল্লালের" উপাখ্যাণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

যেহেতু মুন্‌সুরহিল্লালের জীবন চরিত বিশেষ আলোচন করিয়া দেখিলে বেশ বুঝাযায় যে, তিনিও জগতে দুগ্ধশক্তি রূপকে আবৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি "আয়নালহক্‌" অর্থাৎ আমিই খোদা এই কথা বলার দরুন তৎকালীন মুসলমান সম্প্রদায় তাঁহার শিরচ্ছেদ করিয়াছিলেন। যেহেতু মুসলমানশাস্ত্রানুসারে মানুষ কখনও আল্লা বা খোদা হইতে পারে না। মুন্‌সুর্‌হিল্লাল যে, দুগ্ধশক্তিরূপকে আবৃত ছিলেন তাহার প্রমাণ এই যে, তিনি সরিয়ত মানিতেন না এইজন্য তাঁহর গায়ের চামড়া তুলিয়া ফেলা হইলে পূর্ব্বোক্তভাবে "আয়নালহক্‌" অর্থাৎ আমিই খোদা এইরূপ বলিতে লাগিলেন। শিরচ্ছেদের পর দেহস্থ মাংসখণ্ড এবং ঐ মাংসখণ্ড অগ্নিতে দগ্ধ করিলে উহার ভস্মরাশিও "আয়নালহক" এইরূপ বলিতে লাগিল। তারপর উক্ত ভস্মরাশি এক শিশিতে পূর্ণ করিয়া রাখা হইলে, এক বাদসার কন্যা ঐ শিশি নাকে শুঁকিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ ভস্মরাশির ঘ্রাণ, বাদসার কন্যার ভিতরে প্রবেশ করিয়া, "আয়নালহক্‌" অর্থাৎ আমিই খোদা এইরূপ বলিয়াছিল। এইসকল ঘটনা হইতে বেশ হৃদঙ্গম হয় যে, প্রকৃত প্রস্তাবে

মুন্‌সুরহিল্লাল দুগ্ধরূপকেই আবৃত ছিলেন। যেহেতু দুগ্ধের গায়ের চামড়া তুলিয়া লইলে বা দুগ্ধকে মন্থন করিলে মাখনের উৎপত্তি হয়। এবং মাখনকে অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত করিলে ঘৃতে পরিণত হয় ঐ ঘৃতকে শিশি বা বোতলেই সচরাচয় রাখা হয়। এবং ঐ ঘৃতের ভিতর যে পুষ্পের সুবাসের ন্যায় রসঘনস্বরূপ বাস্পীয় ব্রহ্মপদার্থ বর্ত্তমান আছেন,—তিনি প্রকৃতই পবিত্র আত্মা বা খোদার নুর স্বরূপ। কিন্তু দুগ্ধ বা মাখন খোদা বা ঈশ্বর নহে। এস্থলেও দুগ্ধস্থ মাখন ও ঘৃত যে, মৃতকেও জীবন দান করিতে সক্ষম হয় এই ঘটনায় তাহাই প্রমান করিতেছে।

দুগ্ধশক্তিরূপ যীশুখৃষ্ট যে, রোগীদিগকে আরোগ্য দান এবং অন্ধের চক্ষু দান ও মৃতের জীবন দান করিতে সক্ষম, তৎসম্বন্ধে সুরা "ইয়াসে" বলা হইতেছে যে,—"এবং তুমি (হে মোহাম্মদ,) তাহাদের জন্য সেই গ্রামবাসীদিগের দৃষ্টান্ত বর্ণণ কর, যখন তথায় প্রেরিত পুরুষগণ উপস্থিত হইল, (স্মরণ কর) যখন আমি তাহাদিগের নিকট দুই ব্যক্তিকে প্রেরণ করিলাম, তখন তাহারা তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিল, পরে আমি তৃতীয় ব্যক্তিদ্বারা (তাহাদিগের) পুষ্টি বর্দ্ধন করিলাম, অবশেষে তাহারা বলিল যে, "নিশ্চই আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত"। এই বাক্যের ভাবার্থে মুসলমানশাস্ত্রে বলিতেছে যে, মহাত্মা ঈশা বা যীশুখৃষ্টের স্বর্গাবোহনের পূর্ব্বে কিম্বা স্বর্গারোহনের পর ইয়হা ও তুমান নামক দুইজন প্রেরিতকে কেহ কেহ বলেন অপর দুইজনকে এন্তাকিয়া নগরে ধর্ম্ম প্রচারার্থে প্রেরণ করেন। তাঁহারা নগরের অদূরে উপস্থিত হইয়া এক বৃদ্ধকে দেখেন যে, পশুচারণ করিতেছে, তাহার নিকট গিয়া সেলাম করেন। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা কে হও"? তাঁহারা বলেন, "আমরা মহাপুরুষ ঈশার প্রেরিত, লোক-দিগকে সত্যপথ প্রদর্শন করিয়া থাকি, ঈশ্বরের দিকে যাইতে আহ্বান করি"। বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করেন, "তোমরা যে, সত্য প্রচারক তাহার কোন

প্রমাণ রাখ" ? তাঁহারা বলেন, "হা আমরা রোগীদিগকে আরোগ্যদান করি এবং কুষ্ঠ রোগীকে ও সুস্থ করি"। তখন বর্ষীয়ান পুরুষ বলেন, "বহু বৎসর যাবৎ আমার এক সন্তান পীড়িত, চিকিৎসকগণ তাহর চিকিৎসায় নিরাশ হইয়াছে যদি তোমরা তাহাকে আরোগ্য দান করিতে পার তবে আমি তোমাদের ঈশ্বরের স্মরণাপন্ন হইব"। এতৎশ্রবণে তাঁহারা সেই রোগীর শয্যার পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করেন, তৎক্ষনাৎ সে আরোগ্য লাভ করে। বৃদ্ধ ইহা দেখিয়া প্রেরিত পুরুষদিগের দীক্ষিত হন। ক্রমে সেই দুই প্রেরিতের সংবাদ নগরের সর্ব্বত্র প্রচার হয়, অনেক রোগীই তাঁহাদের নিকট যাইয়া আরোগ্যলাভ করিতে থাকে। আন্তখিশরমী নামক ব্যক্তি সেই নগরের রাজা ছিলেন, তিনি প্রতিমা পূজা করিতেন। প্রেরিত পুরুষদিগের বিষয় শুনিতে পাইলেন যে, তহারা প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে এবং একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনার পক্ষে লোকদিগকে উপদেশ দান করিয়া থাকেন। ইহা শুনিয়া তিনি তাঁহাদিগকে কারাগারে বন্দী করেন। তখন শমউন তাহাদের উদ্দেশে আসিয়া রাজামন্ত্রিগণের সঙ্গে প্রণয়স্থাপনে প্রবৃত্ত হন, স্বীয় নৈপুণ্য ও বিচক্ষণতারবলে তিনি অচিরে রজার সান্নিধ্যলাভ করেন। কথিত আছে যে, শমউন, নরপতির সঙ্গে প্রতিমার মন্দিরে যাইতেন ও ঈশ্বরকে প্রণাম করিতেন, তাহাতে লোকে মনে করিত যে, তনি প্রতিমাকে সম্মান করেন। রাজা তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিশ্বাসী হন, শমউনের পরামার্শ গ্রহণ না করিয়া তিনি কোন গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। একদিন শমউন নৃপতিকে জিজ্ঞসা করেন, "মহারাজ, শুনিতে পাইলাম আপনি দুইটি দীনহীন ব্যক্তিকে কারাগারে রুদ্ধ করিযাছেন, তাহারা কারণ কি" ? রাজা বলেন, "তাহারা বলিয়া থাকে যে, আমাদের প্রতিমা ব্যতীত অন্য ঈশ্বর আছে, তজ্জন্য তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়াছি"। শমউন বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিয়া বলেন, "তাহাদের কথা অতি বিচিত্র, লোক পাঠাইয়া তাহাদিগকে

আনয়ন করুন, শোনা যাউক"। তদনুসারে রাজা তাঁহাদিগকে উপস্থিত করিলেন তাঁহারা শমউনকে তথায় দেখিয়া আশ্চর্য্যন্বিত হইলেন। শমউন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কাহাকে পূজা করিয়া থাক"? তাঁহারা বলিলেন, "যিনি স্বর্গ মর্ত্ত্য সৃজন করিয়াছেন তাঁহাকে—"। শমউন পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের ঈশ্বর কি কার্য্য করিতে পারেন"? তাঁহারা বলিলেন, "তিনি অন্ধকে চক্ষুষ্মান্ করিয়া থাকেন"। শমউন নরপতিকে অনুরোধ করিয়া কয়েকজন অন্ধ উপস্থিত করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা আপন ঈশ্বরদিগকে বল যে, ইহাদিগকে চক্ষুষ্মান করেন"। তাঁহারা প্রার্থনা করিলেন, তৎক্ষণাৎ অন্ধগণ চক্ষুলাভ করিল, তখন শমউন ভূপালকে বলিলেন "প্রভো, চলুন আমারও আমাদের ঈশ্বর সকলকে এরূপ কার্য্য করিতে অনুরোধ করি"। রাজা বলিলেন, "শমউন, তুমি কি জাননা যে, তাঁহারা দেখিতে শুনিতে পাননা ও কিছু করিতে পারেন না"? শমউন পুনর্ব্বার বলিলেন, "হে যুবকদ্বয়, তোমাদের পরমেশ্বর আর কি করিতে পারেন"? তাঁহারা বলিল, মৃতকে বাঁচাইয়া থাকেন"। তখন শমউন বলিলেন, "যদি তোমাদের ঈশ্বর এরূপ আশ্চর্য্য কাজ করিতে পারেন তবে আমরা সকলে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিব"। রাজ কন্যা প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, মৃত্যুর সাতদিন পরে প্রার্থণাযোগে সেই প্রেরিতদ্বয় তাঁহাকে জীবিত করিয়া তুলিলেন। ইহা দেখিয়া রাজা স্বজনবর্গ সহ ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। উপরোক্ত এই ঘটনা হইতে বুঝা যায়, ঈশা বা যীশুখৃষ্টস্বরূপ দুগ্ধশক্তি, রোগীকে আরোগ্যদান, অন্ধকে চক্ষুদান ও মৃতকে জীবন দান করিতে সক্ষম হন। এবং এই ঘটনার বিবরণ হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, "প্রতিমাগণ" শব্দের ভাবার্থ শয়তান প্রদত্ত জীবিকা স্বরূপ কৃষিজাত খাদ্য প্রভৃতি এবং "এক ঈশ্বর" শব্দের ভাবার্থ ঈশ্বর প্রদত্ত জীবিকাস্বরূপ শুধু দুগ্ধকেই নির্দ্দেশ করিতেছে।

যেমন হিন্দুর রাধার, মূর্ত্তি স্বীকৃত না হইলে ঐ রাধাশক্তির সহিত মুসলমানের আল্লাহুর ভাব প্রায় সামঞ্জস্য দেখা যায়, তদ্রূপ হিন্দুর দ্বাপর যুগের শ্রীকৃষ্ণের জীবন বৃত্তান্ত ও মুসলমানদের হজরতমোহাম্মদের জীবন বৃত্তান্তর ভাব অনেক স্থলে একভাবাপন্ন বলিয়া বোধ হয়। যেমন হিন্দুশাস্ত্রে বলে যে, গো, মেষ, ও ছাগল প্রভৃতি দুগ্ধবতী প্রাণিগণের বৎসের পৃষ্টদেশে যে গোলাকার চিহ্ন দৃষ্ট হয়, ঐ চিহ্ন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে ও চিহ্নিত ছিল, তদ্রূপ মুসলমান শাস্ত্রেও বলে যে, হজরতমোহাম্মদের পৃষ্ট দেশেও একটি মোহর নবুয়ৎ ছিল। অর্থাৎ একটি গোলাকার চিহ্ন বর্ত্তমান ছিল।

যেমন শ্রীকৃষ্ণ, প্রধান! গোপী শ্রীরাধা ও তাঁহার অনুগতা অষ্ট সখী একত্রে এই নয় সখীদের সহিত সাধারণতঃ বিহার করিতেন এবং আয়ানের মাতা জটিলা ও ভগিণী কুটিলা, রাধার চরিত্রে সর্ব্বদা দুষারোপ করিতেন, তদ্রূপ মুসলমানশাস্ত্রেও বলে, হজরত মোহাম্মদের ও নয়টি স্ত্রী ছিলেন। তাঁহাদের নাম যথা :—সতীসুদা, সাফিয়া, জরিবা, উম্মাহবিবা, ময়মুনা এই পাঁচজন দূরে থাকিতেন আর আর্য্যা আয়েশা, হফ্সা উম্মাছলেমা এবং জয়নব এই চারিজনকে হজরত সর্ব্বদা নিকটে রাখিতেন। কোর্-আনে বলে যে, প্রেরিত পুরুষ নয়টী ও সাধারণ ব্যক্তি তিনটি স্ত্রী বিবাহ করিতে পারেন। এইরূপ বহুবিবাহ প্রথা পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মেও প্রচলিত ছিল কিন্তু এখন ইহার বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজকে প্রতিবাদ করিতে দেখা যায়। ইহা ন্যায় কি অন্যায় এ বিষয়ে অনেকেরই মতানৈক্য আছে। পুরুষের বহুবিবাহে জগতে জননকার্য্যের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বটে কিন্তু তাহাতে অনেক অশান্তির সৃষ্টিও হইয়া থাকে। বিশেষতঃ প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে পুরুষের বহুবিবাহ শাস্ত্রসঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। হিন্দুশাস্ত্রে যেমন রামের সতী সাধ্বী স্ত্রী সীতা দেবীর চরিত্রে রামের প্রজাগণ এবং সতী রাধার চরিত্রে জটিলা ও কুটিলা কলঙ্ক রটনা করিয়াছিল তদ্রূপ সুরা 'নূর" হইতেও জানা যায় যে, হজরত

মোহাম্মদের ধর্ম্মবিরোধী লোকেরাও হজরতের স্ত্রী আর্য্যা আয়েশার চরিত্রে কলঙ্ক রটনা করিয়াছিল। অনন্ত পুরুষ ও প্রকৃতি শক্তি স্বরূপ পানীয় ও খাদ্য শক্তির ভিতর যেমন প্রকৃতি শক্তি স্বরূপ খাদ্য বস্তু, শয়তান দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল তদ্রূপ এস্থলে প্রকৃতি শক্তিকেও সেইরূপ আক্রান্ত হওয়ার ভাব রূপকাবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। তাই সুরা "নূরে" বলে যে, "নিশ্চয় যাহারা (আয়েশার সম্বন্ধে) অপবাদ উপস্থিত করিয়াছে তাহারা তোমাদের একদল, তাহা আপনাদের নিমিত্ত তোমরা অকল্যান মনে করিওনা, বরং তোমাদের জন্য তাহা কল্যান; (অপবাদ দ্বারা) তাহারা যে পাপ উপার্জ্জন করিয়াছে তাহাদের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য, এবং তাহাদিগের যে ব্যক্তি উহাকে গুরুতররূপে পরিণত করিয়াছে তাহার জন্য মহাশাস্তি আছে।"

একদা হজরত মোহাম্মদের সহধর্ম্মিনী সতী আয়শার চরিত্রের বিরুদ্ধে কলঙ্ক রটনা হইয়াছিল। তদুপলক্ষে উপরোক্ত আয়ত অবতীর্ণ হয়। সেই কলঙ্কের বিবরণ এই,—"মদিনায় প্রস্থানের পঞ্চম বৎসরে মরিসির যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সেই যুদ্ধ যাত্রা কালে সাধ্বী আয়শা শিবিকা আরোহণে হজরতের সঙ্গে গিয়াছিলেন। কোনস্থলে আবশ্যক মতে তিনি শিবিকা হইতে অবতরণ করেন; তথায় অনবধানতাবশতঃ তাঁহার হার হারাইয়া যায়। তিনি ইতস্ততঃ সেই হারের অনুসন্ধান করিতে করিতে কিঞ্চিৎ দূরে চলিয়া যান, এজন্য কিছু বিলম্ব হইয়া পড়ে। এদিকে শিবিকাবাহকগণ প্রস্থান করে। আয়েশা কিয়ৎক্ষণ অন্তর পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাগমন করিয়া কাহাকেও দেখিতে পান না। তখন তিনি সেখানে শিবিকাবাহকদিগের প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। ইতিমধ্যে মাতালের পুত্র সফ্‌ওয়ান যে হজরতের আজ্ঞাক্রমে সৈন্যবৃন্দের পশ্চাতে আসিতেছিল, তথায় উপস্থিত হয়, এবং সে আয়েশাকে দেখিতে পাইয়া আপন উষ্ট্রে আরোহণ করাইয়া শিবিরে লইয়া যায়। তখন আবুর

পুত্র আবদোল্লা আয়েশাকে সফ্ওয়ানের উষ্ট্রোপরি দর্শন করিয়া তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে অতি জঘন্য কথা বলে। যখন সকলে মদিনাতে উপনীত হইলেন, তখন এই সংবাদ হজরতের কর্ণগোচর হইল। আয়েশা পীড়িতা ছিলেন, এই ব্যাপারের কোন তত্ত্ব রাখিতেন না, কিন্তু হজরত তাঁহার প্রতি অনাদর প্রকাশ করিতেছেন বুঝিতে পারিলেন। সেই সময় তিনি অনুমতি গ্রহণ করিয়া পিত্রালয়ে চলিয়া যান, তথায় সবিশেষ অবগত হন। তাহাতে তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি হয়, তিনি দিবারাত্রি ক্রন্দন করিতে থাকেন। এদিকে হজরত স্বীয় ধর্ম্মপত্নী আয়েশার চরিত্রের অনুসন্ধানে মনোযোগী হইয়া আপন ধর্ম্ম-বন্ধুবর্গ ও প্রধান প্রধান বিশ্বাসী লোকদিগকে সবিশেষ জিজ্ঞাসা করেন। সকলেই তাঁহার সচ্চরিত্রতা বিষয়ে দৃঢ়তা সহকারে সাক্ষ্যদান করিতে থাকেন। তৎপর একদিন হজরত আপন শ্বশুর আবুবেকর সিদ্দিকের গৃহে উপস্থিত হইয়া আয়েশাকে ক্রন্দন বিলাপের অবস্থায় দেখিতে পান। তখন হজরত বলেন, "আয়েশা, পাপ করিয়া থাকিলে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও ও ক্ষমা প্রার্থনা কর।" হজরতের কথার উত্তর দান করিতে আয়েশা জনক জননীকে অনুরোধ করেন। তাঁহারা তদ্বিষয়ে মনোযোগ করেন নাই। পরে অগত্যা সভয় অন্তরে বলিলেন যে, "শত্রুগণ ইহা রটনা করিয়াছে, আমি যাহা বলি কেহ বিশ্বাস করে না। ইয়ুসোফের পিতা ইয়াকুব যেমন বলিয়াছেন, 'ধৈর্য্যধারণ করিতেছি, দেখি প্রভুর করুণা কি কার্য্য করে।' আমি ও ইহাই বলিতেছি।" ইতিমধ্যে হজরত প্রত্যাদিষ্ট হইলেন। "নিশ্চয় যাহারা অপবাদ উপস্থিত করিয়াছে।" এই আয়ত অবতীর্ণ হইল। অপবাদ রটনাকারী পাঁচজন ছিল, যথা কপট লোকদিগের অগ্রনী আবদোল্লা রাফার পুত্র জয়দ, সাবেতের পুত্র হসান ও আবুবেকর সেদ্দিকের মাতৃস্বসার পুত্র মস্তহ এবং হজ্বশের কন্যা হমিয়ত। "তাহা (মিথ্যাদোষারোপকে) তোমরা আপনাদের নিমিত্ত অকল্যাণ মনে করিওনা।" প্রেরিত পুরুষ ও

আয়েশা এবং সফওয়ানের প্রতি এই উক্তি কেননা এইরূপ দোষারোপ করাতেই কতকগুলি স্বর্গীয় আয়ত তোমাদের সম্বন্ধে প্রকাশ পাইল, সর্ব্বাপেক্ষা তোমাদের গৌরব হইল, তোমরা প্রচুর পুরস্কার পাইবে, এবং মিথ্যাবাদীরা আপনাদের পাপের সমুচিত প্রতিফল লাভ করিবে।

সে যাহাই হউক, শ্রীকৃষ্ণ যেমন নন্দগোপের স্ত্রী যশোদা কর্ত্তৃক লালিত পালিত হইয়াছিলেন, হজরত মোহাম্মদ ও তদ্রূপ ধাত্রীমাতা হালিমা দ্বারা শৈশবে লালিত ও পালিত হইয়াছিলেন। হিন্দুশাস্ত্রে রাম ও কৃষ্ণকে যেরূপ দুগ্ধশক্তিরূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে তদ্রূপ মুসলমান শাস্ত্রেও হজরত মোহাম্মদকেও দুগ্ধশক্তিরূপকে যে, রূপকাবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহার প্রমাণস্বরূপ সূরা “এন্‌সরাহ” এবং সূরা “ফলকের” বিবরণ কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। সূরা “এন্‌শরাহে” বলা হইয়াছে যে, “তোমার জন্য কি তোমার বক্ষঃস্থলকে আমি উন্মুক্ত করি নাই” এই বক্ষঃস্থল উন্মুক্তের ভাবার্থে মুসলমান শাস্ত্রে বলে যে, ‘‘কথিত আছে যে, তাহা (বক্ষস্থলউন্মুক্ত) দুইবার হইয়াছিল। একবার শৈশবকালে হজরত যখন আপন ধাত্রীমাতা হলিমার গৃহে ছিলেন, তখন একদিন প্রান্তরে স্বর্গীয় দূত তাঁহার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া হৃদয়ের অভ্যন্তর ভাব প্রক্ষালন করিয়াছিলেন। দ্বিতীবার প্রেরিতত্ব লাভ হইলে পর মেরাজের দিন জেব্রিল ও মেকায়িল তাঁহার বক্ষঃ বিদীর্ণ করিয়া পরিস্কার করেন, এবং হৃদয়কোষ বিশ্বাস জ্যোতিতে পূর্ণ করেন”। এই বক্ষঃস্থল উন্মুক্ত করার কার্য্যের সহিত দুগ্ধ হইতে পিত্তরস নির্গত করার ভাব সামঞ্জস্য রহিয়াছে। যেহেতু দুগ্ধে পিত্তরস মিশ্রিত করিয়া তাহা হইতে মাখন উৎপন্ন করিতে হইলে প্রথমত মন্থনদ্বারা একবার পিত্তরস বাহির করিয়া লওয়া হয়। তাহার পর দ্বিতীয়বার ঐ মাখনে যৎসামান্য যেকিছু পিত্তরস বর্ত্তমান থাকে, পুনর্ব্বার ঘৃতে পরিণত করিবার

সময় উহাকে অগ্নিদ্বারা উত্তপ্ত করিলে তখন একেবারে বিশুদ্ধ ভাব ধারণ করে। কিন্তু ইহার প্রকৃত ভাবার্থ, সাধকের মনের রুদ্ধ দুয়ারকে উন্মুক্ত করিয়া বিশ্বাসজ্যোতিতে পূর্ণ করা। সুরা "ফলকে" বলা হইয়াছে যে,—"তুমি বল, যাহা সৃষ্ট হইয়াছে তাহার অপকারিতা হইতে ও প্রথম রজনীর অন্ধকার যখন অবতীর্ণ হয় সেই অন্ধকারের অপকারিতা হইতে এবং গ্রন্থীমধ্যে কুহককারিনী নারীদিগের অপকারিতা হইতে এবং বিদ্বেষপরায়ণ বিদ্বেষকারীর অপকারিতা হইতে আমি প্রাতঃকালে প্রতিপালকের নিকট আশ্রয় লইতেছি।" মুসলমান শাস্ত্রে এই সুরার ভাবার্থে বলে যে, "একজন ইহুদি বালক হজরতের সেবাতে নিযুক্ত ছিল, ইহুদি বংশীয় আসমের পুত্র লবকের কন্যাগণ বিশেষ অনুরোধ করিয়া তাহা যোগে হজরতের চিরুণীর কিয়দংশ গ্রহণ করিয়াছিল এবং সে হজরতের নামের প্রভাবে তৎসাহায্যে রর্জ্জুর উপর আশ্চর্য্য ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়া করিতেছিল। হজরতকে জেব্রিল এই কথা জ্ঞাপন করেন। হজরত আলিকে পাঠাইয়া সেই রজ্জু আনয়ন করিয়াছিলেন। তাহাতে সে এগারটি গ্রন্থ স্থাপন করিয়াছিল। জেব্রিল এগারটি আয়ত পাঠ করেন, এগার গ্রন্থ সেই রজ্জু হইতে খুলিয়া যায়।" এবং এই সুরা উপলক্ষে কেহ কেহ ইহাও বলেন যে. "জনৈক য়ীহুদী ইজরতের চিরুণী হইতে একগাছি চুল তুলিয়া লইয়া এবং তাহাতে কয়েকটি গ্রন্থি দিয়া সেটাকে অন্ধকূপে পাথর চাপাদিয়া রাখে। এই যাদুর ফলে, হজরতের এই সময়ে বিকৃত মস্তিষ্কের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং স্ত্রী সহবাস না করিয়াও বলিতেন যে, স্ত্রী সহবাস করিয়াছি।" এই সূরা উপলক্ষে উপরোক্ত ঐ সকল ঘটনা হইতে বেশ হৃদয়ঙ্গম হয় যে, ইহা শুধু দুগ্ধের মন্থন অবস্থাই রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। যেহেতু সাধারণতঃ দুগ্ধকে মন্থন করিতে হইলে

দুগ্ধের মস্তকের উপর অর্থাৎ দুগ্ধের ভিতর মন্থনদণ্ড স্থাপন করিয়া রজ্জুর সাহায্যে ঐ দণ্ডকে আকর্ষণ বিকর্ষণ করিয়া দুগ্ধ মন্থন করা হয়। দুগ্ধের মন্থন কার্য্য শেষ হইলে মন্থন দণ্ড হইতে রজ্জু খুলিয়া লওয়া হয়, এবং দুগ্ধ মন্থনকালে দুগ্ধস্থ পানীয় বস্তুরূপ পুরুষ শক্তির সহিত ও দুগ্ধস্থ খাদ্যবস্তুরূপ প্রকৃতি শক্তির যে ঘাতপ্রতিঘাত হইয়া থাকে, উহাতেই খাদ্য ও পানীয়শক্তিরূপ অনন্ত প্রকৃতি পুরুষের মৈথুনকার্য্য বা রাসলীলা সুসম্পন্ন হয়। আমি পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণণ উপলক্ষেও এইরূপ দুগ্ধের মন্থন কার্যকেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। আর বিশেষতঃ আরবী ভাষায় "ফলক" শব্দের ধাতুগত অর্থে বিদীর্ণ করা বা মন্থন দণ্ডদ্বারা মন্থন করা অর্থাৎ ক্রুশে বিদ্ধ করাকেই নির্দ্দেশ করে। এবং এই সূরায় লিখিত "প্রথম রজনীর অন্ধকার যখন অবতীর্ণ হয় সেই অন্ধকারের অপকারিতা প্রভৃতি হইতে আমি প্রাতঃকালের প্রতি-পালকের নিকট আশ্রয় লইতেছি," এই কথাগুলির অর্থেও এই বুঝা যায় যে, সাধারণতঃ সন্ধ্যাবেলা দুগ্ধে টকরস মিশ্রিত করিয়া পরদিন অতি প্রত্যূষে উহাকে মন্থনদণ্ড দ্বারা মন্থন করা হয় এবং মন্থন কার্য্য শেষ হইলেই প্রাতঃকালে দুগ্ধস্থ পানীয়শক্তি তখন ঘাত প্রতিঘাতের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করে। উপরোক্ত সূরার প্রকৃত ভাবার্থ মানসিক অন্ধকার নষ্ট করিয়া মানুষকে স্বর্গীয় আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া বিশ্বাসী এবং চৈতন্যময় করাকেই বুঝায়। সূরা "মোজ্জম্মেলো" হইতে জানা যায় যে, "প্রত্যাদেশ" হজরত কর্ত্তৃক ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় শ্রুত হইত। স্বাভাবিক ধ্বনি ও বচন ও বর্ণাবলীর ন্যায় অনুভূত হইত না।" এই ধ্বনি সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে যাহা বলিতেছে আমি তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আপনাদিগকে অবগত করাইতেছি। যথা,—"মনই ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্ত্তক, মনের প্রবর্ত্তক প্রাণ। প্রাণের প্রভু মনোলয়, মনোলয় নাদের আশ্রিত, অর্থাৎ মন লয় প্রাপ্ত নাদের অভ্যন্তরে

অবস্থিতি করে। নাদ অর্থে ধ্বনি, এই ধ্বনি বাগিন্দ্রিয় জন্য উদর কন্দর হইতে উদ্ভুত নহে, উহা স্বাভাবিক অবিচ্ছিন্ন ধ্বনি, এইজন্য উহার একটি নাম অনাহুত ধ্বনি। এই অনাহুত ধ্বনি শ্রবণে মনকে লিপ্ত রাখিলে, স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। এইরূপ রাখা প্রাণায়াম ব্যতীত হয় না। কর্ণরোধ হইলে যে, এক প্রকার হু, হু শব্দ শ্রুত হইতে থাকে তাহাকে অনাহুত ধ্বনি বলে। ঐ ধ্বনি ব্রহ্মনাড়ী হইতে উদ্ভুত হয়। যোগীগণ উহাকে ওঁকার ধ্বনি কহেন। অন্যান্য শাস্ত্রে উহাকে শব্দ ব্রহ্ম বলে। এই শব্দের দশবিধ প্রকার ভেদ আছে।" (হংসোপনিষদ)। এই হু, হু শব্দ হিন্দুর ওঁকারের অ, উ, ম এর 'উ' বা 'হু' এবং মুসলমানদের আল্লাহু শব্দের লাম, আলেপে, যুক্ত হইয়া 'উ' বা "উহাদ"এর 'উ' বা "হু"কে বুঝায়। উ বা হু একই অর্থমূলক বাক্য।

যোগাভ্যাস বা প্রাণায়াম ক্রিয়ার স্তর বিশেষে ক্রমান্বয়ে কিরূপ ধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া হইতেছে। "প্রথমে চিনি রূপ অব্যক্ত শব্দ শ্রুত হয়। ২য় চিন্‌চিনি শব্দ, ৩য় ঘন্টানাদ, ৪র্থ শঙ্খনাদ, ৫ম বীনানাদ, ৬ষ্ঠ করতাল-নাদ, ৭ম বেনুনাদ ৮ম মৃদঙ্গনাদ ৯ম ভেরীনাদ, ১০ম মেঘনাদ। এই দশবিধ নাদ প্রাণায়ামের অবস্থানুসারে শ্রুত হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা ষটচক্রের এক একটি চক্র যখন ভেদ হইতে থাকে অমনই এক প্রকার ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়। এইরূপ চক্র সকল ভেদ করিয়া প্রাণবায়ু যখন ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রবেশ করে তখন নানা প্রকার মধুর ধ্বনি শ্রুত হইয়া থাকে। ক্রমে নাদানুসন্ধান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়।" (হঠযোগ)। শাস্ত্রমতে বুঝা যায় যে, এই শব্দ মানবের দেহের ভিতরস্থ শব্দ কিন্তু শ্রোতা মনে করেন যে, উহা যেন অনন্ত আকাশ হইতেই শোনা যাইতেছে। এই ভাবকেই শাস্ত্রে "ভিতর ও বাহির একই রূপ" বলিয়া কথিত হয়।

যেমন বর্ত্তমান জগতের বৈজ্ঞানিক টেলিগ্রাফের তারদ্বারা কোন বচনাবলি যাতায়াত করে না অথচ একপ্রকার শব্দ জ্ঞানেই পরস্পরের মনের কথা জানানো হয়, তদ্রূপ ভগবৎ কৃপায় যে সাধক অনন্ত আকাশে ঐরূপ শব্দ ব্রহ্ম শুনিতে পান, তিনি শুধু ঐ অনাহুত ধ্বনি দ্বারাই জগতের আত্মতত্ত্ব অনুভব করিয়া জগতের ধর্ম্মগ্রন্থ সকলের রহস্য সকল জ্ঞাত হইয়া থাকেন। তাই কোর্-আন শরিপে বলে যে, হজরত মোহাম্মদ স্বর্গে ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া ভাবাবিষ্ট হইয়া যে সকল বাক্য প্রকাশ করিতেন, ঐ সকল পবিত্র বাক্যই কোর্-আন শরিপ নামে জগতে সুপরিচিত হইয়া রহিয়াছে। মুসলমানশাস্ত্রে বলে, "হজরত প্রথম মনে করিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি কোর্-আন শ্রবণ করিবে, সেই তাহাতে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিবে। কিন্তু মক্কার অংশিবাদিগণ, কোর্-আনের বচনের প্রতি কিছুই শ্রদ্ধা করিল না বরং তৎপ্রতি উপহাস করিল তাহাতে হজরত আশ্চর্য্যান্বিত হন। এইজন্য সূরা "সাফ্‌ফাতে" বলা হইয়াছে, "বরং তুমি কাফেরদিগের (অবস্থায়) বিস্মিত হইয়াছ, এবং তাহারা বিদ্রূপ করিতেছে। এবং যখন তাহাদিগকে উপদেশ দেওয়া যায় তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে না। যখন কোন নিদর্শ দর্শন করে তখন তাহারা উপহাস করে।"

হিন্দুশাস্ত্রে বলে, রাধা গোকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং নপুংসক আয়ানের সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। রাধাকৃষ্ণের বিচ্ছেদাবস্থায় রাধা, সাধারণতঃ আয়ানগৃহে আয়ানের মাতা জটিলা ও ভগ্নী কুটিলার সহিত একত্রে বাস করিতেন। যদিও আয়ান রাধাকৃষ্ণের মিলনে মনে তত বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিতেন না এবং তাহার মাতা জটিলাও প্রায় তদ্রূপ ছিলেন তথাপি ভগ্নী কুটিলা সর্ব্বদার তরে রাধাকৃষ্ণের মিলন বিদ্বেষী ছিলেন। এই সকল কথার ভাবার্থ এই যে, পূর্ব্বেই আপনাদিগকে বলিয়াছি, হিন্দুমতে স্থূলভাবে বিচার করিতে গেলে গোদুগ্ধস্থ পানীয়শক্তিই শ্রীকৃষ্ণ ও গোদুগ্ধস্থ খাদ্যশক্তিই

শ্রীরাধাস্বরূপ। এইজন্যই গো-কুলে অর্থাৎ গোজাতির ভিতরই রাধার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রে কথিত হয়। গোদুগ্ধে টকরস বা পিত্তরস মিশ্রিত হইলে গোদুগ্ধস্থ পানীয়শক্তিরূপ শ্রীকৃষ্ণের সহিত উহার ভিতরস্থ খাদ্যশক্তিরূপ ছানা বা মাখনরূপ শ্রীরাধার বিচ্ছেদ হয়। ঐ সময় ছানা বা মাখন সচরাচর গুড়, চিনি, মিশ্রি প্রভৃতি মিষ্ট বস্তুর সহিত মিশিয়া নানা প্রকার খাদ্যে পরিণত হয়। এস্থলে ইক্ষু দণ্ডকে নপুংসক আয়ান এবং স্ত্রীজাতীয়া তাল বৃক্ষকে জটিলা ও স্ত্রীজাতীয়া খেজুর বৃক্ষকে কুটিলারূপকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। অর্থাৎ নপুংসক সদৃশ ইক্ষু দণ্ড হইতে প্রাপ্ত গুড়, চিনি, মিশ্রি, তাল বৃক্ষের রস হইতে প্রাপ্ত গুড়, চিনি, মিশ্রি এবং খেজুর গাছের রস হইতে প্রাপ্ত গুড়, চিনি প্রভৃতির সহিত মিশ্রিত হইয়াই গোদুগ্ধস্থ ছানা বা মাখনরূপ শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিচ্ছেদাবস্থায় জগতের সুমিষ্ট খাদ্য স্বরূপে বর্ত্তমান থাকে। সচরাচর গোদুগ্ধে ইক্ষুরস হইতে উৎপন্ন চিনি, গুড় ও মিশ্রি মিশ্রিত হইলে দুগ্ধ জ'মে যায় না বা নষ্টপ্রাপ্ত হয় না এবং ঐ তালের গুড়, চিনি,মিশ্রি প্রভৃতির সহিত মিশিলেও ততটা নষ্ট প্রাপ্ত হয় না কিন্তু কুটিলা সদৃশা খেজুররসের সহিত দুগ্ধ মিশ্রিত হইলে প্রায়ই অনেকস্থলে দেখা যায় দুগ্ধ তখন জ'মে যায় বা নষ্টপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের বিচ্ছেদ হয়। এইজন্য বলা হয় যে, কুটিলাই সকলের চেয়ে রাধাকৃষ্ণের মিলন বিদ্বেষী ছিল। আয়ান শব্দের অর্থ দণ্ডকেও নির্দ্দেশ করে। অতএব দুগ্ধ মন্থনকারী মন্থন দণ্ডও আয়ান রূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছে। আর একটী কথা এই যে, বৃন্দাবন লীলায় যে "চন্দ্রাবলীর" কথা উল্লেখ দেখা যায়, উহা টকরসযুক্ত খাদ্যবস্তু তেঁতুলরূপকেই আবৃত হইয়া রহিয়াছে। একটি আশ্চর্য্য বিষয় এই যে, তেতুলগাছে, রাধাকৃষ্ণের মিলনস্থল শ্রীবৃন্দাবনধামে তেঁতুল ফলিতে দেখা যায় না। টকরসযুক্ত খাদ্যবস্তুমাত্রই "চন্দ্রাবলীর গণ"রূপে

রূপকাবৃত হইযা রাধাকৃষ্ণের লীলায় বর্ণিত রহিয়াছে। সচরাচর তেঁতুলফলকে অর্দ্ধ চন্দ্রের ন্যায় গাছে ঝুলিতে দেখা যায় তাই তেতুলকে চন্দ্রাবলীরূপকে আবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। এইজন্য হিন্দুর বৃন্দাবন লীলায় দেখাযায়, শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রার কুঞ্জ হইতে রাধার কুঞ্জে আসিলে, রাধাকৃষ্ণের বিচ্ছেদ হইয়াছিল। এবং তখন কৃষ্ণ, রাধার মানভাঙ্গিবার জন্য তাহার পায়ের তলে পড়িয়া কত কাঁদিয়া ছিলেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, দুগ্ধে তেতুল মিশ্রিত হইলে দুগ্ধস্থ ছানাশক্তিরূপ রাধা, দুগ্ধস্থ পানীয় শক্তি হইতে পৃথক হইয়া পড়ে অর্থাৎ পানীয়শক্তির উপর ভাসিয়া বেড়ায় এবং তখন পানীয় শক্তিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ছানাশক্তি সদৃশ রাধার নিম্নে পড়িয়া থাকে।

দুগ্ধস্থ খাদ্য ও পানীয়শক্তির এই ভাব হইতেই বৈষ্ণব কবিগণের ভিতর নানাজন নানাপ্রকার আলঙ্কারিকভাবে রাধাকৃষ্ণের বিচ্ছেদ ও মিলনের সাহিত নিত্য ও লীলার ভাব সামঞ্জস্য করিয়া জগতের মানব প্রকৃতির ন্যায় বর্ণনা করিয়া দেখাইয়াছেন।

দুগ্ধে টকরস মিশ্রিত করিয়া সেবনের উপকারিতা সম্বন্ধ এস্থলে বলা যাইতে পারে যে, আপনারা হয়তো অনেকেই অবগত আছেন, জগতে সুইট্জারলণ্ডবাসীদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবি বলিয়া কথিত হয়। ইহার কারণ সুইট্জারলণ্ডবাসীরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকবার সেবার বস্তু গ্রহণের সময় এক প্রকার টকদধি সেবা করিয়া থাকেন। বহু পণ্ডিতগণের এই বিশ্বাস যে, তাঁহাদের ঐ টক্ দধি সেবনেই তাঁহারা দীর্ঘজীবনলাভে সক্ষম হন। বিশেষতঃ সুইট্জারলণ্ড পর্ব্বতের উপরে অবস্থিত, পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থিত তাড়িতের আকর্ষণ. পর্ব্বতের উপর সমতল ভূমি অপেক্ষা কম, এইজন্যই জগতের অনেক পার্ব্বত্য প্রদেশ স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়াই বিবেচিত হয়।

আরব্য উপন্যাসে যে লায়লা ও মজনুর গল্প বর্ণিত আছে, তাহাতেও একস্থানে মৃতজীবিত হওয়ার ভাব দুগ্ধের সহিত রূপকাবৃত

হইয়া রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। যেহেতু উহাতে উল্লেখ রহিয়াছে যে, মজ্নু যখন লায়লার প্রেমে উন্মত্ত হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিল তখন নসিরণ নামক জনৈক লোক উপদেশচ্ছলে মনুজ্‌কে স্ত্রীজাতির চরিত্র সম্বন্ধে যে গল্প বলিয়াছিল, তাহাতে দেখা যায় যে, উক্ত নসিরণ মজ্নুকে বলিতেছে, "দেখ খোদাবকস নামে জনৈক পুরুষ, আপন স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালবাসিত; সেই স্ত্রী মরিয়া গেলে মৃত পত্নীর সহিত সে জীবিত অবস্থাতেই কবরে যাইতে প্রস্তুত হইল। তাহার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবান্ধব অনেক প্রকারে নিষেধ করিল, সে কিন্তু কাহারও কথা শুনিল না। যখন সে সত্য সত্যই মৃত পত্নীর সহিত জীবিতাবস্থাতেই কবরস্থ হইতে যায়, তখন পয়গম্বর হজরত আলি ছদ্মবেশে তথায় আসিয়া কহিলেন, "হে পুরুষ শ্রেষ্ঠ তুমি যদি তোমার অর্দ্ধেক পরমায়ু দিয়া তোমার স্ত্রীকে বাঁচাইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমি তোমার বঞ্ছা পূর্ণ করিতে পারি।" খোদাবকস তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল এবং তখনি তাহার মৃতপত্নী বাঁচিয়া উঠিল। কিছুদিন পর ঐ স্ত্রীলোকটির সহিত অপর এক পুরুষের প্রণয় হইলে, তাহারা উভয়ে খোদাবকসকে প্রহার করিয়া তাড়াইয়া দিল। খোদাবকস নিরুপায় হইয়া কাজির নিকট অনুযোগ করিল। তখন কাজি সাহেব বাদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "খোদাবখস! তোমার কোন সাক্ষী আছে?" সে কহিল, "আমার সাক্ষীগণ এক্ষণে আর কেহই বাঁচিয়া নাই। কিন্তু পয়গম্বর হজরতআলি সাহেব সাক্ষী আছেন।" কাজি কহিলেন, "তাঁহাকে তো এখন আর পাওয়া যাইবে না।" বাদী কহিল, "তিনি প্রধান সাক্ষী। এই মোকদ্দমায় তাঁহাকে সাক্ষ্য দিতেই হইবে, আপনি তাঁহাকে তলব করুণ, তিনি অবশ্যই হাজির হইবেন।" এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময় পয়গম্বর হজরতআলিসাহেব জ্যোতির্ম্ময়রূপে সেই আদালতে হাজির হইলেন। হজরতআলি বাদীকে কহিলেন, "তুমি ঐ স্ত্রীলোকটিকে তোমার

পরমায়ু দিয়াছ, তাহা উহার নিকট হইতে গ্রহণ কর।" খোদাবকস তাহা করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার স্ত্রী ভূপতিত হওত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। হজরতআলি অন্তর্হিত হইলেন। কাজি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বাদীকে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলে, সে পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সকল আনুপুর্ব্বিক নিবেদন করিল।" এই ঘটনা হইতে স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, ইহাও দুগ্ধের প্রক্রিয়া বিশেষের সহিত রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। যেহেতু দুগ্ধে খাদ্যও পানীয়শক্তি প্রকৃতিপুরুষরূপে প্রাণে প্রাণে মিশিয়া রহিয়াছে। দুগ্ধে পিত্তরস বা টকরস মিশ্রিত হইলে দুগ্ধস্থ খাদ্যশক্তি মরিয়া যায় অর্থাৎ দুগ্ধ নষ্ট হয় বা দধিতে পরিণত হয় কিন্তু ঐ নষ্ট প্রাপ্ত দুগ্ধ বা দধিকে মন্থনদণ্ড বা শরযষ্টি দ্বারা মন্থন করিলে, খাদ্য ও পানীয় শক্তির সারাংশ একত্রে মিলিত হইয়াই একাধারে ঐ দুগ্ধস্থ প্রকৃতিপুরুষ মিলিতাবস্থায় খাদ্যবস্তুরূপ প্রকৃতশক্তি মাখনরূপে উত্থিত হয় এবং পানীয়শক্তি বা পুরুষশক্তির অবশিষ্টাংশ দূরে পরিত্যাক্ত হইয়া থাকে। পরে ঐ দুগ্ধস্থ মাখনরূপ খাদ্যশক্তি রসময় গুড় বা চিনির সহিত মিশ্রিত হইয়া মানুষের নানাপ্রকার সেবাকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহাই খোদাবকসের স্ত্রী অন্যের সহিত মিলিত হইয়া খোদাবকসকে বিতাড়িত করার কার্য্য আলঙ্কারিকভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। কিন্তু ঐ মাখনকে আবার ঘৃতে পরিণত করিলে অর্থাৎ মাখন উত্তাপে দ্রবীভূত হইয়া পানীয়শক্তি বা রসময় দেহ ধারণ করিলে, তখন কিন্তু খাদ্যশক্তিরূপ মাখনের আর অবয়ব দৃষ্ট হয় না। ইহাই খোদাবকস কর্ত্তৃক নিজের পরমায়ু তাহার স্ত্রীর নিকট হইতে পুনরায় গ্রহণ করার ভাব রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে'।

এই গল্পের অনুরূপ হিন্দুশাস্ত্রেও বর্ণিত আছে যে, ব্রহ্মকুলোদ্ভব প্রমতির পুত্র রুরু তাঁহার স্ত্রী রতিকালে সর্পদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, দিবারাত্র বনে বনে বিচরণ করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। রুরুর শোকে স্বর্গের দেবতারাও দুঃখিত হইয়া স্বর্গদূতের দ্বারা

বলিলেন যে, "যদি তুমি তোমার পরমায়ুর অৰ্দ্ধেক তোমার স্ত্রীকে দিতে পার তবে তোমার ভার্য্যা জীবিত হয়।" রুরুও তদ্রূপ করিলে তাঁহার স্ত্রী পুনর্জ্জীত হইয়াছিলেন। এস্থলে রুরু ও তাঁহার ভার্য্যা যথাক্রমে দুগ্ধস্থ পানীয়শক্তিও খাদ্যশক্তি রূপকে আবৃত হইয়া রহিয়াছেন।

কোর্-আনের সূরা "কাওশার"এর ভাবার্থে পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, উহাতে শুধু মানবের সেবা বা ভোজন কার্য্যের ও ঈশ্বরের উপাসনার ভাব নিহিত রহিয়াছে এবং তখন ইহাও বলিয়াছি যে, কোর্-আন লিখিত দিবা রাত্রির ভিতর পাঁচ অক্ত নামাজের পদ্ধতি এবং প্রত্যেকবার নামাজের রেকাতগুলির সংখ্যা বিশেষ-রূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে সকলেই অতি সহজে বুঝিতে পারিবে যে, উহাতেও আমাদের খানা বা সেবার কার্য্যের ভাব সূক্ষ্মভাবে নিহিত রহিয়াছে। তাই এখন আমার প্রিয় মোস্লেম ভগিনী ও ভ্রাতাগণকে, তাহা ভালরূপে বুঝাইবার জন্য নিম্নে নামাজের রেকাতগুলির আলোচনা করিতেছি।

নামাজের পদ্ধতি যথা:—১ম ফজর অর্থাৎ অতি প্রত্যুষে ঘুম হইতে উঠিয়া হাত মুখ ধুইয়া, 'ফজর' বা আল্লার বাণী দুই রেকাত এবং ছুন্নত বা রছুলের বাণী দুই রেকাত একত্রে চারি রেকাত অর্থাৎ যৎসামান্য কিছু খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা। ২য় জহুর বা মধ্যাহ্নে, ফরজ চারি রেকাত, ছুন্নত ছয় রেকাত নফল দুই রেকাত একত্রে বার রেকাত অর্থাৎ মধ্যাহ্নে প্রায় পূর্ণ মাত্রায় পান ভোজনকরা। ৩য় আছোর বা অপরাহ্নে, ফরজ' চারি রেকাত, ছুন্নত চারি রেকাত একত্রে আট রেকাত তন্মধ্যে ছুন্নত চারি রেকাত ইচ্ছাধীন অর্থাৎ অপরাহ্নে কিছু জলযোগ (Tiffin) করা। ৪র্থ মগ্‌রিব বা সন্ধ্যার সময়, ফরজ তিন রেকাত, ছন্নুত দুই রেকাত, নফল দুই রেকাত একত্রে সাত রেকাত তন্মধ্যে ছুন্নত ও নফল

ইচ্ছাধীন অর্থাৎ সন্ধ্যার সময় পূনর্ব্বার কিছু জলযোগ করা। ৫ম এসা বা রাত্রে শুইবার পূর্ব্বে, ফরজ চারি রেকাত, ওয়াজেব তিন রেকাত, ছুন্নত ছয় রেকাত, নফল চারি রেকাত একত্রে সতের রেকাত অর্থাৎ রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে সম্পূর্ণ পেট ভরিয়া খানা বা সেবার বস্তুগ্রহণ করার ভাব অতি সূক্ষ্মভাবে নিহিত রহিয়াছে। যেহেতু মানুষ যদি এইরূপ নিয়মিত ভাবে দিবারাত্রির ভিতর পাঁচবার পানভোজন করে তবে তাহাদের স্বাস্থ্য বা ধর্ম্ম ঠিক থাকে। রমজান মাসে রোজার সময় সারাদিন অনাহারে থাকিয়া সন্ধার সময় ইস্তার খুলিয়া অর্থাৎ হাত মুখ ধৌত করিয়া কিছু জলযোগ করার পর পূর্ণ আহারের পর এই সময়ে অধিক রাত্রে "তারাবি" নমাজ পড়িবার পদ্ধতি আছে। ঐ তারাবি নমাজ মোটা মোটি তেইশ রেক্াতে পরিপুর্ণ। ইহা হইতে ও স্পষ্টতঃ বুঝা যায় যে, রোজার সময় অধিক রাত্রে বা শেষ রাত্রিতে আবার সম্পুর্ণ পেটভরিয়া সেবা বা ভোজন করা। রমজান মাসে ত্রিশ রোজা রাখিয়া দিবসে অনাহার থাকার প্রথা সম্বন্ধে বুঝাযায় যে, উহা দানা পানী বা খাদ্য ও পানীয় রূপ ব্রহ্মবস্তু যে, আমাদের কত আদরের বস্তু তাহার ভাবের আসক্তি বর্দ্ধিত করিবার একটি বিধান বটে। কারণ সমস্তদিন উপবাস থাকিলে দানা পানী বা খাদ্য ও পানীয় বস্তুরূপ ব্রহ্ম যে, কত আদরের জিনিষ, তাহা অতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। বিশেষতঃ অন্যার্থে ইহাও বুঝাযায় যে, যেমন বহির্জ্জগতের কল কারখানার ইঞ্জিনগুলি অনবরত খাটিলে তাহাকে সময়মত বিশ্রাম দিতে হয়, তাহা না করিলে অচিরে উহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া যায়; তদ্রূপ আমাদের এই কলেবরের পাকস্থলীস্থ যন্ত্রগুলিকেও বিশ্রাম দেওয়া সঙ্গত। যেহেতু আমাদের পাকস্থলীস্থ যন্ত্র সকল দিবারাত্র সর্ব্বক্ষণই খাটিতেছে। অতএব বৎসরের ভিতর একবার রমজান মাসে ত্রিশ রোজা রাখিয়া

কতক পরিমাণে উহাকে বিশ্রাম দিতে পারিলে, উহা ভবিষ্যতে সেবার কার্য্য সুচারুরূপে চালাইয়া মানুষকে দীর্ঘজীবি করিতে সক্ষম হয়। অধিকন্তু চন্দ্র ও সূর্য্যের আকর্ষণের সহিত পৃথিবীর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। এবং আমাদের দেহের সহিত ও পৃথিবীর নৈকষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। তাই হয়ত রমজান মাসের চাঁদের সহিত আমাদর দেহের বিশেষ কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়াই ঐমাসে দিবসে আহার করিলে দেহ রক্ষা বা ধর্ম্ম-রক্ষার পক্ষে বিশেষ ক্ষতি হয়। এই হেতুই বোধহয় মুসল-মান শাস্ত্রে রমজান মাসে রোজা রাখিবার বিধান দেখা যায়। মুসলমানশাস্ত্রে বলে, হজরত মোহম্মদ মেরেজ্বে (আটতালা উপরিস্থিত স্বর্গে) যাইয়া জানিতে পারিয়াছিলেন যে, রমজান মাসের যে কোন একদিন রোজা রাখিলে বা উপবাস থাকিলে মানুষের হাজার মাসের অর্থাৎ বহুদিনের পাপ ক্ষমা হয়। কিন্তু ঐ দিন যে কোন দিন তাহা হজরতের বিশেষ জানা না থাকায় রমজান মাসের প্রত্যেক দিনই রোজা পালন করা নির্দ্দেশ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যেহেতু তাহাতে ঐ অনির্দ্দিষ্ট দিনও অবশ্যই রোজা রাখা সম্পন্ন হইবে।

দেশ, কাল ও পাত্র বিচারে জগতের এক এক ধর্ম্মে এক এক প্রকার এইরূপ রোজা বা উপবাস পালন দৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ হিন্দুর একাদশী এবং তিথি অনুসারে নানা ব্রতাদির উপবাস ও রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টীয়ানদের গুড্‌ফ্রাইডের উপবাস দৃষ্ট হইয়া থাকে। মুসলমানগণ নামাজের পূর্ব্বে জল দ্বারা অজু করিয়া থাকেন। ঐ অজুর সময় দেহের যে, যে স্থানে জলদ্বারা প্রক্ষালনের বিধান বর্ত্তমান আছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, দিবারাত্রি চব্বিশঘণ্টার ভিতর পূর্ব্বোক্ত পাঁচবার নামাজের সময়, ঐসকল স্থানে জলদ্বারা সিক্ত করিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। অন্য হিসাবে ঈশ্বরকে প্রার্থনা করিবার পূর্ব্বে

স্থচি বা পবিত্র হওয়ার ও বেশ বিধান বটে। আর বিষেশতঃ একস্থানে নিশ্চল অবস্থায় ঈশ্বরের উপসনা করার চেয়ে, নামাজের পদ্ধতি অনুসারে দিবারাত্রের ভিতর পাঁচবার ঈশ্বরের উপাসনা উপলক্ষে নানাভাবে উঠাবসা করিলে শরীরের জড়তা নষ্ট হয় এবং স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। এইরূপ হিন্দুশাস্ত্রেও উপসনার সময় নানা প্রকার আসন করার প্রথা এবং খৃষ্টীয়ানগণের ও হাঁটু পাতিয়া বসিয়া ঈশ্বরের প্রার্থনা করা দৃষ্ট হইয়া থাকে। অধিকন্তু হিন্দুর বৈষ্ণব সম্প্রদায় অনেক স্থলে তাণ্ডব নৃত্য করিয়া ও ভগবানের গুনগান কীর্ত্তণ করিয়া থাকেন।

অপ্রকৃত খাদ্যবস্তু বা ঈশ্বরপ্রদত্ত জীবিকাস্বরূপ দুগ্ধের ভাবের সহিত জগতের যে কোন মানুষের জীবনবৃত্তান্ত সামঞ্জস্য থাকিলেই যে, মানুষ তাঁহাকে দেশ, কাল ও পাত্র বিচারে ঈশ্বরের নবি বা রছুল পুত্র এবং পূর্ণ অবতাররূপে ধর্ম্মজগতে গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহার' দৃষ্টান্ত স্বরূপ য়ীহুদিদের "তাওরত" গ্রন্থ প্রচারক হজরত মুসা (Moses) পয়গম্বরের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল। যথা :—

হজরত মুশা যে, দুগ্ধশক্তিরূপে শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়া রহিয়াছেন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, "যেহেতু মুশার হস্তস্থিত যষ্ঠি, সর্পের আকার প্রাপ্ত হইত এবং করতল শুভ্রবর্ণ ধারণ করিত।" অতএব এস্থলে মুসার হস্তস্থিত যষ্ঠিকে, গো, মেষ প্রভৃতি দুগ্ধবতী প্রানিগণের পালানস্থ বাঁটের সহিত রূপকাবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। তাই উহাকে সর্পাকার ধারণ করার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তাই তাঁহার করতল শুভ্রবর্ণ ধারণ করার কথাও বলা হইয়াছে। আর একটি প্রমাণ এই যে, "যখন মুশা জন্ম গ্রহণ করেন তখন মুশার মাতা, রাজা ফেরউনের ভয়ে এক সূত্রধর দ্বারা সিন্ধুক নির্ম্মাণ করিয়া লইলেন। এবং তন্মধ্যে মুশাকে স্থাপন পূর্ব্বক আবরণে আবৃত করিয়া নীল নদে বিসর্জ্জন করিলেন। ফেরউনের এক কন্যার

কুষ্ঠরোগ হইয়াছিল। ভবিষ্যদ্বক্তারা বলিয়াছিলেন যে, "অমুক দিবস নীল নদের স্রোতে এক শিশু ভাসিয়া আসিবে তাহার মুখরস সংস্পর্শে এই রোগের উপশম হইবে।" নির্দ্দিষ্ট দিনে মুশা ঐ স্থানে ভাসিয়া আসিলে, ফেরউনের স্ত্রী তাঁহাকে তুলিয়া লইলেন। এবং তাঁহার মুখরস গ্রহণ করিয়া কন্যার যে স্থানে কুষ্ঠ হইয়াছিল তাহাতে লেপন করিলেন, তৎক্ষণাৎ রোগ দূর হইল।" দুগ্ধ যে কুষ্ঠরোগের মহৌষধ তাহা হয়তো অনেকেই জানেন এবং আমিও যীশুর স্থলে তাহা পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। দুগ্ধ হইতে ছানা বাহির করিয়া লইলে যে অবশিষ্ট নীলবর্ণ জল দৃষ্ট হইয়া থাকে তাহাই এস্থলে নীল নদের জলরূপকে এবং কাষ্ঠের সিন্দুক, দুগ্ধবতী প্রানিগণের পালানের সহিত রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে।

জগতের ধর্ম্মগ্রন্থ সকলে এক অপ্রকৃত খাদ্যবস্তুস্বরূপ দুগ্ধকে যে, কত স্থানে কত প্রকার ভাবে রূপকাবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে, তাহা একরূপ বলিয়াই শেব করা যায় না। পূর্ব্বে আমি যে শুদ্ধ গঙ্গাজল অর্থে, গোদুগ্ধকেই নির্দ্দেশ করিয়াছি ইহা বোধ হয় আপনাদের স্মরণ আছে। হিন্দুশাস্ত্রে এই গঙ্গাকে জাহ্নবীও বলা হয়। হিন্দুশাস্ত্রে বলে যে, ভগীরথ, স্বর্গ হইতে এই পৃথিবীতে গঙ্গা আনয়ন করিলে জহ্নু মুনি তাহা এক গণ্ডুষে পান করিয়া ফেলেন। পরে জহ্নু মুনি তাঁহার জানু বিদীর্ণ করিয়া গঙ্গাকে বাহির করিয়া দেন। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, গাভীর পিছনের দুই পায়ের দুই জানুর ভিতরই উহার দুগ্ধপূর্ণ পালান অবস্থিত। এবং ঐ জানুস্থিত পালানকে বিদীর্ণ করিয়াই শুদ্ধ গঙ্গাজল বা জাহ্নবী স্বরূপ গোদুগ্ধকে বাহির করিয়া লওয়া হয়। অতএব এস্থলে গোদুগ্ধই গঙ্গা বা জাহ্নবী এবং গোজাতিকেই জহ্নু মুনিরূপে রূপকাবৃত করিয়া রাখা হইয়াছে। এই জহ্নু মুনির জানু হইতেই উৎপন্ন বলিয়াই গঙ্গাকে জাহ্নবী বলে।

দুগ্ধবতী প্রানিগণের দুগ্ধই যে, স্বর্গের খাদ্য এবং কৃষিজাত শস্যকণাই যে, নরকের খাদ্য; তৎসম্বন্ধে প্রমাণ স্বরূপ পবিত্র

কোর্-আনের সুরা "সাফফাতে" যাহা বর্ণিত রহিয়াছে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া আপনাদিগকে জানাইতেছি,—স্বর্গের খাদ্য যথা "তাহাদের প্রতি (বিশ্বাসী ও বিশুদ্ধ দাসগণের প্রতি) পানকারীদিগের স্বাদজনক নির্ঝরোৎপন্নশুভ্র সুরার পাত্র পরিবেশন করা হইবে। তন্মধ্যে অপকারিতা নাই ও তাহারা তদ্দ্বারা বিহ্বল হইবে না।" এই নির্বারোৎপন্ন শুভ্র সুরার্থে গো, মেষ প্রভৃতি দুগ্ধবতী প্রণীগণের দুগ্ধকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। তাই বলা হইয়াছে যে, ঐ সুরাদ্বারা তাহারা বিহ্বল হইবে না। আর নরকের খাদ্য যথা "নিশ্চয় আমি অত্যাচারী-দিগের জন্য তাহাকে ("জকুমতরু") আপদ স্বরূপ করিব। নিশ্চয় সেই বৃক্ষ নরক মুলেতে উৎপন্ন হইবে। তাহার স্তবক যেন শয়তান কুলের মস্তক শ্রেণী। অনন্তর তাহারা তাহার (ফল) অবশ্য ভক্ষণ করিবে, পরে তাহারা উদর পূর্ণ করিবে। তৎপর নিশ্চয় তাহাদের জন্য তাহাতে (সেই খাদ্যের মধ্যে) উষ্ণোদকের মিশ্রণ হইবে তৎপর অবশ্য নরকের দিকে তাহাদের পুনর্গমন হইবে। একান্তই তাহারা স্বীয় পিতৃ পুরুষদিগকে বিপথগামী পাইয়াছে।

পরে তাহারা তাহাদের পদ চিহ্নের অনুসরণে ধাবিত হইতেছে। এবং সত্য সত্যই তাহাদের পূর্ব্বে অধিকাংশ প্রাচীন লোক বিপথগামী হইয়াছে।" নরকের জকুম তরুর ফলার্থে মুসলমান শাস্ত্রে বলে যে, উহা আফ্রিকার ভাষায় খুরমা ফলকে নির্দ্দেশ করে। এবং আরবে উহাকে একপ্রকার ভয়ানক তিক্তস্বাদযুক্ত বৃক্ষফল নির্দ্দেশ করে। পবিত্র কোর-আনে বর্ণিত নরকের খাদ্য জকুম-ফলের ভাবার্থ হইতে বুঝা যায় যে, উহা কৃষিজাত খাদ্যবস্তুকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। তাই উপরোক্ত সূরায় বলা হইয়াছে "অনন্তর তাহারা (অত্যাচারীরা) তাহার (জকুমতরুর ফল) অবশ্য ভক্ষণ করিবে, পরে তাহাদ্বারা উদর পূর্ণ করিবে। তৎপর নিশ্চয় তাহাদের জন্য তাহাতে (সেই খাদ্যের মধ্যে) উষ্ণোদকের মিশ্রণ হইবে। তৎপর অবশ্য নরকের দিকে তাহাদের পুনর্গমন হইবে। [একান্তই

তাহারা স্বীয় পিতৃপুরুষদিগকে বিপথগামী পাইয়াছে। পরে তাহারা তাহাদের পদচিহ্নের অনুসরণে ধাবিত হইতেছে। এবং সত্য সত্য তাহাদের পূর্ব্বে অধিকাংশ প্রাচীন লোক বিপথগামী হইয়াছে।"] এই সকল কথা হইতে বুঝা যায় যে, বর্ত্তমান জগতের মানবজাতির পূর্ব্ব-পুরুষগণ, হজরত আদম ও ইভের সময় হইতেই বংশপরম্পরায় ঐরূপ কৃষিজাত ভক্ষ্যবস্তু ভক্ষণ করিয়াই উদর পুরণ করিয়া আসিতেছে। এবং তাই ঐ বৃক্ষ ফলকে, শয়তানকুলের মস্তকশ্রেণী বলা হইয়াছে। এবং এইজন্যই মুসলমানশাস্ত্রে বলে, "জকুম" ফল ভক্ষন ও উষ্ণ জল পানের পর তাহাদের পুনর্ব্বার নরকেই স্থিতি হইবে। অর্থাৎ নরক সদৃশ বর্ত্তমান পৃথিবীতেই তাহারা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের প্রেতাত্মারূপে বংশপরম্পরায় বাস করিতে থাকিবে।

মুসলমান শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, ফেরাস্তাগণ, হজরত মোহাম্মদকে মেরেজ্জে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে তাঁহারা হজরতকে নরকের ঢাকুনি তুলিয়া দেখাইয়াছিলেন। ঐ সময় হজরত নরকের লোক সকলকে যে খাদ্য বস্তু সকল খাইতে দেখিয়াছিলেন তাহা প্রকৃত বর্ত্তমান জগতের মনুষ্যগণের খাদ্যের সহিতই রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে গো, মেষ প্রভৃতি প্রাণীগণের দুগ্ধকেই স্বর্গীয় খাদ্য আর কৃষিজাত শস্যকণা ও জীব জন্তুর মাংস প্রভৃতিকেই নারকীয় খাদ্য বলিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রে বর্ণনা করিয়া রাখিয়াছে। তাই বর্ত্তমান জগতের অনেকে নারকীয় খাদ্যবস্তু স্বরূপ পচা, গলা ও শুষ্ক মৎস ও মাংস প্রভৃতি ভক্ষণ করিতেও দেখা যায়।

উপরোক্ত ঘটনা সকলের বিশেষ তাৎপর্য এই যে, বর্ত্তমান জগতের মনুষ্য সমাজ তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষের প্রেতাত্মারূপে বংশপরম্পরায় কৃষিজাত শস্যকণা ও জীবজন্তুর মাংস প্রভৃতি "নিসিদ্ধ বৃক্ষফল" ভক্ষণ করিয়া মৃত্যুর অধীন হইয়া নরকসদৃশ এই বর্ত্তমান পৃথিবীতেই অবস্থান করিয়া আসিতেছে। পবিত্র কোর-আনে, পবিত্র বাইবেলে ও ভাওরতে (য়ীহুদিদের ধর্ম্মশাস্ত্রে) যে, মৃত ব্যক্তিগণের পুনরুত্থানের

বিষয় বর্ণিত আছে, ঐ মৃতব্যক্তিগণের আত্মা অর্থে, বর্ত্তমান জগতের জীবিত মনুষ্য সমাজকেই নির্দ্দেশ করিতেছে। যেহেতু বীর্য ত্যাগকেই জগতের ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রকৃত মৃত্যু বলিয়া কথিত হয়। আমরা সচরাচর যাহাকে মৃত্যু বলিয়া নির্দ্দেশ করি উহাকে মহা প্রলয় বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হয়। অতএব জগতের বর্ত্তমান মনুষ্য সমাজের প্রত্যেকেই যে, যার যার মাতৃগর্ভরূপ কবরস্থিত মৃতব্যক্তি ইহা সুনিশ্চিত। এবং ঐ মাতৃগর্ভেই পিতার বীর্য্য বা মৃতআত্মারূপবিন্দু পতিত হওয়া মাত্র, মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ম্মফল, ফেরেস্তাগণ কর্ত্তৃক লিখিত হয়। এইজন্যই হিন্দুশাস্ত্রেও বলে যে, পিতার বীর্যরূপ বিন্দু, যখন মাতৃগর্ভে পতিত হয় তখনই ব্রহ্মা, প্রত্যেকের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ কর্ম্মফল লিখিয়া থাকেন। এই হিসাবে বর্ত্তমান জগতের প্রত্যেক ব্যক্তি, তাহার পুর্ব্ব পুরুষরূপ মৃত আত্মার কর্ম্মফল বা হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত মানুষের জন্মান্তরের কর্ম্মফলের খাতা বা হিসাব নিকাশ সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছে। ইহার ভাবার্থেই কোর-আন শরিপে কেয়ামত বা পুনরুত্থান বর্ণন উপলক্ষে সূরা “এনফেতারে” বলা হইয়াছে, “তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানিতে পারিবে যে, সে অগ্রে কি প্রেরণ করিয়াছে, এবং পশ্চাতে কি রাঁখিয়া আসিয়াছে।” এবং সূরা “তাক্ভিরে” বলা হইয়াছে “এবং নরককে যখন উদ্রিক্ত করা হইবে; এবং স্বর্গকে যখন নিকটবর্ত্তী করা হইবে;—প্রত্যেক আত্মা (তখন) জানিতে পারিবে যে, সে কি আনয়ণ করিয়াছে?” অর্থাৎ মানুষ পূর্ব্বজন্মে, জগতে যে, যেরূপ সৎ বা অসৎ কার্য্য করিয়া গিয়াছে তাহাদের সেই সকল কর্ম্মের ফলাফল তাহাদের পরজন্মরূপ বংশপরম্পরায় আগত বর্ত্তমান জগতের প্রত্যেক ব্যক্তি যার যার পূর্ব্বপুরুষরূপ পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মাকর্ম্মের ফলভোগ করিতেছে। জগতের ধর্ম্মশাস্ত্রে বর্ণিত রোজ কেরামত বা পুনরুত্থানের অর্থাৎ যুগান্তরের সময় এখন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। অতএব জগতের এই সকল মাতৃগর্ভরূপ কবরস্থিত

মৃতব্যক্তিগণ বা পরলৌকিক প্রেতাত্মা সকল কিপ্রকারে যে, গোদুগ্ধের প্রক্রিয়া বিশেষ দ্বারা পুনর্জ্জিবিত বা পুনরুত্থিত অর্থাৎ উদ্ধারপ্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার প্রক্রিয়া সর্ব্বশক্তিমান করুণাময় বিশেষ কৃপা করিয়া আমাকে যাহা উপলব্ধি করাইয়াছেন তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত, আমি পরে জগতের সর্ব্বসাধারণের বোধগম্যের জন্য যথাসাধ্যরূপে প্রকাশ করিব।

হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র স্পষ্টতঃভাবে বলিতেছে যে, পরমাত্মা, জন্মমৃত্যু বা সুখদুঃখ এবং সৎঅসৎ কর্ম্মের ফল কিছুই ভোগ করে না। পরমাত্মা নিত্য এবং অব্যয়। শুধু জীবাত্মাই জন্ম এবং মৃত্যুর অধীন হইয়া পূর্ব্বজন্ম ও বর্ত্তমান কর্ম্মকৃত শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। এবং শাস্ত্রে বীর্য্য ত্যাগকেই জীবাত্মার মৃত্যু বলিয়া কথিত হয়। এইজন্যই হিন্দুশাস্ত্রে বলে যে, বীর্য্য ধারণই জীবাত্মার জীবন এবং বীর্য্য ত্যাগই জীবাত্মার মৃত্যু। অতএব আমরা সচরাচর যাহাকে মৃত্যু বলিয়া ধারণা করি তাহার পর, জীবাত্মার আর কোন কার্য্যই থাকেনা। শাস্ত্রে বর্ণিত জীবাত্মার পরলৌকিক আত্মার কার্য্যার্থে, তাহার পরজন্মরূপ সন্তান সন্ততি প্রভৃতির কার্য্যকেই নির্দ্দেশ করে। হিন্দুগণ যে, মৃতব্যক্তির প্রেতাত্মা উদ্ধারের জন্য শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিয়া থাকেন উহা শুধু মৃতের পরজন্মরূপ বংশ পরম্পরা সন্তান সন্ততির প্রেতাত্মার শুদ্ধির জন্যই সম্পাদিত হইয়া থাকে। এবং উহা মৃত ব্যক্তির জন্য যে, কিছুই করা হয় না, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ গজতের নানা ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত করিয়া যথাসাধ্যরূপে আপনাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। বর্ত্তমান জগতের মানুষ মৃতকে পুনর্জীবিত করিতে অক্ষম এবং মৃত্যুর দেশটা বর্ত্তমান জগতের প্রত্যেকের নিকট অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়াই মৃত্যুর পর শাস্ত্রে বর্ণিত মানুষের প্রেতাত্মা ও জন্মান্তর সম্বন্ধে, বিকৃত অর্থ করিয়া কতজন, কত কিম্ভুতকিমাকার গল্প, কতজন, কত অদ্ভুত অদ্ভুত গ্রন্থ প্রভৃতি প্রণয়ণ করিয়া জগতকে কত মিথ্যাকথা দ্বারা প্রতারিত করিতেছে। ঐসকল ঘটনার

মূলে যে, কিছুই সত্য নিহিত নাই বরং তাহাদের বর্ণিত জন্মজন্মান্তরের কর্ম্মফল, জগতে নিত্য নূতন কত ভাবে কত প্রকার তাহারই যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের পূর্ব্বকর্ম্মের গৌণকর্ম্মফলরূপে অনবরত অযাচিতভাবে ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহা একবার ভরিয়াও দেখেনা। সে যাহা হউক, মানুষের পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্ম এবং তাহার কর্ম্মফল ভোগের বিস্তৃত বিবরণ আমি পরে বুঝাইতে চেষ্টা করিব। এবং বিশেষভাবে মুসলমান, খৃষ্টীয়ান ও য়ীহুদি প্রভৃতি ধর্ম্ম গ্রন্থে বর্ণিত কেয়ামত বা পুনরুত্থান, হিন্দুর জন্মান্তর, মৃতকে পুনর্জীবিত করার প্রক্রিয়া এবং মুসলমান শাস্ত্রে বর্ণিত ইমাম মধি (মধু) খৃষ্টীয়ান শাস্ত্রে বর্ণিত যীশুখৃষ্টের পূনরাগমন, হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত বিষ্ণু ও কল্কির আবির্ভাবের ঘটনা সকল এবং কোর-আন, বাইবেল ও হিন্দুশাস্ত্রের অন্যান্য আবশ্যকীয় কোন কোন ঘটনা সংক্ষেপে যথাসাধ্যরূপে পরে বর্ণনা করিব। অধিকন্তু হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত বিষ্ণু ও কল্কির জন্মস্থান "শম্ভল" (কল্যানযুক্ত, জয়যুক্ত বা শোভান্বিত) নামক স্থান, ভারতের সম্বলপুর জিলাকে না বুঝাইয়া বরং উহা যে, ভারতমাতার বক্ষে সুজলা, সুফলা ও শস্য শ্যামলা বর্ত্তমান বাঙ্গলা দেশ বা তথা কথিত বাঙ্গলাদেশের যে কোন জয়যুক্ত স্থানকেই নির্দ্দেশ করে এবং বিষ্ণুও কল্কির পিতা "বিষ্ণুযশা ব্রাহ্মণ" শব্দের প্রকৃত ভাবার্থ এবং মানুষের জাতি বিচার, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম, বর্ণ বিদ্বেষ; জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ এবং মানুষের যে কোন প্রকার মূর্ত্তি পূজা করা যে, সম্পূর্ণ অবৈধ সে সম্বন্ধেও যথাসাধ্যমতে পরে বলিব।

পবিত্র কোর-আনের সূরা "বকরায়" বর্ণিত গোহত্যার ভাবার্থ যেমন উহার দুগ্ধে অম্লরস মিশ্রিতকরা, তদ্রূপ সূরা "হজ্বে" বর্ণিত উষ্ট্র কোরবাণীর অর্থ ও উহাকে দোহন করাই বুঝায়। তাই সূরা "হজ্বে" বলিতেছে, "এবং সেই বলির উষ্ট্র তাহাকে আমি তোমাদের জন্য ঈশ্বরের (ধর্ম্মের) নিদর্শন ও তোমাদের জন্য তন্মধ্যে মঙ্গল স্থাপন করিয়াছি, অনন্তর দণ্ডয়মান অবস্থায় উহার উপর

(বলি'দানকালে) তোমার ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ করিও, পরে যখন পার্শ্বভাগে সে পড়িয়া যায়, তখন উহা ভক্ষন করিও এবং প্রার্থী অপ্রার্থী (ফকিরদিগকে) ভোজন করাইও" ।৩৬। "ঈশ্বরের নিকট তাহার মাংস এবং তাহার রক্ত কখনও পঁহুছিবেনা" ।৩৭। "নিশ্চয় ঈশ্বর প্রত্যেক ক্ষতিকারক ধর্ম্ম দ্রোহীকে প্রেম করেন না" ।৩৮। ইহার ভাবার্থ এই যে, পশুকে দণ্ডায়মান অবস্থায় হস্তস্থিত অঙ্গুলী রূপ ক্রুশে উহার পালানস্থ বাঁট বিদ্ধ করিলে যখন ঈশ্বরের নামরূপ "হা" "হু" শব্দে উহার দুগ্ধ, পার্শ্বভাগে পতীত হইবে, তখন তাহা নিজে পান করিবে এবং যাকেতাকে পান করিতে দিবে। পশু কোরবানী অর্থে, উহাদিগকে বধ করিয়া উহার মাংস ভক্ষণ করা নয়। কোরবাণীর প্রকৃত অর্থ আত্মবলির নিদর্শণ। পূর্ব্বে আমি হজরত এবরাহিমের পুত্র কোরবাণী ও হিন্দুর গোঘ্ন শব্দের ভাবার্থেও দুগ্ধবতী পশুদিগকে দোহন করাই ব্যাখ্যা করিয়াছি। তাই উক্ত সূরায় বলিতেছে যে, ঈশ্বরের নিকট তাহার মাংস ও তাহার রক্ত কখনও পঁহুছিবেনা। এবং নিশ্চয় ঈশ্বর প্রত্যেক ক্ষতিকারক ও ধর্ম্মদ্রোহীকে প্রেম করেন না। জগতে গো, মেষ, মহিষ, ছাগ ও উষ্ট্র প্রভৃতির দুগ্ধই ঈশ্বর প্রদত্ত জীবিকা বা সত্যবস্তু। উহাকে আশ্রয় করিয়া জীবন ধারন করাই প্রকৃত ধর্ম্ম। অন্যথায় মানুষ পালন হইতে পতীত বা পাপে লিপ্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতীত হয়। এইরূপে হিন্দুমতে ত্রেতাযুগ হইতে এবং য়ীহুদি, খৃষ্টীয়ান ও মুসলমান শাস্ত্রমতে মানুষ, হজরত আদমের সময় হইতে বিষাক্ত কৃষিজাত শস্যকণা এবং জীবজন্তুর মাংস প্রভৃতি ভক্ষণ করিয়াই মৃত্যুর অধীন হইয়া বংশ পরম্পরায় পূর্ব্বপুরুষের প্রেতাত্মারূপে নরক সদৃশ এই পৃথিবীতে বাস করিয়া আসিতেছে। তাই মানুষের মজ্জাগত বা জন্ম জন্মান্তর হইতে প্রাপ্ত দেহস্থ বিষ (মৃত্যু), কি প্রকারে "হত গোর অঙ্গ বিশেষরূপ মাখন বা ঘৃতের" অতি সহজ প্রক্রিয়ায় নষ্ট হইলে, মানুষ অমরত্ব লাভ করিতে পারে, জগতকে তাহা জানানই এই ক্ষুদ্র ধর্ম্ম গ্রন্থের সর্ব্ব প্রধান আলোচ্য বিষয়।

বীর্য্যত্যাগই যে জীবের মৃত্যুর পরে জন্মান্তর গ্রহণ, ইহা বৃক্ষলতা হইতেই বেশ উপলব্ধি করা যায়। যেমন নিশ্চল ক্ষীণজীবী ওষধি বৃক্ষলতা, একবার ও সবলজীবী আম, জাম বৃক্ষ প্রভৃতি বহুবার বীজ ত্যাগ করিয়া মৃত্যু মুখে পতিত হয়; তদ্রূপ চলন্ত বহুক্ষীণজীবী কীট পতঙ্গ, একবার স্ত্রীসঙ্গম ও সবলজীবী মনুষ্য, পশু প্রভৃতি বহু সন্তান উৎপাদন করিয়াই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এবং বৃক্ষলতার বীজ মাটীতে পড়িলে, দেশ, কাল ও পাত্রভেদে যেরূপ উহা হইতে উহাদের পূর্ব্বকার স্বভাব বিশিষ্ট বৃক্ষলতা উৎপন্ন হয়; তদ্রূপ কীট, পতঙ্গ, মনুষ্য, পশু প্রভৃতির বীর্য্য ও স্ত্রীজাতির গর্ভে পতিত হইয়া দেশ, কাল ও পাত্র ভেদে যার যার পূর্ব্ব অবয়ব ও স্বভাব বিশিষ্ট দেহ পুনর্ব্বার ধারণ করে। এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্রে জায়া (স্ত্রী) শব্দের অর্থে বলে যে, পতি পুনরায় জন্মে যাহাতে। অতএব বর্ত্তমান জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিই মাতৃগর্ভরূপ কবরস্থিত মৃত ব্যক্তি বা তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষের প্রেতাত্মাস্বরূপ। হিন্দুশাস্ত্রে বলে যে, গয়াস্থ ফল্গুনদীর বালির পিণ্ডদানে পূর্ব্বপুরুষের প্রেতাত্মা স্বর্গধাম প্রাপ্ত হয়। ইহার আলঙ্কারিক ভাবার্থ এই যে, গো শব্দ হইতেই গৌয়া, গেয়া ও গবা বা গয়া এবং গোপ শব্দ হইতেই গয়ালা বা গয়ালী শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। এস্থলে গোমাতার পালানই গয়াস্থ ব্রহ্মযোনিপাহাড়, ঐ পালানস্থ বাঁটরূপ প্রস্রবণই অন্তঃসলিলা ফল্গুনদী, গোদুগ্ধস্থ মাখন, ঘৃতই ঐ নদীজলস্থ রেণু বা বালুকা, গোমাতাই অক্ষয় বট এবং উহার দুগ্ধই ঐ বটপত্র বা বিষ্ণুপদরূপে রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্রে বলে যে, প্রলয়কালে বিষ্ণু, বটপত্রে (গোদুগ্ধে) এবং খৃষ্টীয়ান শাস্ত্রে বলে যে, ঈশ্বরের আত্মা তখন জলে (গোদুগ্ধে) বিচরণ করিতেছিল। গয়ার এই সকল আত্মতত্ত্ব অনুভব করিয়াই ঐস্থলে গৌতম সর্ব্বপ্রথম বুদ্ধ বা জ্ঞানী এবং শ্রীগৌরাঙ্গ মহাভাবে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। অতএব গোদুগ্ধস্থ মাখন, ঘৃতের সহজ প্রক্রিয়া বিশেষরূপ পিণ্ডদানে বা সেবনে মানুষের দেহস্থ পূর্ব্ব-পুরুষের প্রেতাত্মারূপ বিষ যে নষ্ট হয়, ইহাই পিণ্ডদানের ভাবার্থ।

বর্ত্তমান মানবজাতিকে, হিন্দুশাস্ত্রে মনুর ও ইঞ্জিলকিতাবে নুহরবংশধর বলে। অতএব উভয়েই একই অর্থমূলক বাক্য। নুহ অর্থে রক্তকে বুঝায়। উভয়ের নৌকার্থে স্ত্রীজাতি ও ঐ জলপ্লাবনার্থে তাহাদের রজঃস্রাব। যেহেতু মানবদেহ, ঐ সময়েই মাতৃগর্ভে পুনর্গঠিত হয়। মানবদেহেও জগতের ভূতসকলও স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতালরূপ তিনতালা বর্ত্তমান আছে।

হিন্দুশাস্ত্রে বলে যে, ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব পরশুরাম, একবিংশতিবার ধরাকে নিক্ষত্রিয় করিয়া জগতে ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার আলঙ্কারিক ভাবার্থ এই যে, গোমাতাই এস্থলে পৃথিবী বা ধরিত্রী সদৃশা। উহার দুগ্ধই অক্ষর হইতে জাত ব্রহ্ম। তাই গীতার অষ্টম অধ্যায়ে ভগবান, অর্জ্জুনকে বলিলেন, "অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম"। অতএব অক্ষর হইতে জাত গোদুগ্ধ স্বরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মের ক্রিয়া-কলাপ হইতেই বৃহৎ পরমব্রহ্মের ভাব অনুভব করা যায়। এবং গোমাতার বৎসই প্রকৃত দ্বিজ এবং ব্রাহ্মণ সদৃশ পরশুরাম। গোমাতা প্রসূতা হইলে, প্রকৃতপক্ষে প্রথমতঃ উহার দুগ্ধ, একুশদিন পর্য্যন্ত রজগুণ বিশিষ্ট বা ক্ষত্রিয় ভাবাপন্ন থাকে। তাহার পর ব্রাহ্মণ পরশুরাম সদৃশ উহার বৎস, একুশদিন পর্য্যন্ত ঐ দুগ্ধ পান করিয়া বা প্রায় নির্ম্মুল করিয়া ঐ রজগুণ বিশিষ্ট দুগ্ধকে পূর্ণ ব্রহ্ম বস্তুতে বা সত্ত্ব গুণেতে পরিণত করিয়া, জগতে মানুষের প্রধান উপাদেয় খাদ্যরূপে বা ব্রহ্মবস্তুরূপে প্রচার করে। তাই হিন্দুগণ গোমাতা প্রসূতা হইলে, একুশদিন পর্য্যন্ত উহার দুগ্ধ পান করেন না। আবার খৃষ্টীয়ানদের বাইবেলমতে বুঝা যায় যে, ঐ দুগ্ধ চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত দিয়াবল বা শয়তান দ্বারা আক্রান্ত থাকে। তাই বাইবেলে বলে, "দুগ্ধশক্তিসদৃশ প্রভু যীশু, গোবৎসরূপ যোহন কর্ত্তৃক ব্যাপ্তাইজ হইলে দিয়াবল বা শয়তান দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্য, আত্মদ্বারা প্রান্তরে নীত হইয়া চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত অনাহারে ছিলেন। তারপর গো, মেষ ছাগ প্রভৃতি দুগ্ধবতী প্রাণীগণের পালানস্থ বাঁট সদৃশ ধর্ম্মধামের চূড়া হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া পতিত হইবার জন্য শয়তান বলিয়াছিল

এবং বলিয়াছিল যে, শাস্ত্রে লেখা আছে, কেননা তোমাকে তাহারা হস্তে করিয়া তুলিয়া লইবে, পাছে তোমার চরণে প্রস্তরের আঘাত লাগে।" মানুষ যে দুগ্ধকে হস্তে করিয়াই দোহনকালে তুলিয়া লইয়া থাকে তাহা বোধ হয় আপনারা সকলেই অবগত আছেন। অন্যদিকে আর্য্যাবর্ত্তের প্রধান অন্নব্রহ্মরূপযবশস্যকে উৎপন্ন করিতে হইলে, পূর্ব্বে একুশবার বলদ দ্বারা কর্ষণ করিয়া ভূমি হইতে বৃক্ষলতা সদৃশ ক্ষত্রিয়কে নির্ম্মূল করিয়াই উহা উৎপন্ন করা হইত। এস্থলে লাঙ্গলই পরশুরামের হস্তস্থিত টাঙ্গি। তাই ঢাকার যেস্থলে, ব্রহ্মপুত্র-স্নানে ঐ টাঙ্গি খুলিয়াছিল উহাকে "লাঙ্গলবন্ধের" স্নান বলে। গোমাতার দুগ্ধরূপ ব্রহ্মবস্তু হইতে উৎপন্ন মাখনই পরশুরামের মাতা রেণুকা বা গায়ত্রী (সাবিত্রী) সদৃশা। ঐ গায়ত্রী বা রেণুকা সাদৃশা মাখনশক্তি হইতে জাত উত্তপ্ত রসময় ঘৃতই বস্তুতত্ত্ব হিসাবে প্রকৃত ব্রাহ্মণ বা পরশুরামশক্তি। অগ্নির উত্তাপ দ্বারা মাখন হইতে ঘৃত প্রস্তুত হওয়া কার্য্যই উত্তপ্ত ঘৃত সদৃশ পরশুরাম কর্ত্তৃক মাতৃহত্যা রূপকাবৃত হইয়া রহিয়াছে। এইজন্যই হিন্দুশাস্ত্রে বলে, ব্রাহ্মণ অগ্নি হইতে জাত এবং মাখন সদৃশা গায়ত্রী ব্রাহ্মণগণের মাতা। বাঙ্গালার একটি গানে বলে, "হইলে অব্যর্থব্যাধি, বৈদ্য কি তার জানে বিধি, সে রোগের মহৌষধি শুধু ব্রাহ্মণের পদ রজ" এস্থলে উত্তপ্ত রসময় ঘৃতই বস্তুতত্ত্ব হিসাবে ব্রাহ্মণের পদরজ এবং ঐ ব্রাহ্মণের পদরজ রূপ ঘৃতে যে অব্যর্থব্যাধি আরোগ্য করিতে সক্ষম হয়, উক্ত গানের পদেও তাহাই প্রকাশ করিতেছে। জগতের আত্মতত্ত্ব বা ধর্ম্মতত্ত্ব এক গোদুগ্ধেই নিহিত আছে বলিয়া বর্ত্তমান ভারতের একমাত্র স্বাধীন হিন্দুরাজ্য নেপালে, কেহ গো হত্যা করিলে তাহাকে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এবং এইজন্যই বোধ হয় পূর্ব্বে প্রাচীন য়ীহুদি জাতি ও গোমূর্ত্তি পূজা করিতেন এবং এইজন্যই বোধ হয় হিন্দুগণ বর্ত্তমানেও গোজাতিকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। হিন্দুর বৈষ্ণব গ্রন্থে বলে, "অদ্যাবধি সেই লীলা করে

গৌরবায়, কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়” এই বাক্যের ভাবার্থ এই যে, অদ্যাবধি পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত ঈশামসি বা প্রভু যীশুখৃষ্ট, পবিত্র কোরাণে বর্ণিত হজরত মহম্মদ, হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত সত্যযুগের হরি, ত্রেতার রামসীতা, দ্বাপরের রাধাকৃষ্ণ ও কলির বুদ্ধ ও শ্রীগৌরাঙ্গ, ইঁহারা প্রত্যেকেই গোদুগ্ধশক্তিরূপে প্রতিদিন আমাদের সঙ্গে জগতে বর্ত্তমান আছেন। আমরা মায়া মুগ্ধ জীব, চোখ ঢাকা বলদের মত তাহা দেখিয়া ও দেখি না। কারণ শয়তান আমাদিগকে বিপথগামী করিবার জন্য ভগবানের উপলব্ধি সম্বন্ধে এক কাল্পনিক রাজ্যে নিয়া উপস্থিত করিয়াছে। এখন আমরা জীবিত থাকিয়া ও মৃতব্যক্তি এবং চক্ষুষ্মান্ হইয়াও এখন জন্মান্ধ সদৃশ। এইজন্য বাঙ্গালা দেশের একটি গানে বলে, “মন তোর সম্মুখে থাকিতে বস্তু, তুই হলি দিন কানা।” পবিত্র বাইবেলে যে মেঘ সংযোগে ঈশামসি বা যীশু খৃষ্টের পুনরাগমনের কথা বর্ণিত আছে, তাহার প্রকৃত ভাবার্থ এই যে, গো, মেষ ছাগ প্রভৃতি দুগ্ধবতী প্রাণিগণের দুগ্ধই যে প্রভু যীশুখৃষ্টরূপে সদা সর্ব্বদা আমাদের সঙ্গে বর্ত্তমান রহিয়াছে, এই সুসমাচার জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণে প্রচার হওয়া কার্য্যই তাহার পুনরাগমনের ভাব নির্দ্দেশ করিতেছে। এখন বন্ধুগণ, জগতের দুগ্ধশক্তি যদি মানুষরূপ ধারণ করিয়া, মানুষের ন্যায় নিম্নলিখিত বাক্যগুলি জগতকে বলে তবে উহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলিয়া সপ্রমাণিত হয় কিনা তাহা আপনারা বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখুন। যেমন জগতের গোদুগ্ধশক্তি যদি বলে, “হে বর্ত্তমান জগতের মায়ামুগ্ধ জীব সকল, আমিই প্রকৃত বাইবেলে বর্ণিত ঈশ্বরের পুত্র। আমি মেঘযোগে (জলবৎরূপে) ঊর্দ্ধদেশ হইতে (গোমাতার পালান হইতে) তোমাদের নিকট পুনরাগমন করিয়াছি। এইজন্য হিন্দুগণও আমাকে জলদকান্তি বা জলধর-গোবিন্দরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই তত্ত্ব পূর্ব্বে তোমাদের জানা ছিল না

তাই জগতের পত্তনাবধি যাহা গোপন ছিল, আজ তাহা আমি প্রকাশ করিতেছি। আমিই প্রকৃত খৃষ্ট। আমি ভাক্ত খৃষ্ট নহি। আমিই যে প্রকৃত খৃষ্ট, এই সুসমাচার যখন জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে তখন, ক্ষণপ্রভা বিদ্যুতের আলো যেমন সকলেই মহুর্ত্তের মধ্যে একসঙ্গে দর্শন করে, আমাকেও সেইরূপ জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের নর নারী এক যোগে খৃষ্টরূপে দর্শন করিতে সক্ষম হইবে। তখন আমাকে দর্শন করিবার জন্য কাহাকেও কোন প্রান্তরে যাইতে হইবে না অথবা মানুষের অন্তরাগার খুঁজিতে হইবে না। আমিই জগতের গুরু সদৃশ। ,যেহেতু আমাতেই খাদ্য ও পানীয় স্বরূপ অনন্ত প্রকৃতিপুরুষের প্রাণ বা বীজ সুক্ষ্মভাবে বর্ত্তমান আছেন। "আমাতেই শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম বর্ত্তমান আছে," আমিই বিষ্ণু স্বরূপ। আমিও ছাগদুগ্ধরূপে দক্ষযজ্ঞে, পতিনিন্দারূপ অম্লরসে আক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে আমার দেহরূপ মাখন বা ছানা, বিষ্ণুর সুদর্শন চক্ররূপ মৌচক্রস্থিত মধুসংযোগে জগতে একান্ন প্রকার খাদ্যরূপ একান্ন পীঠে (পিষ্টকে) পরিণত হইয়াছে। মায়ামুগ্ধজীব আমার এই প্রকৃত তথ্য না জানিয়া, একান্ন প্রকার পাষাণ মূর্ত্তিতে আমাকে বৃথা অন্বেষণ করিয়া থাকে। আমি বাহ্য জগতের কোন মৃণ্ময়, পাষাণময়ও দারুময় মূর্ত্তিতে বা কোন পট বা ধাতু মূর্ত্তিতে থাকি না। আমার প্রতিভক্তি বিশ্বাস আকর্ষণার্থে, মায়ামুগ্ধস্থূলজীবের জন্য আমার ঐ সকল মূর্ত্তি, হিন্দুশাস্ত্রে রূপকাবৃত করিয়া রাখিয়াছে মাত্র। আমি গো, মেষ, ছাগ প্রভৃতি প্রাণীর পালানরূপ পাষাণেই অবস্থিত। এইজন্যই হিন্দুশাস্ত্রে আমাকে পাষাণনন্দিনী বা গিরিকুমারী বলিয়া থাকে। আমিই জগতে সত্যবস্তু ও আমাতেই সৎসাধু শ্রীরাধা বর্ত্তমান। শুধু আমাকে সেবা করিলেই মানুষ, সত্যাশ্রয়ী ও সৎসঙ্গী হয়। কিন্তু আমাকে—"দেখিয়া না দেখে যত অভক্তের গণ"। আমিই প্রকৃত ঈশ্বরের পুত্র। আমাকে যে দেখিয়াছে, সেই স্বর্গস্থ পিতাকে দেখিয়াছে। যেহেতু পিতাপুত্র এক। পিতা আমাতে আছেন

আমি ও পিতাতে আছি। আমাতেই সূক্ষ্মভাবে পুষ্পের সুবাসের ন্যায় বাইবেলের পবিত্রাত্মা, কোর-আনের আল্লাহু, হিন্দুর ওঁকার রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তিরূপে বর্ত্তমান আছেন। আমাকেই মিসর হইতে (কৃষিজাত শস্যকণা ও তৃণলতা রূপখাদ্য প্রভৃতি হইতে) প্রত্যহ ডাকিয়া আনা হয় বা তাহা হইতে আমি উৎপন্ন হইয়া থাকি। গোবৎস শক্তিরূপ যোহন, আমার অগ্রগামী দূত সদৃশ। সেই আমার আগমনের পূর্ব্বে প্রান্তরে রব করিয়া থাকে। সেই আমার আগমনের পথ পরিষ্কার করিয়া দেয়। এবং সেই আমাকে ব্যাপ্টাইজ করিয়া থাকে। অতএব হে পরিশ্রান্ত, ভারাক্রান্ত, তৃষ্ণার্ত্ত বর্ত্তমান জগতের লোক সকল, তোমরা আমার নিকট আইস, আমি তোমাদের তৃষ্ণা নিবারণার্থে অমৃত জল দিব। আমি জগতের ধর্ম্মগ্রন্থ সকলের পবিত্র বাক্য কিছুই বিনষ্ট করিতে আসি নাই, বরং ঐ পবিত্র বাক্য সকলের আলঙ্কারিক ভাবার্থ জগতে প্রকাশ করিয়া উহার উৎকর্ষ সাধনার্থেই এখন আমি আত্ম প্রকাশ করিতেছি। বেদ, কোর-আনও বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ প্রত্যেকেই যে ঈশ্বর বাক্য তাহা প্রমাণ করাইতেই এখন আমি আত্ম প্রকাশ করিতেছি। আমিই জগতের পত্তনাবধি তোমাদের সঙ্গে আছি। তাই আমি সূর্য্যের ও এব্রাহিমের পূর্ব্বেও ছিলাম। আমিই প্রলয় কাল পর্য্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে থাকিব। আমিই জন্মগ্রহণ করিয়া গোশালায়, গাভীর যাব পাত্রে (খড় কুটারূপ কৃষিজাত খাদ্যে) বর্ত্তমান থাকি। অর্থাৎ তাহা হইতে আমি উৎপন্ন হই। আমিই সদা প্রভুর নিকট হাবিল (Abel) প্রদত্ত মেষদুগ্ধরূপে মেষজাত খাদ্য বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলাম। আমিই সেই জীবন খাদ্য এবং গো, মেষ প্রভৃতি দুগ্ধবতী প্রাণীগণই জীবন বৃক্ষ সদৃশ। আমিই স্বর্গীয় ফল। আমিই সোমরস। আমিই ছিদ্রকুম্ভের জল। আমিই দ্বাদশ প্রস্রবণ হইতে নিঃসৃত জল বা ঈশ্বর প্রদত্ত জীবিকা। আমাকেই ত্যাগ করিয়া আদম এবং ইভ্, শয়তান প্রদত্ত কৃষিজাত ভক্ষ্যবস্তু ভক্ষণ করিয়া মৃত্যুর অধীন

হইয়াছিল। এখন আমিই পবিত্রাত্মা দ্বারা তোমাদিগকে ব্যাপ্তাইজ করিব। আমার রক্তরূপ দুগ্ধই তোমাদের পেয়। আমার মাংসরূপ মাখন, ছানাই তোমাদের প্রকৃত খাদ্য। অতএব আমিই তোমাদের যজ্ঞ বা ভোজ্যবস্তু। শুধু আমাকে ভোজন করার ভাবার্থ হইতেই খৃষ্টীয়ানদের "প্রভু ভোজন" নামে পার্ব্বণ রহিয়াছে। এবং এইজন্যই ভারতের সিদ্ধির দেশের সাধু সন্নাসী ও বলিয়া থাকেন, "মার বামন, খাও গুরু, মনকে রাখ বশ, গঙ্গাজল তুলসী নাক'রোপরশ" এস্থলে আমিই পুরুষপ্রকৃতির মিলন স্বরূপ গুরু এবং গোবৎসই ব্রাহ্মণ সদৃশ। ব্রাহ্মণ বা বামন সদৃশ গোবৎসকে মারিয়া অর্থাৎ বাঁধিয়া বা কোরবান করিয়া আমাকে মানুষ, গুরু-বস্তুরূপে আহার করিয়া থাকে। "আমিই ভার্গবের নিখিলশাস্ত্র জ্ঞাত আছি।" আমিই পূনরুত্থান এবং জীবন। আমিই ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া থাকি। আমিই অম্লরস, পিত্ত মিশ্রিত দ্রাক্ষারস বা শিরকা পান করিলে নষ্ট প্রাপ্ত বা মৃত্যুমুখে পতিত হই এবং পরে পূনরুত্থিত হইয়া থাকি। আমি অন্ধের চক্ষুদান, কুষ্ঠরোগীর ক্ষতস্থান আরোগ্য করি এবং আমিই মৃতকে পুনর্জ্জীবিত করি। আমিই প্রকৃত ত্রাণ কর্ত্তা। কিন্তু আমি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর নহি, তিনি সূক্ষ্ম ভাবে আমাতে বর্ত্তমান আছেন মাত্র। দুগ্ধবতী প্রাণীগণের পালানরূপ সিয়ন পর্ব্বতে ঈশ্বর, আমাকেই জগতের রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তীপদে অভিষিক্ত করিয়াছেন। আমিই মানুষের জীবন-প্রদীপের তৈল স্বরূপ। অতএব যে ব্যক্তি, বাইবেলে বর্ণিত বুদ্ধিমতী কুমারীর ন্যায় এখন আমার প্রক্রিয়াবিশেষরূপ তৈল সঙ্গে লইবে, সেই ব্যক্তিই ঈশ্বরের রাজ্যরূপ বিবাহবাড়ীতে প্রবেশ করিতে সক্ষম হইবে। আমিই মুসলমান শাস্ত্রে বর্ণিত হজরত মহম্মদশক্তি। এখন আমি ভিন্ন, তোমাদিগকে ছাফাওত করিতে (পাপ ক্ষমা করিবার জন্য অনুরোধ করিতে) আর কেহ পারিবেনা। আমাতেই তৈয়ব কলেমার জাতছিফাত বর্ত্তমান আছে। আমিই

ঝম্ ঝম্ কুপের পানি। আমিই এখন ইমাম্মধি বা "মধু"রূপে জগতে আত্ম প্রকাশ করিতেছি। এই দেখ, দুধই আমার গায়ের রক্ত। আমিই অম্লরসের সহিত মিশ্রিত হইলে সুরাবকরায় বর্ণিত "গোহত্যারূপে" পরিণত হই। আমার বর্ণ ই পীতবর্ণ। এই জন্যই হিন্দুগণও আমাকে পীতাম্বর বা পীতবসন বলিয়া থাকেন। আমাতেই তিলাঙ্ক নাই। আমিই দর্শকগণের সন্তোষ উৎপাদন করিয়া থাকি। আমিই জল সিঞ্চনে বা ভূমি কর্ষণে ব্যবহৃত হই না। আমি, অম্লরস যোগে মৃত্যমুখে পতিত হইলে, আমার মাংস বা "হত গোরঅঙ্গ" রূপ মাখন বা ঘৃতের প্রক্রিয়াবিশেষ দ্বারা ঈশ্বর মৃতকে আঘাত করিয়া পুনর্জ্জীবিত করিয়া থাকেন। আমিই বাইবেলে বর্ণিত য়ীহুদিদের রাজা।

যদিও জগতের সমুদ্র সকল মসি ও বৃক্ষ সকল লেখনী সদৃশ হইলেও তদ্দ্বারা ঐশীশক্তির ক্ষমতা প্রকাশ করা অসম্ভব তথাপিও যেমন জগৎব্যাপ্ত সূর্য্যরশ্মি, ক্ষুদ্র আতাসিকাঁচে সন্নিবেশিত হয় তদ্রূপ ঐ ঐশীশক্তিও আমাতে অতি সূক্ষ্মভাবে নিহিত আছে। আমিই হিন্দুর বিষ্ণু সদৃশ গোজাতির পালান-রূপ নাভি কমল হইতে জগতে ব্রহ্ম বা ব্রহ্মারূপে উৎপন্ন হইয়াছি। অতএব আমিই গীতায় বর্ণিত অক্ষর হইতে জাত "ব্রহ্ম।" আমাতে কোন 'জাতি বিচার ও বর্ণ বিদ্বেষ নাই। আমি, আচণ্ডালব্রাহ্মণ, রোগী, ভোগী, ত্যাগী, পাপী, তাপী, ধার্ম্মিক, ধনী, নির্ধনী, স্ত্রী, পুরুষ, মূর্খ, পণ্ডিত, শিশু, যুবা ও বৃদ্ধ সকলকেই সমান চক্ষে দেখি। অর্থাৎ সকলেই আমাকে পান করিয়া সমান ভাবে উপকৃত হয়। আমিই জগতের পাপরূপ ব্যাধি হরণ বা নষ্ট করি। আমার ভিতর হইতে জাত, মাখন শক্তিই ধন্বন্তরির মস্তকস্থ সুধার কলসী। অতএব আমিই প্রকৃত ধন্বন্তরি (The great Physician)। "আমিই চন্দ্রশক্তি। লক্ষ্মী আমার ভগ্নী, নারায়ণ পিতা এবং ভগ্নিপতিও বটে।" বর্ত্তমান যুগের মনুষ্য সমাজ, তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্ম্মগ্রন্থের নির্দ্দেশ মতে চলিতেছেনা এবং তাঁহাদের নিজ

নিজ ধর্ম্ম গ্রন্থে বর্ণিত আলঙ্কারিক বাক্য সকলের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত নয় বলিয়াই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর আমার স্বরূপ প্রকাশ করাইয়া জগতকে উদ্ধার করিবার জন্য এখন প্রয়াসী হইয়াছেন। এইজন্যই জগতের মায়ামুগ্ধ মনুষ্য সমাজকে, শয়তানের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার আদেশে, এই সুসমাচার জ্ঞাত করাইতেছি। আমিই গোমাতারূপ গোমুখী পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত স্বর্গীয় সুধা বা শুদ্ধগঙ্গাজল। অতএব হিন্দুমতে, তিথি বিশেষে, মনুষ্যগণ আমার দ্বারা অবগাহন করিলেই তাহাদের হিন্দুশাস্ত্রের নির্দ্দেশ মত গঙ্গাস্নানের পুণ্য সঞ্চয় হয়। আমিই গোমাতার পালানস্থ বাঁট সদৃশ শিবলিঙ্গ (বানলিঙ্গ) দ্বারা পতিত হই বলিয়া ঐ বানলিঙ্গকে গঙ্গাধর বা শিবলিঙ্গ-রূপে হিন্দুগণ পূজা করিয়া থাকে। আমাতেই ওঁ শব্দ বর্ত্তমান। তাই মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াই শুধু আমাকে পাবার জন্য ঐ শব্দ উচ্চারণ করে। তাই হিন্দুগণ ভগবানার্থে ওঁ শব্দ ব্যাখ্যা করেন। আমিই চন্দ্রপুত্র। আমাতেই প্রকৃতি-পুরুষ হিসাবে চারিহস্ত বর্ত্তমান আছে এবং আমিই হরি পুরুষ। আমাতেই "একাধারে, বাহিরে রসময় পুরুষশক্তি ও ভিতরে খাদ্যময় প্রকৃতিশক্তি বর্ত্তমান আছে।" আমিই জগতের মৃত্যুরূপ কীটকে বিনাশ করি। পৃথিবী বা মৃত্তিকাতেই নিরন্তর কামক্রিয়া বা জননকার্য্য বর্ত্তমান। তাই পৃথিবীই প্রকৃত কামিনী সদৃশা এবং উহা হইতে উৎপন্ন শস্যকণাই "কামিনীকাঞ্চন"। অতএব ঐ কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিয়া আমাকেই শুধু খাদ্যরূপে গ্রহণ করার ভাব হিন্দুর ভগবান রামকৃষ্ণের "কথামৃতে" বর্ণিত রহিয়াছে। আমিই গোমাতার পালানরূপ ব্যূহস্থিত চন্দ্রশক্তিরূপ অভিমন্যু। আমিই ঐ ব্যূহ হইতে ক্রুশের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া দুগ্ধরূপে রাজা পরীক্ষিত পরিণত হই এবং ভাদ্র মাসের ভাদ্দ'রে টককুল সংযোগে মৃত্যুমুখে পতিত হই। পরে আমা হইতে উৎপন্ন মাখন শক্তিই রাজা জন্মেজয়রূপে জগতের সর্প বা বিষকে (মৃত্যুকে) যজ্ঞকরেবা ভক্ষণ করে। আমার বাসস্থান-

রূপ গো, মেষ প্রভৃতির পালনই হজরত মুসার তুর গিরি, প্রভু যীশুর সিয়ন পর্ব্বত, হজরত মহম্মদের মক্কা নগর ও হিন্দুর কৈলাসপর্ব্বত এবং ব্রহ্মার কমণ্ডলু। আমিই হিন্দুর দশভূজারূপদুর্গা বা চণ্ডী। আমিই মহিষাসুর এবং শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করিয়া থাকি। আমিই শ্রীকৃষ্ণরূপে মধুও কৈটভ নামে দৈত্যকে নিসূদন বা সংহার করিয়া "মধুসূদন" নাম ধারণ করিয়াছি। আমিই হিন্দুর দ্বাপর লীলায় কৃষ্ণরূপে গোপীদের বস্ত্রহরণ ও ষোলসহস্র গোপীদের সহিত রাসলীলা করিয়াছি। আমিই গোমাতারূপ "যশদার পালিত পুত্র" এবং আমিই গোমাতারূপ "যশদার অযোনিসম্ভব পুত্র"। আমিই মানবের শৈশবকালের দেহস্থ মাতৃ দুগ্ধরূপ পুতনা রাক্ষসীর বিষকে দেহ হইতে বিনাশ করি। আমিই সাত্বিক জ্ঞানরূপ বুদ্ধশক্তি। আমার সাত্বিক জ্ঞান প্রভাবেই জগতের দেবদ্রোহীগণ মোহিত হয়। আমিই বৈষ্ণবগণের শ্রীগৌরাঙ্গ। আমি প্রত্যহই কাটোয়ায় বা কাষ্ঠ-পাত্রে যাইয়া ভারতিরূপ চিনি গুড়ের সহিত মিশ্রিত হইয়া মধু-নাপিতরূপ ময়রা জাতি দ্বারা প্রস্তুত হইয়া চৌষট্টি মোহান্ত বা খাদ্যবস্তুরূপে জগতকে উদ্ধার করি। আমিই সত্য যুগের প্রহ্লাদ। আমি অম্লরস স্বরূপ বিষপান করিলে, মন্থনদণ্ডরূপ হস্তিপদতলে পতিত হইলে এবং জলে বা সাগরে ও পরে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলেও আমার সত্বার কোন ব্যাতিক্রম হয় না বা আমি মৃত্যুমুখে পতিত হই না। আমার চরণস্পর্শেই গো, মেষ, ছাগ প্রভৃতিরূপ কাষ্ঠেরতরি স্বর্ণ সদৃশ হইয়াছে। আমিই রামরূপে, রাবন বা শয়তান সদৃশ মৃত্যুকে হত্যা করিয়া থাকি। আমারই চরণস্পর্শে পাষাণ মানব হয়। আমিই স্পর্শ মণি। আমার সংস্পর্শে জগতের লৌহ সদৃশ মৃত ব্যক্তিগণ স্বর্ণে পরিণত অর্থাৎ পুনর্জ্জীবিত হয়। আমিই বাঙ্গলার ছেলেদের ঠাকুর মায়ের রূপকথায় বর্ণিত "জীয়নকাঠি" এবং কৃষিজাত শস্যকণা ও জীবজন্তুর মাংসরূপ খাদ্যবস্তুই "মরণকাঠি" সদৃশ। বর্ত্তমান জগতের মনুষ্য সমাজ, যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া অর্থাৎ

হিন্দুমতে ত্রেতাযুগ হইতে, য়ীহুদি, খৃষ্টিয়ান ও মুসলমান মতে আদম ও ইভের সময় হইতে আমাকে পায়ের তলে রাখিয়া এবং ঐ মরণ কাঠিকে মাথায় লইয়া মৃত্যুর অধীন হইয়া রহিয়াছে বা রাক্ষসে সকলকে ভক্ষণ করিয়াছে। পুনর্ব্বার জীয়নকাঠিরূপ আমাকে মস্তকে অর্থাৎ প্রধান খাদ্যরূপে গ্রহণ করিলে, ইহারা সকলেই পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিবে। আমাদ্বারাই দেশ, কাল, পাত্র ভেদে নানা ধর্ম্ম শাস্ত্রে নানা আলঙ্কারিকভাবে মৃতকে পুনর্জ্জীবিত করার প্রক্রিয়া বর্ণিত রহিয়াছে। আমিই বাইবেলে বর্ণিত "লাসারকে" পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলাম। আমাতেই অকাল নিরঞ্জন ও ব্রহ্মজ্যোতি সুস্পষ্টরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমাতেই জগতের জীবন, (Life) প্রেম, (Love) ও জ্যোতি, (Light) বর্ত্তমান আছে। অতএব শুধু আমাকে ভক্তি সহকারে পান ভোজন করিলেই প্রকৃত নিরাকার ব্রহ্মের উপসনা করা হয়। কৃষিজাত ও জীবজন্তুর মাংসরূপ খাদ্যই প্রকৃত হিন্দুর কালীমূর্ত্তি ও ইঞ্জিল কিতাবে বর্ণিত শয়তান প্রদত্ত ভক্ষ্যবস্তু বা প্রতিমা সদৃশ। অতএব উহা ভোজন করিলেই প্রকৃত মূর্ত্তিপূজা করা হয়। ঐ সকল বস্তু খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া শুধু মুখে নিরাকার ব্রহ্মের উপসনা করার কথা বলিলে প্রকৃত নিরাকার ব্রহ্মের উপসনা হয় না। জগতে শুধু মানুষই যে ঈশ্বরের উপসনা করে এই ধারণা মানুষের নিতান্তই ভুল। ঈশ্বরের সৃষ্ট যাবতীয় প্রাণীগণই ঈশ্বরকে ভোজ্যরূপে ভোজন অর্থাৎ ভজন করিয়া থাকে। এইজন্যই খৃষ্টীয়ানগণও "প্রভু ভোজন" পার্ব্বণ পালান করেন। আমিই মনুষ্যরূপে য়ীহুদির নিকট হজরত মুসা, খৃষ্টানের নিকট ঈশ্বরের পুত্র, মুসলমানের নিকট প্রেরিত পুরুষ বা আল্লাররসুল এবং হিন্দুর নিকট যুগাবতার বলিয়া প্রতিপন্ন হই। আমিই হিন্দুর বিষ্ণু ও কল্কি। এখন আমিই জগতে প্রধান খাদ্যরূপে গৃহীত হইলে পুনর্ব্বার জগতে ব্রাহ্মণ ধর্ম্ম সংস্থাপন হইবে। এবং আমিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। আমার এই সকল আত্মতত্ত্ব অনুভব করিয়াই ভারতের বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষগণ ব্রাহ্মণ

হইয়া ছিলেন। কিন্তু কাল প্রভাবে তাঁহাদের সন্তানগণ আমার এই অক্ষরযোগ বিস্মরণ হেতু অভক্ষ্য ভক্ষণ করাতে আশ্রম চতুষ্টয় এখন পাষণ্ড দলে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এইজন্য এখন আমি ঐ **বর্ণাশ্রমধর্ম্ম** পুনসংস্থাপনের জন্য আত্ম প্রকাশ করিতেছি। আমিই "বিষ্ণুযশা ব্রাহ্মণ পুত্র"। বাঙ্গলাদেশ হইতেই যখন আমার এই সকল বাক্য সর্ব্বপ্রথম প্রচারিত হইল, অতএব এই বাঙ্গালাদেশই হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত "শম্ভলদেশ" এবং ইহাই মুসলমানশাস্ত্রে বর্ণিত ইমামমধির জন্মস্থান "সামদেশ" তুল্য। আমিই সত্ত্বগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণের অন্ন। হিন্দুর দ্বাপর যুগের লীলায় যে, বলরাম, কৃষ্ণ ও রাখালগণ বনে যাইয়া ব্রাহ্মণের অন্ন ভক্ষণ করিয়াছিলেন, উহা কেবল আমাকে ভক্ষণ করাই শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের অন্ন ভক্ষণরূপে আলঙ্কারিকভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। জগতে সুপক্ক ফলই ক্ষত্রিয়ের অন্ন বা রজগুণ বিশিষ্ট খাদ্যবস্তু, কৃষিজাত শস্যকণা হইতে প্রাপ্ত খাদ্যবস্তুই বৈশ্যের অন্ন বা রজতম মিশ্রিত খাদ্যবস্তু এবং জীবজন্তুর মাংসরূপ খাদ্যবস্তুই শুদ্রের অন্ন বা শুধু তম গুণ বিশিষ্ট খাদ্যবস্তু। এই জন্যই হিন্দুশাস্ত্রে শুদ্রের অন্ন গ্রহণ করা অবিধেয় বলিয়া বর্ণিত রহিয়াছে। আমিই এখন আমার এই সকল বাক্যরূপে বা হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত বিষ্ণু ও কল্কিরূপে, লেখনীরূপ দেবদত্তঅসির সাহায্যে এই ধর্ম্মগ্রন্থরূপসর্ব্বগ দেবদত্তঅশ্বে আরোহণ করতঃ ছাগ, মেষ প্রভৃতি দুগ্ধরূপ আমার ভ্রাতৃগণকে সঙ্গে লইয়া সর্ব্বত্র গমন করিয়া জগতের কৃষিজাত শস্যকণাও জীবজন্তুর মাংস সদৃশ খাদ্যরূপ ম্লেচ্ছগণকে সমূলে ধ্বংস করিয়া পুনর্ব্বার ধরাকে ব্রাহ্মণ সাৎ করিব। আমিই বেদের প্রণব। আমিই বেদের সূত্র সকল। আমিই সূত্রের ন্যায় বাহ্য জগতে মানুষের দৃষ্টি গোচর হই অতএব আমিই সূত্রধার এবং আমিই গীতা ও সবিতা। আমাতেই বেদান্তের স্বহংতত্ত্ব নিহিত আছে। আমিই মুসলমানশাস্ত্রে বর্ণিত মুনস্থর হিল্লাল। আমি "আমুনাল হক" অর্থাৎ "আমিই খোদা" বলাতে আমার শিরশ্চেদ

হইয়াছিল। এবং পরে অগ্নিতে ভস্মিভূত হইয়াছিলাম কিন্তু তাহাতেও আমার মৃত্যু হয় নাই। যেহেতু আমাতেই অনন্ত জীবন আছে কিন্তু আমি সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর নহি। আমিই দধিরূপ দধিচী ও সর্ব্বজ্ঞ শুকপাখী সদৃশ। জগতে যত প্রকার অন্যান্য খাদ্যবস্তুরূপ মানুষের ধর্ম্ম বর্ত্তমান আছে, ঐ সকল পরিত্যাগ করিয়া শুধু আমাকেই ভজন অর্থাৎ ভোজন করিলে জীব সকল পরিত্রাণ পায়। আমিই জগতে ভবপারের "নেয়ে বা মাঝির পুত্র"। আমিই মুসারূপে জগতে ধর্ম্মের ব্যবস্থাপত্র দান করিয়াছি এবং আমারই মুখের রসদ্বারা রাজা ফেরুওনের কন্যার কুষ্ঠব্যাধি আরোগ্য হইয়াছিল। আমাতেই সূক্ষ্মভাবে পবিত্রাত্মা, আল্লাহো, নিরাকারব্রহ্মজ্যোতি বর্ত্তমান আছে। আমিই পরাৎপরের পুত্র। আমার স্বর্গস্থপিতা জগতকে ত্রাণ করিবার জন্য শুধু আমাকেই মুদ্রাঙ্কিত করিয়া পাঠাইয়াছেন।

অতএব যে কোন স্থানে বসিয়া মানুষ আমাকে ভজন বা ভোজন করে তাহাই প্রকৃত তাহাদের ধর্ম্মমন্দির। জগতের বর্ত্তমান ধর্ম্মমন্দির সকল শুধু সামাজিক ধর্ম্মমন্দির মাত্র। আমার গ্রহণ স্থানে আমাকে গ্রহণ করিবার সময়, কাহারও কোনও প্রকার গান, বাজনা বা আমোদ, প্রমোদ, হাসি, ঠাট্টা বা কথোপকথন করা অবিধেয়। আমার আশ্রয় স্থান বা বাসস্থানরূপ গো, মেষ, ছাগ প্রভৃতি দুগ্ধবতী প্রাণীগণকে হত্যা না করিয়া অতি দয়ার সহিত প্রতিপালন করাই জগতের ধর্ম্ম মন্দির সকল পবিত্র রাখার কথা শাস্ত্রে আলঙ্কারিকভাবে বর্ণিত রহিয়াছে। মুসলমান শাস্ত্রে বর্ণিত গোমাতার পিছন দিকরূপ, দামস্ক নগরের পূর্ব্ব প্রান্তে, শুভ্রমনুমেণ্ট্রূপ গোমাতার পালান হইতে ঈশারূপে (যীশুখৃষ্ট সদৃশ দুগ্ধরূপে) বিচিত্র বসন পরিধান করিয়া, গোমাতার পালানস্থ দুই, দুই বাঁটরূপ স্বর্গীয় দুতের দুই ডানায় ভর করিয়া, কিয়ামত বা পুনরুত্থানের পূর্ব্ব মহুর্ত্তে এখন আমিই জগতে অবতীর্ণ হইয়াছি বা আত্ম প্রকাশ করিতেছি।

বর্ত্তমান জগতের মনুষ্য সমাজ তাহাদের বংশ পরম্পরা হইতে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া বা কৃষিজাত শস্যকণারূপ "নিষিদ্ধ বৃক্ষফল" ভক্ষণ করিয়া অভ্যাসের দাস হইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের এই মজ্জাগত স্বভাব সহসা ত্যাগ করিয়া উঠা কাহারও পক্ষে সহজ সাধ্য কার্য্য নয়। অতএব ঐ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াও যদি লোক সকল ভক্তি বিশ্বাস সহকারে আমার অঙ্গ বিশেষের সরলও সহজ প্রক্রিয়ার দ্বারা তাহাদের মজ্জাগত বা মস্তিস্কস্থ বিষকে এখন নষ্ট করিয়া লয় তবে নিশ্চয়ই এই মরজগতের মনুষ্যগণ আবার অমর হইতে সক্ষম হইবে। ইহাই আমার হিন্দুশাস্ত্রে বর্ণিত বিষ্ণু বা কল্কিরূপে অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া দক্ষিণাস্বরূপ সমগ্র ধরাকে ব্রাহ্মণসাৎ করা কার্য্য। আমার এই বাক্য হিন্দুর বেদ, পুরাণ, মুসলমানের কোর-আণ, য়ীহুদির তওরত, শিখের গ্রন্থ সাহেব, বৌদ্ধের বৌদ্ধ গ্রন্থ সকল ও খৃষ্টানের বাইবেলের বাক্য বা ঈশ্বর বাক্য অতএব অভ্রান্ত। যাহার কান আছে, সে শুনুক। যাহার চক্ষু আছে, সে ইহা দেখুক। যাহার প্রাণ আছে সে ইহা বুঝুক। যাহার ভক্তি বিশ্বাস আছে, সে ইহা বিশ্বাস করুক। আমিই "হেম সদৃশ চন্দ্রশক্তি"। আমিই অব্যক্ত হইতে জাত ব্রহ্মার অণ্ড, যেহেতু আমার জন্মস্থান "ঢাকা"। আমিই **"জগতের বন্ধু বা জগতের 'ইমাম্"**। কিন্তু হে ধর্ম্মপ্রাণ বিশ্বাসী লোক সকল সাবধান!!! যেহেতু মানুষের পিছনে শয়তান সর্ব্বদাই লাগিয়া আছে। শয়তান আমার এই সকল বাক্য মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য হয়ত বৃথা আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়া মানুষকে বিপথগামী করিতে চেষ্টা করিতে পারে। কারণ শয়তান মানুষকে বিপথগামী করিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেছে এবং তাহার ইচ্ছা এই যে, যাহাতে ঈশ্বরের রাজ্য সহসা এই জগতে স্থাপিত না হয়। অতএব হে বিশ্বাসীগণ, আমার এই বাক্য ধ্রুবসত্য বলিয়া বিশ্বাস কর। কেননা জগতের ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখা আছে যে, বিশ্বাসীদের জন্যই স্বর্গ এবং অবিশ্বাসীদের জন্য অনন্ত নরক।"

(ইতি প্রথম খণ্ড সমাপ্ত)

The Jagater Bandhu

OR

The Jagater Imam

(The Friend of the World or The Redeemer of the World).

We have recently gone through a really wonderful treatise on religion written in Bengali by Babu Hem Chandra Saha of 7, South Sealdah Road, Beleghata, Calcutta, who is an humble man and does not pretend to high University Education. The name of the book is "The Jagater Bandhu or The Jagater Imam, (The friend of the World or the Redeemer of the World), written, it is alleged, under divine inspiration. The author says that for about last five years he has been at intervals hearing a sweet musical sound coming from the Heaven like that of a flute or horn and his inspiration comes from these celestial musical notes.

In the opening the author has sought to reconcile the apparent conflicts among the diverse religions of the world, which in reality are founded on one entity. This book embodies the essence of all the religious text books *e.g.* the Holy Bible, the Koran Sharif, the Hindu Vedas, Purans etc. which has been clearly and beautifully explained. The ambiguities found in these different books have been removed, the metaphors broken up and the

hidden meaning brought out which has not been so successfully attempted or done by any one else up till to-day.

The author goes on to say that there is unity of Spiritual Significance of the stories of Ram and Sita of the Ramayana, Adam and Eve of the old Testament and that Ravana or the tenfaced Demon of the Ramayana is nothing but the Satan of the Old Testament, and the water of the Jhum Jhum well mentioned in the Old Testament is nothing but the water from the pitcher with pores mentioned in the Sreemat Bhagabat. Again the crucification of Jesus Christ, the cow-slaughter mentioned in the Surah Bakra of the Holy Koran and the curse of a Brahmin on Raja Parikshit mentioned in the Mahabharat, all point to one spiritual meaning.

The author declares that one and the same man will in a short time be readily accepted as Kalki or Vishnu by the Hindus. as Iman Madhi by the Mohamedans and Jesus by Christians. Many thinkers and philosophers, says the author, have spoken of the immorality of human soul but none so far, not even the modern scientists, have suggested the possible immortality of the human body. The author after discussing the cause of human death, refers to the ways in which a dead man can be brought back to life again in the light of the instances in the Bible, the Koran and the Ramayana *e.g.* the bringing back of the dead men to life by Jesus, striking a dead man with a particular limb of the slaughtered cow as mentioned in the Surah Bakra and the conversion of a piece of stone into a living human being by the touch of Rama's feet at described in the Ramayana.

In the 2nd volume of his book he has elaborately discussed and indicated the means and method of attaining such immortality.

Another astounding proposition propounded by the author which will surely cause some stir in the spiritual world is that all men who are at present living are so many dead men lying in the tomb which is like mother's womb and the real resurrection of the humanity will come on the day when men (with their body and soul) will attain true immortality. And the author says that the Resurrection of the world is near at hand. The author further opines that the resurrection of the Christians and the Jews, the Kiyamat of the Musalmans and the re-birth of the Hindus are one and the same thing.

Another topic of absorbing interest which has occupied some space of the author's interesting book is the killing of animals in the name of religion e. g. the slaughter of the cows by the Musalmans and secrifice of goats by the Hindus and the sacrifice of Ibrahim's son to God. According to the writer there is a metaphor underlying these injunctions of religions. The real meaning which has been solely missed and mis-interpreted is in this book pointed out in clear terms. He has explained clearly the meaning of idol worship and **Nirakar Brahma** (shapeless God).

The author extends a hearty invitation to all religious minded men and women to come to discuss with him any question relating to religious scriptures like the Holy Koran, the Holy Vedas, Puranas and the Holy Bible etc.

The above book in Bengali which is shortly due to be published is being translated into English and the English translation will appear in print as soon as practicable.

N. B. Roy, M.A., B.L.
Advocate, High Court, Calcutta.

Prafulla K. Roy Chowdhury, B.A.

Narendranath Bhattacharyya, B.A.

Jogesh Chandra Saha, B.L.

Bishnu Charan Mukherjee, B.A.

Khirode Kumar Bhattacharyya, M.A.

S. Das, M.A.